আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

www.pathagar.com

সাংগঠনিক জীবনের অপরিহার্যতা

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىْ قَالَ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِى بِهِنَّ لْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىِّ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ- (مسند احمد ، ترمذى)

হযরত হারেসুল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি। যা আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন– সে কাজগুলো হলো, জামাআতবদ্ধ (সাংগঠনিক) জীবন, (নেতার) আদেশ শ্রবণে প্রস্তুত থাকা ও (সংগঠনের নিয়ম-কানুন) মেনে চলা, (প্রয়োজনে) হিজরত করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি জামাআত (সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে ইসলামের রশি তার গলদেশ থেকে খুলে ফেললো– যতক্ষণ না সে পুনরায় জামাআতের (সংগঠনের) মধ্যে শামিল হবে। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াত যুগের কোনো মতবাদ ও আদর্শের দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে। (মুসনাদে আহ্‌মদ, তিরমিযী)

www.pathagar.com

আমি কেন
জামায়াতে ইসলামী
করি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

www.pathagar.com

আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার-ঢাকা- ১১০০
ফোনঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইলঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯
তৃতীয় প্রকাশ ঃ জুলাই- ২০০৪
প্রচ্ছদ ঃ কোবা এ্যাডভারটাইজিং এন্ড কম্পিউটার্স
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ শাকিল কম্পিউটার
মুদ্রণে ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ১৫০ টাকা মাত্র।

AMEE KENO JAMA-ATE ISLAMI KORI
Moulana Delawar Hossain Sayedee
Co-operated by Moulana Rafeeq bin Sayedee
Copyist : Abdus Salam Mitul
Published by Global Publishing network
66 Paridash Road, Banglabazar-Dhaka-1100
3 rd Edition 2004 July
Price : 150 Tk only
Six Doller (U.S) Only
Four Pound Only

www.pathagar.com

যা বলতে চেয়েছি

প্রারম্ভে মহান আল্লাহর দরবারে আলীশানে শতকোটি শোকর জ্ঞাপন করছি, যিনি একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর এই গোলামকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী কাফেলায় শামিল করেছেন। অগণিত দরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দুত করুণার মূর্ত প্রতীক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

অতীতের যে কোনো যুগের তুলনায় বর্তমান যুগে কুফ্‌রী মতবাদের আধিক্য অত্যন্ত প্রবল। ভোগবাদী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক জীবন দর্শন, পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গনতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ– এসব মতবাদসমূহ মৌলিক দিক থেকে কোরআন ও সুন্নাহর সাথে চরম সাংঘর্ষিক। সারা দুনিয়ার সমস্ত মুহাক্কিক আলেমে দ্বীন এসব মতবাদকে কুফুরী মতবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামী বিরোধী এসব মতবাদসমূহ পুরোপুরি অথবা আংশিক অনুসরণ করতে গেলে মুসলমানদের ঈমান সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়বে। অথচ অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহে উল্লেখিত মতবাদসমূহ মুসলিম নামধারী নেতা-নেত্রীরা বুঝে অথবা না বুঝে মুসলিম জনগণের ওপরে চাপিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে চেষ্টা করছে, কোথাও বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উক্ত মতবাদসমূহ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব মতবাদসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করতে গেলে কোরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামের অধিকাংশ প্রামাণ্য বিধি-বিধানকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়– যা কোনো মুসলমানের পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকিদা, চিন্তা-চেতনা ও কর্মের বিরোধী উক্ত মতবাদসমূহ ইসলামী জিন্দেগীর স্বার্থেই মুসলমানদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ইসলামের বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনাচারের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকার প্রয়োজনেই মুসলমানদেরকে এমন ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক বিভাগ ও স্তরে কোরআন-সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীন

www.pathagar.com

কর্তৃক বিধি-বিধান নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা যাবে। যে রাষ্ট্র ও সমাজে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধের প্রতি আনুগত্য করার যথাযথ সুযোগ পাবে এবং এ পথেই মানুষের পৃথিবী ও আখিরাতে মুক্তির পথ সুগম হবে। এই রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরকিগণও মুসলিম নাগরিকগণের অনুরূপ তাদের ধর্মীয় অধিকারসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার সমভাবে ভোগ করবে।

এই ধরনের একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এককভাবে কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সংগঠনের। দেশ ও সমাজের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সেই আদর্শবাদী সংগঠনের পক্ষেই সম্ভব কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বস্তরের জনশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা। আর সেই সংগঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এমন একটি গঠনতন্ত্র প্রয়োজন, যে গঠনতন্ত্রের আলোকে গোটা সংগঠন নিয়মতান্ত্রিকভাবে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত করবে। সংগঠনের প্রত্যেক স্তরে আদর্শিক প্রশিক্ষণ, সকল স্তরের জনশক্তির মধ্যে আদর্শ অনুসরণের নিষ্ঠা, আদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সেই সাথে সংগঠনের আওতায় রাষ্ট্র ও সমাজ দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার বাস্তবসম্মত কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আল্লাহর শোকর, এই ধরনের গঠনমূলক পন্থায় একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 'জামায়াতে ইসলামী' অস্তিত্ব লাভ করেছিলো। কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের মতামত, আদর্শ, উদ্দেশ্য, নেতৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামদের সমষ্টিগত দলের নিয়ম-নীতি, কর্মপদ্ধতি তথা খেলাফতে রাশেদাকে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করার মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে।

www.pathagar.com

কোরআন-সুন্নাহর নিরিখে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমিও আমার আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় যোগ্যতা ও ধন-সম্পদকে ব্যয় করে পরকালে নিজের মুক্তির পথ সুগম করতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট।

জামায়াতে ইসলামীর পরিমন্ডলে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধানের বাস্তবায়নই একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। কোরআন ও সুন্নাহর বাস্তবরূপ হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের জীবনাদর্শ। এ ক্ষেত্রে আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসৃত আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপন্থা বিশেষ কোনো কালের গন্ডীতে আবদ্ধ নয়– বরং তা সার্বজনীন এবং সর্বকালের, সব যুগের ও বিশ্বের যে কেনো স্থানের মুসলমানদের ইসলামী জিন্দেগীর একমাত্র সঠিক পাথেয়– এ বিষয়ে কারো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর ইসলামী জিন্দেগী বলতে শুধুমাত্র নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত ও কোরআন তিলাওয়াত করাকেই বুঝায় না। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগ ও স্তরে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করাকেই ইসলামী জিন্দেগী বলা হয়। আর ইসলামী জিন্দেগীর মূলভিত্তিই হলো কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস। আমার এসব চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাসের সাথে জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচীর মৌলিক কোনো বৈপরিত্ব রয়েছে বলে আমি মনে করি না।

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহঃ) জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা– এটা কোনো গোপন বিষয় নয়। পক্ষান্তরে তাঁকে ইমাম হিসাবে অনুসরণ করতে হবে বা মানতে হবে, অথবা তাঁর যে কোনো মতামতকেই প্রাধান্য দিতে হবে, তাঁর সর্বপ্রকার চিন্তা-চেতনাকে জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ ও উদ্দেশ্যে পরিণত করতে হবে, এমন কোনো কথা জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে নেই। বরং কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এটাই যে জামায়াতে ইসলামীর মূল উদ্দেশ্যে– এ কথাই জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

www.pathagar.com

'আপনি যদি নিজেকে সত্যকারের একজন আল্লাহর গোলাম হিসাবে গড়তে ইচ্ছুক হন, তাহলে আপনার চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মকান্ড থেকে ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস ও কর্মকান্ড পরিহার করুন'– এ কথার দিকেই জামায়াতে ইসলামী মানুষকে আহ্বান জানিয়ে আসছে।

আমি পুনরায় এ কথা উল্লেখ করছি যে, কোনো ব্যক্তির আদর্শ, চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কোরআন-সুন্নাহ্ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই জামায়াতে ইসলামীর যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা। বর্তমানে পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতি, দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পদক্ষেপ জামায়াতে ইসলামী নিয়ে থাকে, সেটাও উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যেই। সুতরাং জামায়াতে ইসলামীর যাবতীয় কর্মতৎপরতার মূলে নিহিত রয়েছে কোরআন-সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্য। এসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মতৎপরতার সাথে আমি ঐকমত্য পোষন করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি, সামর্থ, যোগ্যতা-মেধা, ধন-সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছি।

আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

আরাফাত মঞ্জিল

৯১৪, শহীদবাগ– ঢাকা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

শান্তির পথ ১১

শান্তি– পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয় ১৯

আত্মার পবিত্রতা অর্জন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা ২৩

শান্তির ঝর্ণাধারা ৩৩

আল কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা ৩৮

মানুষের ওপরে কোরআনের প্রভাব ৪৪

ইসলাম বিরোধী কুসংস্কার ও তার প্রতিকার ৬৭

সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর ভালোবাসা ৭৪

আল্লাহর বিধান সার্বজনীন ৯৪

নবীদের মানবিক সত্তা ও নিষ্পাপ হবার তাৎপর্য ৯৮

বিশ্বনবীর আনুগত্য বনাম শান্তি ও মুক্তির প্রত্যাশা ১০৯

রাসূলের সুন্নাতই ইসলামী শরীয়াত ১১২

সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য ১১৮

সাহাবায়ে কেরামদের অনুসরণ ১২৮

সাহাবায়ে কেরামদের ইতিহাস অস্বচ্ছ হবার কারণ ১৩৩

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম–ওলামা-মাশায়েখদের দায়িত্ব ১৪৯
আমি কিভাবে জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আকৃষ্ট হলাম ১৬৪
দ্বীনি খেদমত ও দ্বীনি আন্দোলন ১৬৯
জামায়াতে ইসলামীর কর্মসূচী ১৭৬
অন্যান্য দলের সাথে জামায়াতে ইসলামীর পার্থক্য ১৮৬
মাওলানা মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামী ১৯৫
খেলাফত ওয়া মুলুকিয়াত নামক গ্রন্থের পর্যালোচনা ২০৪
আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি ২০৮
দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম– প্রধান তিনটি উপাদান ২১৬
ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত ২২৩
শেষ কথা ২৩৩

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্‌সীর
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি
কর্তৃক রচিত বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

তাফসীরে সাঈদী

আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ	শাহাদাতই জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ
আল কোরআনের মানদন্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা	মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২
দ্বীনে হক-এর প্রতি দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি	আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?
দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা	হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন
আল কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান	শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে
মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন	কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়?
বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-১ ও ২	রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মোনাজাত
	আল্লাহ কোথায় আছেন?

www.pathagar.com

শান্তির পথ

শান্তির একটি নিবিড় পরিবেশ এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষেরই কাম্য। মানুষের যাবতীয় তৎপরতা শান্তি ও স্বস্তির লক্ষ্যেই পরিচালিত। শান্তি কামনা করে না, এমন মানুষের অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে অতীতে যেমন ছিলো না, বর্তমানেও নেই এবং আগামীতেও থাকবে না। সকল মানুষই শান্তি ও স্বস্তির পথ অনুসন্ধানে রত। এই মানুষই শুধু শান্তির অনুসন্ধান করে না, ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর প্রত্যেকটি প্রাণীই শান্তি ও স্বস্তি কামনা করে। গভীর অরণ্যে বিচরণশীল হিংস্র ব্যঘ্র শান্তি ও স্বস্তির লক্ষ্যেই অন্য প্রাণীকে শিকারে পরিণত করে, তারপর নিবিড় প্রশান্তির সাথে অলস ভঙ্গিতে চার পা ছড়িয়ে ঘুমায়। চিহ্নিত সন্ত্রাসীও সন্ত্রাস করে তার শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। পরস্বার্থ হরণকারী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রে হামলা চালায় নিজের দেশের শান্তি-স্বস্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতির লক্ষ্যে। এভাবে করে সকল স্তরের ও প্রকৃতির মানুষই শান্তি ও স্বস্তি অনুসন্ধানে তৎপরতা চালায় নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা-চেতনা প্রয়োগ করে।

শান্তি পিয়াসী মানব মন্ডলী বর্তমান পৃথিবীতে শান্তির আশায় হন্যে হয়ে ফিরছে। নিজেদের আবিষ্কৃত কোনো মতবাদ, মতাদর্শই এদেরকে শান্তি দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শিশির বিন্দসম শান্তির আশায় বর্তমান মানব গোষ্ঠী হোয়াইট হাউজ, ক্রেমলীন, চীনের লাল প্রাচীর ও ভারতের ত্রীমূর্তি ভবনসহ সব জায়গায় ধর্ণা দিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এসেছে। সমস্ত মতবাদ-মতাদর্শের বাস্তব পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখেছে এই মানব গোষ্ঠী। কিন্তু এ কথা চরম সত্য যে, শান্তির পরিবর্তে অশান্তির দাবানল গোটা বিশ্বময় আলোর গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান মানব গোষ্ঠীই প্রযুক্তিগত বিদ্যায় প্রগতির স্বর্ণ শিখরে আরোহন করেছে। তারা এমন ধরনের উড়ন্ত

www.pathagar.com

যন্ত্রযান আবিষ্কার করেছে যে, ইচ্ছে করলে মুহূর্তের মধ্যেই এই পৃথিবীই শুধু নয়, চন্দ্র পৃষ্ঠেও ভ্রমণ করতে সক্ষম। অক্লান্ত পরিশ্রমে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় যে কাজ শেষ হবে, সেই কাজ তড়িৎ গতিতে শেষ করার মতো বিভিন্ন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। নিজেদের প্রতিকৃতি, চলমান দৃশ্য ও কণ্ঠস্বর যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করার মতো প্রযুক্তি আয়ত্বাধীন করেছে। পৃথিবীর ওপরের ও মৃত্তিকা গর্ভে লুকায়িত সম্পদ রাশি কাজে লাগিয়ে মানুষ নিজেদের ভোগ বিলাসে ব্যবহারের জন্য নানা ধরনের সামগ্রীর সমাবেশ ঘটিয়েছে। নানা ধরনের মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে, যা দিয়ে এই সুন্দর সবুজ শ্যামল বিথীকায় পরিপূর্ণ পৃথিবীকে নিমিষে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করা যায়।

উন্নতি আর প্রগতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেও এই মানুষ এমন মতবাদ-মতাদর্শ, নীতি-পদ্ধতি আবিষ্কার করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, যে মতবাদ-মতাদর্শ পৃথিবীর সমগ্র মানব মন্ডলীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। উদ্ভাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে সেই আদর্শের, যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের হৃদয় থেকে মুছে যাবে সাম্প্রদায়িকাতর কালোমেঘ। সেই নীতিমালা প্রনয়ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যে নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে পৃথিবী থেকে দূরীভূত হবে বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। সেই সার্বজনীন বিধান চালু করতে ব্যর্থ হয়েছে, যে বিধান গ্রহণ করলে প্রত্যেকটি মানুষ সমভাবে ভোগ করবে তাদের জন্মগত অধিকার। মানুষ নিজস্ব চিন্তা-চেতনা প্রয়োগ করে পৃথিবীতে শান্তি আনতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। একটি অশান্তি দূর করতে গিয়ে তারা অশান্তির অগণিত জ্বালামুখ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের পরে দেশ, সভ্যতার পরে সভ্যতা, জাতির পরে জাতি ধ্বংস করা হয়েছে, দুই দুটো বিশ্বযুদ্ধসহ অগণিত যুদ্ধের মাধ্যমে রক্তাক্ত করা হয়েছে এই পৃথিবীর পরিবেশ, তবুও শান্তির সেই সোনার হরিণের নাগাল মানুষ পায়নি। অতীত ইতিহাসেও দেখা যায়, ফিরাউন, নমরুদের মতো দাম্ভিক স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীও হযরত মূসা ও মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, বনী ইসরাঈল নামক জাতিকে ধ্বংস করার পথে অগ্রসর হয়েছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে আগুনের গর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছে, কিন্তু শান্তির অমীয় স্পর্শ

www.pathagar.com

লাভে তারা ব্যর্থ হয়েছে। আমরা যারা বাংলাদেশের অধিবাসী, তারাও শান্তির আশায় দুই বার স্বাধীনতা অর্জন করেছি, কিন্তু কাঙ্খিত শান্তি আমাদের ভাগ্যে জোটেনি। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, মানুষের পক্ষে কেনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি? এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর হলো, মানুষের চিন্তাধারা প্রয়োগ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যেমন সম্ভব হয়নি, অনুরূপভাবে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সম্ভব হবে না–এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য।

পুনরায় প্রশ্ন জাগে, তাহলে শান্তি লাভ করা যাবে কোন্ পথে? এই প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সহজ-সরল। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি অনুধাবন করা আমাদের জন্য সহজ হবে। রেডিও আবিষ্কার করেছেন মার্কনী নামক একজন বিজ্ঞানী। তার আবিষ্কৃত রেডিও কিভাবে পরিচালনা করতে হবে, এ ব্যাপারে তিনি সাধারণ মানুষকে অজ্ঞ না রেখে রেডিও কিভাবে পরিচালনা করতে হবে, সে সম্পর্কে একটি অপারেটিং গাইড দিয়ে দিয়েছেন। এই গাইডের বিপরীত পন্থায় যদি কেউ রেডিও অপারেট করার চেষ্টা করে, তাহলে রেডিও নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। সুতরাং এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, এর সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, এই পৃথিবীকে মানুষের বসবাস ও জীবন ধারনের উপযোগী করেছেন এবং সেই সাথে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষের জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে গাইড দিয়ে দিয়েছেন। সেই গাইড অনুসারে মানুষ যদি নিজেদের জীবন পরিচালনা করে, তাহলে শান্তি লাভ করতে সক্ষম হবে আর যদি সেই গাইডের বিপরীত পন্থায় চলা শুরু করে, তাহলে অশান্তির সর্বগ্রাসী হুতাশনে মানব জাতি নিমজ্জিত হতে বাধ্য হবে।

এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, শান্তি ও অশান্তি– এই দুটো জিনিসই মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁরই আজ্ঞাধীন। শান্তি আল্লাহ তা'য়ালার নে'মাত ও রহমত এবং অশান্তি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আযাব ও গযব বিশেষ। এ কথাও চির সত্য যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত শান্তির দুত নবী-রাসূলদের আনুগত্যের মধ্যেই শান্তি নিহিত এবং তাঁদের বিরোধিতার মধ্যেই অশান্তি নিহিত।

www.pathagar.com

নবী-রাসূলগণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, তাঁদের আনীত আদর্শ অনুসরণ করলে শান্তি লাভ করা যাবে আর তাঁদের আদর্শ ত্যাগ করে ভিন্ন কোনো আদর্শ অনুসরণ করলে অবশ্যই অশান্তি অক্টোপাশের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। যদি প্রশ্ন ওঠে যে, নবী-রাসূলগণ কি তাঁদের পুত ও পবিত্র চিন্তাধারা প্রয়োগ করে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন? এই প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানের জন্য সমস্ত নবী-রাসূলগণের জীবন ও কর্ম পদ্ধতি পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই, একমাত্র বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত পূর্ব ও পরের জীবনের প্রতি সামান্য আলোকপাত করলেই বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ইতিহাস যে যুগটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, 'আইয়ামে জাহিলিয়াত' বা মূর্খতার যুগ হিসাবে, সেই মূর্খতার ঘোর অন্ধকার অমানিশার ঘনঘটার মধ্যেই প্রদীপ্ত সূর্যের মত আগমন করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, শোষিত নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনতার মুক্তির দিশারী নবী সম্রাট মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তদানীন্তন পৃথিবীতে মানুষ সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে শোষিত হচ্ছিল, রাজনৈতিকভাবে গোত্রতন্ত্র তথা জুলুমমূলক ব্যবস্থা জগদ্দল পাথরের মত মানুষের ওপরে চেপে বসেছিল, ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে মায়ের জাত নারীকে তলিয়ে দেয়া হয়েছিল, 'জোর যার মুল্লুক তার' এ নীতিই ছিল সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। এহেন সমাজ ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত মানবতা মুক্তির লক্ষ্যে আর্তনাদ করছিল। মানবতার এই করুণ অবস্থা অবলোকন করে করুণার মূর্ত প্রতীক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হৃদয় ব্যথা কাতর হয়ে উঠেছিল।

তিনি মানুষকে এ অপমানজনক অবস্থা থেকে মুক্ত করে মহামুক্তির স্বর্ণদ্বারে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মাত্র সতের বছর বয়সে কিছু উৎসাহী তরুণ-যুবককে সাথে নিয়ে হিলফুল ফুযূল নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করলেন। এ মহান সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, মানবতাকে যে কোন ধরণের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত করে একটি সুখী সমৃদ্ধ শালী নিরাপত্তাপূর্ণ ও শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং জাতিকে সুসভ্য হিসাবে গড়ে তোলা। নবুওয়াত লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিরামহীন গতীতে

www.pathagar.com

সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনা করলেন। পক্ষান্তরে তিনি কাংখিত ফল লাভ করতে পারলেন না। গোটা জাতিকে মুক্ত করে শোষণ মুক্ত সমাজ উপহার দিতে তিনি সক্ষম হলেন না।

এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন জাগে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কেনো সক্ষম হলেন না ? তিনি কি ঐ আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক ছিলেন না? অথবা তাঁর মধ্যে আন্দোলন সংগঠন ও নেতৃত্বের কোন ধারণা বর্তমান ছিল না? ইতিহাস সাক্ষী, মহান আল্লাহ তাঁকে এ ধরনের যাবতীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত করেই এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাঁকে 'সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী' বলে সনদ পত্র দিয়েছেন এবং সর্বকালের মানুষদের জন্য 'একমাত্র উত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় চরিত্র' হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রাণের শত্রু যারা ছিল সে সমাজে, তারাও তাকে 'আল আমীন' অর্থাৎ বিশ্বাসী এই উপাধিতে ভুষিত করেছেন। পূর্ণিমার পূর্ণশশীর মধ্যেও কালোদাগ Blackspot থাকলেও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চরিত্রে কোন কালোদাগ আবিষ্কার করতে পারেনি। Spotless character-এর অধিকারী ছিলেন তিনি।

আবার প্রশ্ন জাগে, এ ধরনের একজন Spotless character-এর অধিকারী এক মহান ব্যক্তি মাত্র সতের বছর বয়স থেকে শুরু করে চল্লিশ বছর বয়স অর্থাৎ তেইশ বছর পর্যন্ত অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েও সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌছতে কেনো সক্ষম হলেন না? পক্ষান্তরে ঐ একই ব্যক্তি চল্লিশ বছর বয়স থেকে তেষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ এই দ্বিতীয় তেইশ বছর আন্দোলন করে এমন একটি সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতি পৃথিবীর সভ্যতায় উপহার দিলেন, যে সমাজ রাষ্ট্র ও জাতি বর্তমান ও আগামী দিনের জাতিসমূহের জন্য চীর অনুসরণীয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আন্দোলনের দুটো অধ্যায়ের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যে প্রকৃত সত্য দৃষ্টি গোচর হয়, তাহলো ১৭ বছর থেকে ৪০ বছর অর্থাৎ এই ২৩ বছর আন্দোলন করে তিনি তাঁর কাংখিত ফল লাভে

www.pathagar.com

সক্ষম হননি। অপরদিকে ৪০ বছর থেকে ৬৩ বছর আন্দোলন সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে ছিল। মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা বিরাট এবং অকল্পনীয় পরিবর্তন সাধিত হলো। ফলে এমন একটি সমাজ জাতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, আকাশের নিচে ও পৃথিবীর বুকে এ ধরনের বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত ভীতিহীন নিরাপত্তাপূর্ণ সুখী-সমৃদ্ধশালী সৌভ্রাতৃত্বমূলক জীবন ব্যবস্থা ইতিহাসে অনুপস্থিত। যে সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শ্রমনীতি, শিল্পনীতি ছিল গবেষকদের কল্পনার বিষয় বস্তু, তা-ই এই ২৩ বছরের আন্দোলনে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করলো। পৃথিবী ধ্বংস হবার পূর্ব পর্যন্ত এ ২৩ বছরের আন্দোলন ও তার ফলাফল, গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্যে অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

আবার প্রশ্ন জাগে, প্রথম ২৩ বছরের আন্দোলন কেনো যৌক্তিক পরিণতি লাভ করলো না? আর দ্বিতীয় ২৩ বছরের আন্দোলন কোন্ অলৌকিক ক্ষমতার স্পর্শে সাফল্য লাভ করলো? এ সম্পর্কে চিন্তা করলে আমাদের সামনে যে সত্যটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রথম ২৩ বছরের আন্দোলন ছিল তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা চিন্তা-কল্পনা ও মস্তিষ্ক প্রসূত। আর দ্বিতীয় ২৩ বছরের আন্দোলন ছিল ওহীভিত্তিক জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত। এখানে প্রকারান্তরে মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রমাণ করে দিলেন, মানুষের চিন্তা-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা তথা মানুষের তৈরী কোনো আদর্শ মানুষের মুক্তি দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মানুষের সমস্যার সার্বিক সমাধান দিতে পারে একমাত্র ওহী তথা আল্লাহর অবতীর্ণ করা জীবন বিধান। মানুষ যতই সৎ, নীতিবান, নিষ্ঠাবান ও অনুপম গুণাবলীর অধিকারী হোক না কেনো, সে মানুষ তাঁর মন-মস্তিষ্ক প্রসূত, ধারণানূযায়ী বা কল্পনা নির্ভর কোনো নীতিমালা দিয়ে যদি মানব গোষ্ঠীর সমস্যার সার্বিক সমাধান দানে অগ্রসর হয়, তাহলে সে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে। তার সমস্ত প্রচেষ্টা ত্যাগ-তিতীক্ষা ও শ্রম ব্যর্থতার চোরাবালিতে হারিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

মানুষ যদি তার কল্পনা প্রসূত নীতিমালা প্রয়োগ করে মানব গোষ্ঠীর সমস্ত সমস্যার স্থায়ী সুষ্ঠু সমাধান দানে সক্ষম হত, তাহলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিবান ও

www.pathagar.com

চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-ই সর্বাগ্রে সফল হতেন। মানব জাতির জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ জীবনধারা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ওহীভিত্তিক জ্ঞান তথা আল কোরআনের যে বিকল্প নেই, তা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রথম তেইশ বছরের আন্দোলন জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর পরবর্তী তেইশ বছরের আন্দোলন যখন ওহীর জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, তখনই তিনি শোষিত নিপীড়িত ও নির্যাতিত আর্ত মানবতাকে মহামুক্তির স্বর্ণ শিখরে উপনিত করতে সফল হয়েছেন।

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, মানুষের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তাধারা দিয়ে মানুষের সমস্যার সমাধান কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে বিধান দিয়েছেন, সেই বিধান প্রতিষ্ঠিত করেই শান্তির আশা করা যেতে পারে। এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, শান্তি এবং অশান্তি এই দুটো জিনিসই মানুষের ঈমান-আকীদা, চিন্তা-চেতনা, সৎকর্ম ও অসৎকর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا–

যে ব্যক্তি সৎকাজ করলো, তার সৎকাজ তার কল্যাণ ও শান্তির কারণ হবে, আর যে ব্যক্তি অন্যায়-অপরাধ করলো, তার কৃত অপরাধের অনিবার্য পরিণতি তারই ওপর বর্তাবে-তার কৃত অন্যায়-অপরাধ তার অশান্তি ও অকল্যাণের কারণ হবে। (সূরা হামীম সিজদাহ্-৪৬)

শান্তি লাভের একমাত্র পথই হলো মানুষের আপন মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান অনুসরণ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ–

তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে আর রাসূলের আনুগত্য করবে, এতে তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত প্রাপ্ত হবে। (সূরা নূর-৫৬)

www.pathagar.com

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্যই হলো শান্তি লাভের একমাত্র পথ। কেননা তিনিই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহী অবলম্বনে বিশ্ববাসীকে শান্তির পথপ্রদর্শন করেছেন। এ কারণেই তিনিই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে শান্তির দুত এবং প্রকৃত শান্তির দিশারী। সুতরাং মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত শান্তি লাভ করতে হলে আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ ব্যতীত বিকল্প কোনো পথ নেই।

www.pathagar.com

শান্তি- পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়

এই পৃথিবীতে কোন পদ্ধতিতে চললে শান্তি লাভ করা যাবে এবং পরকালের জীবনে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, সে কথাটি মহান আল্লাহ গোপন রাখেননি, তিনি অনুগ্রহ করে তা প্রকাশ করেছেন। মানুষের শান্তি ও মুক্তির ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কথাটি সম্পূর্ণ Open secret করে দিয়েছেন। মানুষকে সঠিক পথ দান করার দায়িত্ব কোন মানুষের নয়, এমনকি এ দায়িত্ব কোন নবী-রাসূলের প্রতিও অর্পণ করা হয়নি। এই মহান দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ-

মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আমার। (সূরা আন নাহ্‌ল-৯)

মহান আল্লাহ যে সঠিক পথ দান করেছেন, সে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব হলো নবী-রাসূলদের। তাঁরা হলেন শান্তির পথপ্রদর্শনকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী, সতর্ককারী, সুসংবাদ দানকারী, অবিশ্বাসীদের জন্য শান্তির সংবাদ দানকারী। মহান আল্লাহ মানুষ এ জন্য সৃষ্টি করেননি যে, পৃথিবীতে মানুষ অশান্তির সমুদ্রে হাবুডুবু খাবে এবং আখিরাতে তিনি সমস্ত মানুষকে দিয়ে জাহান্নাম পরিপূর্ণ করবেন। বরং সমস্ত মানুষ সত্য-সঠিক পথের অনুসারী হয়ে পৃথিবীতে শান্তিময় জীবন-যাপন করবে এবং পরকালের জীবনে জান্নাতের অধিকারী হবে, এটাই আল্লাহ তা'য়ালার প্রবল ইচ্ছা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ-يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে (সঠিক ও শান্তির পথে চলার দিশারী) এক উজ্জ্বল আলো আর এক সুস্পষ্ট বর্ণনাসম্পন্ন কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে চলবে আল্লাহ তাদেরকে উক্ত উজ্জ্বল আলো

www.pathagar.com

তথা কিতাবে মুবীনের আলোকে শান্তির পথ দেখাবেন। আর তাদেরকে (শিরক ও কুফরের বিভ্রান্তি ও অশান্তির) অন্ধকারসমূহ থেকে বের করে আলোর পথে-ঈমানের পথে নিয়ে যাবেন। তিনি তাদেরকে (ইহকালীন ও পরকালীন শান্তির সরল-সঠিক পথ দেখিয়ে দেবেন। (সূরা মায়েদাহ্-১৫-১৬)

উল্লেখিত আয়াতে 'শান্তি ও নিরাপত্তা' বলতে ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা, ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও ভ্রান্ত কর্মনীতি-পদ্ধতি এবং এসবের অশুভ ফলাফল থেকে মুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বা জাতি মহান আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের জীবনাদর্শ থেকে সঠিক পথনির্দেশনা গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি বা জাতি চিন্তা ও কর্মের বিপদ সঙ্কুল অবস্থা তথা ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করার প্রকৃত পথ কোন্‌টি, তা জেনে নিয়ে সঠিক পথ অনুসরণ তথা শান্তির পথে অগ্রসর হতে পারে। এই বিষয়টি অন্য আয়াতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا–

অতএব ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যা আমি অবতীর্ণ করেছি। (সূরা তাগাবুন-৮)

উল্লেখিত দুটো আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআন ও কোরআনের বাহক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এবং এতোদুভয়ের অনুকরণ-অনুসরণকে শিরক-কুফরের বিভ্রান্তি ও অশান্তির অন্ধকার থেকে মুক্তি, শান্তি-নিরাপত্তা ও কল্যাণের পাথেয় বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করে এবং ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহও এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামদের কথা ও প্রদর্শিত পথ অগ্রাহ্য-অমান্য করা এবং আখিরাতের জীবনেক অস্বীকার বা সে জীবনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করাই পৃথিবীর জাতিসমূহের অবনতি ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মূলীভূত কারণ আর এটাই অনস্বীকার্য সত্য। সুতরাং সেই ভ্রান্ত নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করে নিজেদের

www.pathagar.com

দুর্ভাগ্য টেনে এনে ধ্বংস গহ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়া কোনোক্রমেই উচিত হতে পারে না। বরং উচিত হলো ভ্রান্ত পথ অনুসরণ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ তাঁর রাসূল ও কোরআন কর্তৃক পেশ করা হিদায়াতের প্রতি ঈমান আনা।

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের শান্তির উৎস হিসাবে কোরআন দান করেছেন এবং এই কোরআনকে 'নূর' বা আলো হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আলো স্বাভাবিকভাবেই ভাস্বর ও স্বয়ং সমুদ্ভাসিত যা তার চুতষ্পার্শ্বের সেসব বস্তুসমূহকে উজ্জ্বল করে তোলে যা ইতোপূর্বে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো। আল্লাহর কোরআন অনুরূপ একটি মহান আলোকবর্তিকা, যার সত্যতা ও যথার্থতা স্বতস্ফূর্ত এবং স্বতঃউদ্ভাসিত। এর আলোকে মানুষ এমন দিক নির্দেশনা লাভ করতে পারে এবং এমন সত্য সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হয়, যার সন্ধান সে নিজের উপায়-উপকরণ ও বিবেক বুদ্ধির মাধ্যমে লাভ করতে পারে না।

পক্ষান্তরে কোরআনের আলো যার কাছে রয়েছে, যার হৃদয় কোরআনের আলোয় আলোকিত থাকে, সে চিন্তা-চেতনা ও কর্মের অসংখ্য জটিল বন্ধুর পথের প্রত্যেক বাঁকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে এবং সত্য পথ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। এভাবে সে তার পৃথিবীর জীবনকালে সিরাতুল মুস্তাকিমে তথা সঠিক পথে এমনভাবে পদ নিক্ষেপ করতে পারে যে, প্রত্যেক পদেই সে অনুভব করতে পারে, ভ্রান্ত পথের দিকে নিয়ে যাওয়ার বাঁকাচোরা পথ কোন্ কোন্ দিকে গিয়েছে, ধ্বংসের পথ কোন্ দিকে ধাবিত হয়েছে আর এসব পথের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ কোন্ দিকে চলে গিয়েছে।

পৃথিবীর যাবতীয় জটিল সমস্যাসমূহকে রোগের সাথে তুলনা করা যায় এবং এসব রোগে মানব মন্ডলী আক্রান্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব রোগের উপশমের জন্যই কোরআন অবতীর্ণ করে বলেছেন, এই কোরআন হলো যাবতীয় রোগের চিকিৎসার উপকরণ তথা যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে এই কোরআনে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

আমি এই কোরআনের অবতরণ প্রক্রিয়ায় এমনসব বিষয় অবতীর্ণ করেছি যা মুমিনের জন্য নিরাময় ও রহমত। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮২)

অর্থাৎ যারা এ কোরআনকে নিজেদের পথপ্রদর্শক এবং নিজেদের জন্য আইন-কানুনের কিতাব তথা জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের জন্য তো এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত এবং তাদের যাবতীয় মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, সভ্যতা-সংস্কৃতিক রোগের নিরাময়। এই কোরআন ঈমানদার লোকদের জন্য শান্তির উপকরণ। উল্লেখিত আয়াতে 'শিফা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শিফা বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে কাছীর (রাহঃ) তাফসীরে ইবনে কাছীরে লিখেছেন–'কোরআন মাজীদ মানুষের অন্তরস্থ রোগব্যধিসমূহ দূর করে দেয়–অর্থাৎ মানুষের অন্তরে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে বিরাজমান সন্দেহ, কপটতা, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে শিরকের আকীদা-বিশ্বাস, দ্বীন গ্রহণে বক্রতা ও কুপ্রবৃত্তির আকর্ষণ জনিত অপবিত্রতার ময়লা বা আবর্জনা ইত্যাদি আত্মিক রোগ ব্যধির প্রত্যেকটি আক্রমণ থেকে কোরআন মানুষের অন্তরকে হেফাজত করে, মুক্ত রাখে তথা নির্মল করে দেয়।'

অপরদিকে এই কোরআন যে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর জন্য রহমত– এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে কাছীর লিখেছেন–'কোরআন মাজীদ যেভাবে চিকিৎসার উপকরণ, ঠিক একইভাবে তা রহমতও বটে। ঈমান, হিকমত, কল্যাণ, করুণা, সৎকার্যের প্রতি উৎসাহ ইত্যাদি–এর দ্বারা লাভ করা যায়। সে কেউই এর উপর ঈমান আনবে, একে সত্য মনে এর অনুসরণ করবে, এই কোরআন তাকে আল্লাহর রহমতের নীচে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে।'

অর্থাৎ এই কোরআন অধ্যয়নের মাধ্যমেই চিন্তা-গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে, মানুষের অন্তরাত্মাসমূহে ঈমান, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জ্ঞান, ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের সন্ধান এবং নেক কাজের আগ্রহ ইত্যাদি মহামূল্যবান উত্তম গুণাবলী অর্জিত হয়।

www.pathagar.com

আত্মার পবিত্রতা অর্জন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

এই পৃথিবী বা সৃষ্টিজগতে ক্রিয়াশীল যে নিয়ম রয়েছে, তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মই মহান আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এসব কিছু অনুভব করার জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের শ্রবণ শক্তি-দর্শন শক্তি দান করেছেন। চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মগজ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ –

মানুষকে আমি এমন এক অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি, যে সময় তার কোন চেতনাই ছিল না। পেটের ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও তার বলার ক্ষমতা ছিল না যে, তার ক্ষুধা পেয়েছে। সেই সাথে তাকে আমি তিনটি জিনিষ দান করেছি। তাকে শ্রবণ শক্তি দান করেছি। দৃষ্টি শক্তিদান করেছি এবং চিন্তা করার মত মগজ দিয়েছি।

জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, চোখ, কান খেল-তামাশার জন্য দেয়া হয়নি। প্রকৃতিকে অনুভব করার জন্য দেয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি কোন দিকে, কোন মহাশক্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, তা অনুধাবন করে তাঁর গোলামী-দাসত্ব করার জন্যই দেয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য চোখে ধরা পড়লো, কিন্তু বিশ্ব-স্রষ্টার প্রতি তার দাসত্বের অঙ্গুলি সংকেত ধরা পড়লো না। এই কান দিয়ে মানুষ প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু শুনলো, কিন্তু মহান আল্লাহর আহ্বান সে শুনলো না, তার কানে মহাসত্যের ডাক প্রবেশ করলো না।

যে জ্ঞান মানুষকে দেয়া হলো, সে জ্ঞান প্রয়োগ করে সে দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করলো, মানুষ যেন শকুনের থেকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দূর-বহু দূরের বস্তু দর্শন করতে সক্ষম হয়। সে আকাশ যান আবিষ্কার করলো যেন পাখির চেয়ে দ্রুত গতিতে

www.pathagar.com

মহাশূন্যে উড়তে পারে। স্থলপথে দ্রুত যান আবিষ্কার করলো যেন সে চিতা বাঘের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে ছুটতে পারে। সে সাবমেরিন আবিষ্কার করলো যেন মহাসাগরের অতল তলদেশে মাছের থেকেও দ্রুত গতিতে চলতে পারে।

মৃত্তিকা গভীরে কোথায় কি অবস্থান করছে, শতকোটি দূরে মহাশূন্যে কোন্ গ্রহের কি অবস্থা, তা পর্যবেক্ষণ করছে, মহাশূন্যে উড়ন্ত পাখী যেখানে পৌছতে সক্ষম নয়, মানুষ সেখানে তার গর্বিত পদচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে–অথচ তার আত্মার বিকাশ সাধনে সে চরম ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছে। এক আল্লাহর আনুগত্যের, দাসত্বের, গোলামীর মাধ্যমে মানুষের আত্মার বিকাশ সাধিত হয়, মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় এবং এটাই মানব জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত সাফল্য–এই ক্ষেত্রেই মানুষ ব্যর্থতার গ্লানী বহন করছে। আল্লাহর গোলামীর মাধ্যমে মানুষের মনুষত্ব বিকশিত হতে না দেখে কবি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

মুঝে এ ডর হ্যায় কে দিলে জিন্দা তু না মর যা–য়ে
কি জিন্দেগানী ইবারাত হ্যায় তেরে জিনেছে।

হে আমার জাগরিত আত্মা, আমি তোমার অপমৃত্যু ঘটার আশঙ্কা প্রকাশ করছি। সত্যই যদি তোমার অপমৃত্যু ঘটে, তাহলে আমার জীবিত থাকার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই।

বর্তমানে আমরা আমাদের আত্মার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কোনো ভূমিকা পালন করছি না। আমাদের অসাবধানতার কারণে, আমাদের অসচেতনতা–অবহেলার কারণে জীবন্ত আত্মার অপমৃত্যু ঘটছে। মানুষ তার দেহের সৌন্দর্য বর্ধিত করার লক্ষ্যে অসংখ্য উপকরণ আবিষ্কার করেছে। পোষাক-পরিচ্ছদের উন্নতির লক্ষ্যে প্রতিদিন নিত্য-নতুন ফ্যাশন বের করছে। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকশিত করার লক্ষ্যে আত্মার উন্নতি সাধন করার জন্য কোনো ধরনের প্রচেষ্টা নেই। মানুষকে হৃদয় দেয়া হলো, চোখ-কান দেয়া হলো, চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মগজ দেয়া হলো, এসব প্রয়োগ করে তারা বস্তুগত উন্নতি সাধন করলো। অথচ প্রধান যে দিকটির উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে এসব দান করা হয়েছিল, সেদিকে তারা দৃষ্টিপাত করলো না। যারা

www.pathagar.com

এ ধরনের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, পবিত্র কোরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

أُولٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ–

এরা সব চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। (সূরা আরাফ-১৭৯)

কারণ মানুষের মনুষ্যত্ব তথা আত্মার বিকাশ সাধিত হলে মানুষ তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজের আত্মার পরিচিতি যখন লাভ করে, তখন সে তার প্রতিপালকের পরিচয়ও অবগত হতে পারে। কিন্তু আত্মাকে চেনা বা মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে মানুষের কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। এ জন্যই পবিত্র কোরআন এই শ্রেণীর মানুষকে পশুর সাথে তুলনাই শুধু করেনি, পশুর থেকেও অধম হিসাবে উপস্থাপন করেছে। কারণ এক শ্রেণীর মানুষ তার মনিবের পরিচয় না জানলেও পশু তার মনিবের পরিচয় জানে। কুকুর তার মনিবকে চিনে এবং মনিবের আদেশ পালনে তৎপর থাকে। অথচ একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহকে চিনে না, তাঁকে অস্বীকার করে। সুতরাং ঐ অস্বীকারকারী মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণীর সম্মান ও মর্যাদা মনিবের কাছে অনেক বেশী।

মানুষের আত্মা কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে বিকশিত হবে, তা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কারণ এই আত্মার অবস্থান, তার আকার-আকৃতি সম্পর্কে মানুষ অবগত নয় এবং সে জ্ঞানও মানুষের নেই। সুতরাং যে জিনিস সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক কোনো জ্ঞান নেই, সেই জিনিসের উন্নতি ও বিকাশ সাধন মানুষ করবে কিভাবে?

এ জন্য আত্মার বিকাশ ও উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে আত্মার যিনি স্রষ্টা–যিনি আত্মার আকার-আকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন, তিনিই পদ্ধতি দান করেছেন। একটি বিষয়ের প্রতি মানুষকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। পৃথিবীতে মানুষসহ জীবকুলের জীবিত থাকার প্রয়োজনে, জীবন ধারণের জন্যে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অসংখ্য খাদ্য উপকরণের একটিও মহাশূন্যে পাওয়া যাবে না। সমস্ত খাদ্য পাওয়া যায় জল-স্থলে। খাদ্যসমূহ উৎপাদনের ক্ষেত্রই হলো পানি আর

www.pathagar.com

মাটি। কারণ মানুষের দেহ নির্মিত হয়েছে মাটির সার-নির্যাস থেকে। যা দিয়ে দেহ নির্মিত হয়েছে, দেহের প্রয়োজনে তা থেকেই উৎপাদিত খাদ্য দেহ গ্রহণ করে দেহের উন্নতি সাধিত হয়।

কিন্তু দেহের চালিকা শক্তি হলো আত্মা বা রুহ্। এই রুহ্ মাটির সার-নির্যাস দিয়ে প্রস্তুত হয়নি। এ কারণে মাটি থেকে উৎপাদিত কোন খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা রুহের নেই। মৃত্তিকা থেকে রুহ্ আহরোণ করে দেহে প্রবিষ্ট করানো হয়নি, এ জন্য মাটিতে উৎপাদিত কোন খাদ্য দ্বারা রুহের বিকাশ সম্ভব নয়। যেখান থেকে রুহ্ মানব দেহে প্রেরণ করা হয়েছে, সেই স্থান থেকেই রুহের খাদ্যও প্রেরণ করা হয়েছে। রুহ্কে এই খাদ্যদান করলেই কেবল রুহ্ বিকশিত হয় তথা মনুষ্যত্বের উন্নতি সাধন হয়। এই রুহ্ সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার কোন শেষ নেই। আল্লাহর রাসূলকেও রুহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নের উত্তরে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেছিলেন–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً–

এরা আপনাকে রুহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দিন, এই রুহ্ আমার রব্ব-এর আদেশে আসে কিন্তু তোমরা সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছো। (বনী ইসরাঈল-৮৫)

এই রুহ্কে বিকশিত করার জন্য এর খাদ্য প্রয়োজন। রুহ্ আল্লাহর আদেশে আগমন করেছে আলমে আরওয়াহ্ থেকে আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার খাদ্যও প্রেরণ করেছেন লৌহ মাহ্ফুজ থেকে। লৌহ মাহ্ফুজ থেকে প্রেরিত রুহের সেই খাদ্যের নাম হলো কোরআন। এই কোরআন সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাভরে তিলাওয়াত করতে হবে, এর আদেশ-নিষেধ একাগ্রচিত্তে অনুসরণ করতে হবে। রুহের খাদ্যই হলো আল্লাহর কোরআন। দেহকে খাদ্যদান না করলে দেহ যেমন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে, কর্মের উপযোগী আর থাকে না–তেমনি আত্মাকেও খাদ্যদান না করলে আত্মা দুর্বল-নির্জীব হয়ে পড়ে। বাহন হিসাবে বা কৃষি কাজের জন্য যারা চতুষ্পদ জন্তু

www.pathagar.com

ব্যবহার করে, এসব জন্তুকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদান করতে হয়। নতুবা জন্তু কর্ম উপযোগী থাকে না। খাদ্যদান না করে জন্তুকে কর্মে নিয়োগ করলে জন্তু অক্ষমতার পরিচয়ই দেবে।

তেমনিভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও আত্মার উন্নতিকল্পে আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্য না দিলে সে নিজেকে এবং তার বাহন দেহকে কিভাবে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত করবে ? আত্মাকে তার প্রকৃত খাদ্য না দিলে আত্মা কি নিজেকে বিকশিত করতে পারে না ? অবশ্যই পারে। মানুষ যেমন তার প্রকৃত খাদ্য না পেলে বা দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকার লোকজন অখাদ্য-কুখাদ্য আহার করে নিজেদেরকে দুর্বল করে, তেমনি আত্মা তার প্রকৃত খাদ্য লাভ না করলে অখাদ্য-কুখাদ্য আহার করবে অর্থাৎ আত্মা কদর্য রূপে গর্হিত পথে ধাবিত হবে। আত্মার প্রকৃত খাদ্য কোরআন যদি সে লাভ করতো, তাহলে সে নিজেকে বিকশিত করতো সুন্দর ও কল্যাণের পথে। সে আত্মার দ্বারায় পৃথিবীতে মানবতার কল্যাণ সাধিত হতো। গোটা পৃথিবী জান্নাতের এক উদ্যানে পরিণত হতো।

কোরআন নামক খাদ্য লাভকারী আত্মা সুন্দর আর কল্যাণের সুষমায় বিকশিত হয়ে শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতন মুক্ত নিরাপত্তাপূর্ণ, ভীতিহীন সুখী সমৃদ্ধশালী এক পৃথিবী মানবতাকে উপহার দিতে সক্ষম হতো। ইসলামের সোনালী যুগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, সে সময়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশের শাসকগোষ্ঠী পর্যন্ত সবাই দেহকে অতিরিক্ত খাদ্য দিয়ে স্ফিত না করে আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্য দিয়ে পরিপুষ্ট করতেন। ফলে তারা পৃথিবীতে সত্য আর কল্যাণের পতাকা উড্ডিন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুদূর অতীতে এবং বর্তমানেও যারা আত্মাতে তার প্রকৃত খাদ্য না দিয়ে দেহকে বৈধ-অবৈধ খাদ্য দিয়ে স্ফিত করেছে বা করছে, তারা সত্য, সুন্দর আর কল্যাণের হন্তারক হিসাবে পৃথিবী ব্যাপী শোষণ, নির্যাতন আর অশান্তির দাবানল বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। কারণ এসব আত্মা প্রকৃত খাদ্য যখন লাভ করছে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই আত্মা অখাদ্য আর কুখাদ্য লাভ করে অন্যায় অসুন্দরের পথেই ধাবিত হচ্ছে। এর বাস্তব প্রমাণ

www.pathagar.com

পাওয়া যাবে আশে-পাশে বিচরণশীল মানুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই। সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্যদান করে–অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াত করে, কোরআনের বিধান অনুসারে চলে, তারা সত্য সুন্দর আর কল্যাণ পিয়াসী। আর যারা আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্যদান করে না–অর্থাৎ কোরআনের বিপরীত পথে চলে, তারা সত্য সুন্দর কল্যাণের হন্তারক, অশান্তি সৃষ্টিকারী, অরাজকতা সৃষ্টিকারী ও মানবতার ধ্বংস সাধনকারী। এই কোরআনই আত্মার একমাত্র উৎকৃষ্ট খাদ্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ–

আমি এদের কাছে এমন একটি কিতাব এনে দিয়েছি যাকে আমি জ্ঞান-তথ্যে সুবিস্তৃত বানিয়েছি এবং যারা ঈমান রাখে এমন সব লোকদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ। (সূরা আ'রাফ-৫২)

এই কোরআন মানুষকে নিরাময়তা দান করে। কলুষিত আত্মাকে সুন্দর শুভ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। আত্মার কলুষ-কালিমা দূর করে। এই কোরআন মানুষকে সত্য সহজ সরল পথপ্রদর্শন করে। মানুষকে নিরাময়তা দান করে প্রকৃত সত্যে উপনীত করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ–

এদেরকে বলো, এই কোরআন ঈমানদার লোকদের জন্য তো হেদায়াত ও নিরাময়তা। (সূরা হামীম সিজ্‌দা)

এই কোরআন মানুষের আত্মাকে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্যবোধ শিক্ষা দেয়। কোরআন প্রদর্শিত পথে যে আত্মা ধাবিত হয়, সে আত্মার দ্বারাই পৃথিবীতে মানবতা বিকশিত হয়। সুতরাং কোরআন তিলাওয়াত করে এবং এর বিধান নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে আত্মাকে বিকশিত করতে হবে, তাহলেই কেবল ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় করা সম্ভব হবে এবং পৃথিবীতে ও আখিরাতে শান্তি লাভ করা যাবে।

www.pathagar.com

অবৈধ পথে উপার্জন, হারাম খাদ্য-হারাম কাজ ও সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হলে মানুষের আত্মা কলুষ মুক্ত হয় এবং এই আত্মার গতি হয় উর্ধ্ব মুখী। হালাল খাদ্য গ্রহণ ও হালাল কর্মসমূহ সম্পাদন করতে সক্ষম হলে আত্মার পবিত্রতা লাভ করা যায় এবং এই পবিত্র আত্মাসম্পন্ন লোকদের দ্বারা যেসব কর্মসম্পন্ন হবে, তা হবে উত্তম ও কল্যাণকর। হারাম উপার্জন, হারাম খাদ্য ভক্ষণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে অশ্লীল ও খারাপ বিষয়াদিতে জড়িয়ে পড়লে মানুষের আত্মা হয় কলুষিত এবং এই আত্মার গতি হয় নিম্ন মুখী। কলুষিত আত্মাসম্পন্ন লোকদের কর্ম হয় অকল্যাণকর আর এ ধরনের লোকদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা বৃথা। তাদের দ্বারা নোংরা, অশ্লীল, অন্যায় ও খারাপ কার্যকলাপই সংঘটিত হতে থাকে। এ জন্য আত্মাকে পবিত্র রাখতে হবে এবং আত্মার খাদ্য হিসাবে যে কোরআন আল্লাহ তা'য়ালা অবতীর্ণ করেছেন, তা অনুসরণ করতে হবে।

আত্মা যদি কলুষিত হয় তাহলে দেহের চাকচিক্যের কোনোই মূল্য নেই। দেহের অভ্যন্তরে যে কাল্‌ব রয়েছে, এই কাল্‌বের সুচিতার ওপরই নির্ভর করে মানুষের যাবতীয় কর্মের সুচিতা। এই কাল্‌ব যদি কলুষিত হয়, তাহলে গোটা দেহই কলুষিত হয়ে যায়। নবী করীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

الا انّ فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الاوهي القلب–

সাবধান! মানুষের দেহাভ্যন্তরে গোস্তের একটি টুকরা রয়েছে। সে গোস্তের টুকরাটি যখন ভালো ও সুস্থ থাকবে তখন সম্পূর্ণ শরীরই ভালো ও সুস্থ থাকবে। আর উক্ত গোস্তের টুকরাটি যখন বিনষ্ট ও কলুষিত হয়ে যাবে তখন সম্পূর্ণ শরীরটিই খারাপ ও বিনষ্ট হয়ে যাবে। সাবধান! ভালো করে জেনে রাখবে, সে গোস্তের টুকরাটি হলো মানুষের কাল্‌ব বা আন্তরাত্মা।

আল্লাহর বিধান অমান্য করে নিজের খেয়াল খুশী অনুসারে জীবন পরিচালনা করার কারণে যাদের দেহের সেই গোস্তের টুকরাটি অর্থাৎ অন্তরাত্মা কলুষিত হয়ে গিয়েছে, সেই আত্মা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পুনরায় তা যথাযথ রূপে প্রতিস্থাপন করার উপায়

www.pathagar.com

হিসাবে আল্লাহর রাসূল দিক নির্দেশনা দিয়েছেন–

لكل شئ صقالة القلوب ذكر الله–

প্রত্যেক বস্তুর মরিচা বা ময়লা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা রয়েছে। আর মানুষের অন্তরাত্মার মরিচা বা ময়লা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালার যিকির।

অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করার অর্থই হলো আল্লাহ তা'য়ালার যিকির করা। যে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণে জাগরুক রাখার জন্য নামাজ-রোজা আদায় করা হচ্ছে, তাসবীহ্ ও কোরআন তিলাওয়াত করা হচ্ছে, জীবনের প্রত্যেকটি কাজ করার সময় সেই আল্লাহকে স্মরণে জাগরুক রেখে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কার্য সম্পাদন করার নামই হলো আল্লাহর যিকির করা। এ জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

حرك لسانك بذكر الله ما استطعت–

তুমি যতো বেশী পারো জিহ্বাকে নাড়া-চাড়া করে আল্লাহর যিকির করতে থাকো।

এই হাদীসের অর্থ শুধুমাত্র এটা নয় যে, মানুষ সব সময় তার জিহ্বা দিয়ে 'আল্লাহ আল্লাহু' নাম জপতে থাকবে। বরং এর অর্থ হলো, মানুষ তার জীবনের প্রত্যেক কাজ সম্পাদন করবে আপন প্রভু মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে। কাজ যখন শুরু করবে, তখন সে আল্লাহর নামে শুরু করবে এবং কাজে বরকতের জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করবে। আবার কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে তখনও সেই আল্লাহরই সে প্রশংসা করবে–যিনি তাকে কাজ শেষ করার মতো শক্তি, সামর্থ ও সময়-সুযোগ দিয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারে সে মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করবে, তাঁরই দয়া-করুণা ভিক্ষা চাইবে এবং হৃদয়ে একমাত্র তাঁরই ভয় জাগরুক রাখবে। একজন মানুষের ভেতরে যখন এই অবস্থার সৃষ্টি হবে, তখনই অনুভব করা যাবে, সে আল্লাহর যিকিরে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছে।

www.pathagar.com

মুখে মুখে 'আল্লাহ আল্লাহু' নাম জপ করা হলো, আর অপরদিকে আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান দ্বারা পরিচালিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট চিত্তে আনুগত্য প্রদর্শন করা হলো। জীবনের যাবতীয় কর্মসমূহ কোরআন-সুন্নাহর বিপরীত আইন-কানুন দ্বারা সম্পাদন করা হলো। যে আল্লাহর নামের যিকির শ্রদ্ধাভরে করা হলো, সেই আল্লাহর বিধানের বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতির সয়লাব থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য মসজিদ ও খানকার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা হলো, এর নাম আল্লাহর যিকির নয়। বরং মুখে যে আল্লাহর যিকির করা হচ্ছে, সেই আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোরআনের বিপরীত স্রোতের মুখে বুক টান করে দাঁড়িয়ে তার গতিরোধের চেষ্টা করার নাম আল্লাহর যিকির করা।

এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সংশোধনের বাস্তব ও কার্যকর কর্মসূচী পেশ করেছেন। এই পথের যথাযথ অনুসরণ মানুষের পৃথিবীতে শান্তি ও আখিরাতের জীবনে মুক্তির একমাত্র পথ– এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমাদের সলফে সালেহীন, হক্কানী ওলামা-মাশায়েখ ও বুযুর্গানেদ্বীন কোরআন ও সুন্নাহ থেকেই আত্মশুদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গ্রহণ করেছেন এবং এ পথে তাঁরা যথেষ্ট সফলতাও অর্জন করেছেন। তাঁদেরকে অনুসরণ করেই একদল মানুষ আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল-প্রেমে উন্নতির উচ্চমার্গে উপনীত হয়েছেন। এ পথে তাঁদের পরিশ্রমের ফলশ্রুতি হিসাবে পৃথিবীর অগণিত মানুষ মুসলমান হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে এবং আমরাও তাঁদেরকে অনুসরণ করে মুসলমান হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তাঁরা আমাদেরকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার পথ সহজ ও সুগম করে দিয়েছেন। এ জন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের এর উত্তম বিনিময় দান করুন।

বর্তমানে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট সুযোগ থাকার পরও যেমন আল্লাহর বিধান অনুসরণের ব্যাপারে আন্তরিক নই, অনুরূপভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হচ্ছি। সমাজে ও রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে দায়িত্ব ও

www.pathagar.com

কর্তব্য পালন করা উচিত ছিলো, আমরা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছি– এর এজন্যই আমরা অশান্তি নামক দানব কর্তৃক জীবনের সর্বত্র পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছি। এই অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বর্তমানে সচেতন মুসলমানদের কর্তব্য হলো, নামাজ-রোজা আদায়, হজ্জ পালন, যাকাত আদায়, ঈদ ও জুমা আদায়ের ব্যাপারে যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়, অনুরূপ গুরুত্ব দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে কোরআন-সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করা। আর এই প্রচেষ্টা আমাদের জন্য পরিপূর্ণ মুসলমান হবার জন্যও অপরিহার্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। (সূরা বাকারা)

www.pathagar.com

শান্তির ঝর্ণাধারা

যে শান্তির আশায় অপেক্ষায় এ আকাশ ও পৃথিবী, পৃথিবীর প্রতিটি অনু-পরমাণু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করেছে, অবশেষে প্রতীক্ষার প্রহর অতিবাহিত হয়েছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শান্তির সেই ঝর্ণাধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত করেছেন। বিশ্ব মানবতার দুয়ারে শান্তি উপস্থিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ–

হে রাসূল! আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত হিসাবেই প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল মাআনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই মহান আদর্শের ধারক-বাহক রূপে এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন–যা বিশ্ব মানবতার জন্য ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্যের কারণ।

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাছীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত উক্ত রহমতকে গ্রহণ করলো আর এই নে'মাতের শোকর আদায় করলো, সে ব্যক্তি পৃথিবী ও আখিরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উক্ত রহমতকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং অস্বীকার করলো সে ব্যক্তি পৃথিবী ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য ই রহমত যে, তিনি শান্তির পাথেয় ইসলামী জীবন বিধানের ধারক ও বাহক।'

পৃথিবীতে বর্তমানে ধর্মের নামে যেসব মতবাদ-মতাদর্শ চালু রয়েছে, যেসব মতবাদ তার আবিষ্কারক ও প্রতিষ্ঠাতার নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ইসলামের দুশমনরা ইসলামকেও মানুষের বানানো আদর্শ হিসাবে পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিত করার হীন লক্ষ্যে প্রচার করে থাকে যে, 'ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' এবং ইসলামকে তারা 'Mohamedanism' বা 'মুহাম্মাদীবাদ' হিসাবে প্রচার করে থাকে। ইসলাম বিদ্বেষী এসব লোকজন তাদের বক্তৃতা ও লেখায় এসব ভিত্তিহীন কথা উল্লেখ করে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ মানুষ যেন এ কথাই বুঝে যে, অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামও একটি ধর্ম এবং এই ধর্মের রচয়িতা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

'ধর্ম' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত এবং এই শব্দটি বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের কোথাও এমন কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, যে শব্দের বাংলা অনুবাদ 'ধর্ম' এবং ইংরেজী অনুবাদ 'Religion' করা যেতে পারে। কোরআন ও হাদীসে 'আদ্বীন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার বাংলা অনুবাদ হলো, 'জীবন ব্যবস্থা'। সুতরাং ইসলাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত মতবাদ বা মতাদর্শ নয়। ইসলাম সম্পর্কে তিনি যা কিছুই বলেছেন, তা শুধুমাত্র ওহীর ভিত্তিতেই বলেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى–

সে নিজের মনের ইচ্ছায় কথা বলে না। এটা তো একটা ওহী, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা নজম-৩-৪)

অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে মনগড়া কিছুই বলেন না, দ্বীন সম্পর্কে তিনি যা কিছুই বলেন তা তাঁর ওপর ওহী করা হয়। পবিত্র কোরআনের আরেক আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ–

হে রাসূল! আপনি সেসব কিছু পৌঁছে দিন যা আপনার প্রতি আপনার রব-এর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা মায়েদাহ্-৬৭)

সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন ও সুন্নাহর যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা তাঁর মনগড়া বা মন-মস্তিষ্ক প্রসূত কোনো চিন্তাধারা নয়। বরং এটা হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্ভুল ইল্‌ম থেকে আগত পবিত্র

www.pathagar.com

দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। এই মহান জীবন বিধান তথা আল্লাহর দ্বীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পবিত্র সাহাবায়ে কেরামের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তদানীন্তন মানব সমাজে। ইসলামের বিধি-বিধানের সার্বিক অনুসরণই যে বিশ্ব মানবতার একমাত্র গ্যারান্টি, তা প্রমাণিত হয়েছে কোরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে। ইসলামই যে মানবতাকে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা দিতে সক্ষম–এই বিষয়টি কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়। এই বিষয়টি একটি অটল বাস্তবতা। ১৯১৭ সনের পূর্বে সমাজতন্ত্রের অনুসারীরা সমাজতন্ত্রের প্রশংসায় ছিলো পঞ্চমুখ। তারা দাবি করতো, সমাজতন্ত্র মানুষকে মুক্তি দিতে সক্ষম। ১৯১৭ সনে সমাজতন্ত্র সর্বপ্রথম রাশিয়াসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং পৃথিবীর মানুষ দেখলো সমাজতন্ত্রের কদর্য চেহারা।

আর আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ইসলাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো, তারপর সে আদর্শ ক্রমশ পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করলো। অর্ধ পৃথিবী পরিচালিত হলো ইসলামী আদর্শ দ্বারা। গোটা পৃথিবীবাসী অবলোকন করলো, আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করার কারণে মানুষ কিভাবে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছে। কারণ এটা মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে ওয়াদা করা হয়েছে, যে জনগোষ্ঠী আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া জীবন ব্যবস্থা অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করবে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, উন্নতি-প্রগতি দান করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ –

জনপদের লোকেরা যদি ঈমান আনতো ও আল্লাহকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকাশ ও জমিনের বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম। (সূরা আ'রাফ-৯৬)

সুতরাং ইসলামই যে শান্তির একমাত্র গ্যারান্টি– এটা কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়। ইসলাম অর্ধ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, কিভাবে সে মানুষকে

www.pathagar.com

শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারে। আল্লাহর রাসূলের পরে খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক পরিচালিত সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বর্ণালী ইতিহাস পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সাক্ষ্য দেবে যে, মানব সমাজের সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী জীবন বিধানই এমন একটি নিশ্চিত ব্যবস্থা, যা একটি অটল বাস্তবতা। বর্তমানেও লক্ষ্য করে দেখুন, পৃথিবীর মুসলিম ও অমুসলিম দেশসমূহে অপরাধের খতিয়ানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, অমুসলিম দেশসমূহে কঠিন আইন-শৃংখলার বেষ্টনি ভেদে করে প্রতি ঘন্টায় যে অপরাধ সংঘটিত হয়, মুসলিম দেশসমূহে তা এক মাসেও সংঘটিত হয় না।

সুসভ্য দেশ হিসাবে দাবিদার আমেরিকায় জারজ সন্তানের আধিক্যের কারণে সেখানে সরকারীভাবে জারজ সন্তান লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কারণে সেখানে সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে পিতার তুলনায় মায়ের নামকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ কতক ক্ষেত্রে মা স্বয়ং জানেও না, তার সন্তানের পিতা কে। মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির সামান্য ছিটেফোটা রয়েছে বলে, এসব দেশে অপরাধ প্রবণতা কম এবং ইসলামপন্থী লোকেরাই সর্বাধিক শান্তি প্রিয়। বিভিন্ন ধর্মের লোকজন মুসলমানদের সাথে আপনজনের মতো মিলেমিশে একই এলাকায় বসবাস করছে, অথচ কোনো সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষে কোনো মুসলমান আক্রান্ত হয় না। বর্ণবাদের নাম গন্ধও মুসলমানদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর একমাত্র কারণ হলো মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ইসলাম। ইসলামের অবদানেই মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা ও বর্ণবাদী দৃষ্টি ভঙ্গি নেই, এ কারণেই তারা অন্যান্য জাতির সাথে মিলেমিশে শান্তির ও স্বস্তির সাথে চলতে পারছে।

পার্শ্ববর্তী দেশে যেখানে ক্ষণে ক্ষণে সাম্প্রদায়িক দানব মুখ ব্যদন করে মুসমানদেরকে নির্মূল করতে উদ্যত হচ্ছে, অথচ সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের মুসলমানরা তার অমুসলিম প্রতিবেশীকে শান্তি ও স্বস্তির সাথে বসবাসের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। কারণ বর্তমানে মুসলমানরা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার সুযোগ না পেলেও তাদের হৃদয়ে আল্লাহ ও রাসূলের পবিত্র শিক্ষার ছোঁয়া

www.pathagar.com

রয়েছে। এই শিক্ষার বরকতেই তারা অমুসলিমদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুকে নিজের জান-মালের অনুরূপ মনে করে থাকে। সুতরাং বর্তমানেও মুসলিম দেশসমূহের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এ কথাই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, ইসলামই হলো একমাত্র শান্তি, স্বস্তি নিরাপত্তার একমাত্র গ্যারান্টি।

এখানে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, কোরআন ও সুন্নাহ অক্ষত অবস্থায় থাকার পরও মুসলিম দেশসমূহে যে শান্তি বিরাজ করার কথা ছিলো, তা নেই কেনো? একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে। কূপে পানি বিদ্যমান এবং পানি উত্তোলনের পাত্র, রশিসহ অন্যান্য সরঞ্জাম সবই রয়েছে। সবকিছু থাকার পরও পিপাসায় কাতর একজন লোক কূপ থেকে পানি উত্তোলন করে পান করছে না, ফলে তার পিপাসাও নিবৃত্ত হচ্ছে না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তো এ কথা বলা যায় না যে, উক্ত কূপে পানি বিদ্যমান নেই বলে লোকটি পানি পান করে নিজের পিপাসা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না। আসলে লোকটির পিপাসা নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে কূপ থেকে পানি উত্তোলনের সরঞ্জাম কাজে লাগিয়ে পানি উত্তোলন করছে না। অনুরূপভাবে বিশ্বমানবতা ও মুসলমানদের সামনে কোরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী জীবন বিধান অবিকৃত-অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। মানুষ যদি এই জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ না করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা অশান্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে।

রোগী যদি ডাক্তারের দেয়া প্রেসক্রিপশন অনুসারে ওষুধ কিনে ব্যবহার না করে শুধুমাত্র নিয়মিতভাবে প্রেসক্রিপশন পাঠ করতে থাকে, তাহলে রোগী কোনোক্রমেই আরোগ্য লাভ করবে না। সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহ শান্তির যে পথের সন্ধান দিয়েছে, সেই পথ অনুসরণ করতে হবে। ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে, তাহলেই শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা যাবে, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

আল কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টি করে তাকে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে মৃত্তিকার সার-নির্যাস দিয়ে মানুষের সর্বাধিক সুন্দর কাঠামো নির্মাণ করা হলো এবং এরপরে তার মধ্যে রুহ্ দান করা হলো, সৃষ্টি হলো জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। নূরের তৈরী নিষ্পাপ ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের সামনে নত হওয়ার আদেশ দিলেন, তাঁরা নত হলো। এভাবে প্রমাণ হয়ে গেলো যে, ফেরেশ্তারা নূরের তৈরী নিষ্পাপ হলেও মাটির তৈরী মানুষই অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ–

আমি আদম সন্তানকে সম্মানীত করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল-৭০)

মানুষকে কেনো এত অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী করে সৃষ্টি করা হলো এবং কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হলো? এ প্রশ্নের জবাবও মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন –

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ–

আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে কেবল আমরাই দাসত্ব করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। (সূরা যারিয়াত-৫৬)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন সমস্ত শক্তির উৎস এবং সবথেকে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁর গোলামী করার জন্য যাদেরকে সৃষ্টি করা হলো, স্বাভাবিকভাবেই তারাও সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এই সম্মান ও মর্যাদা সৃষ্টিগতভাবে মানুষ হবার কারণে নয়– বরং তারা আল্লাহর গোলামী করবে, এ কারণেরই তাদের সম্মান ও মর্যাদা সর্বাধিক। সুতরাং মানুষের জন্য এটা কোনোক্রমেই শোভনীয় যে, তারা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করবে আর এটা মানুষের সম্মান ও মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। আল্লাহ ব্যতীত

www.pathagar.com

অন্য কারো গোলামী করা মানুষের সম্মান ও মর্যাদার বিপরীত কাজ। এই মানুষে যেনো নিজের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তিময় জীবনকাল অতিবাহিত করে পরকালে জান্নাতের অধিকারী হতে পারে, এ লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'য়ালা নিজের অসীম জ্ঞান ভান্ডার থেকে পবিত্র কোরআনুল কারীম অবতীর্ণ করে মানুষের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার রক্ষা কবজ হলো আল কোরআন।

একমাত্র এই কোরআনের জ্ঞানগর্ভ অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় শিক্ষা মানব জাতিকে সভ্যতা, উন্নতি-প্রগতি ও জ্ঞানের সুউচ্চ মার্গে পৌঁছে দিতে সক্ষম। সম্মান-মর্যাদা ও জ্ঞানের উচ্চ সোপানে উপনীত হবার জন্য মানুষের কর্তব্য হলো, আল কোরআনকে নিয়মিত পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা এবং নিয়মিত কোরআন নিয়ে গবেষণা করা। সর্বোপরি কোরআনের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের আলোকে জীবন পরিচালনায় ইস্পাত কঠিন দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়া। এক কথায় কোরআনুল কারীমের যথাযথ আনুগত্য করতে হবে এবং সে আনুগত্য হতে হবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহুমদের জীবনাদর্শের মানদেন্ডর নিরিখে। কোরআনুল কারীমের আনুগত্য কিভাবে করতে হবে– তার বাস্তব নমুনা হলেন আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সম্মানীত সাহাবায়ে কেরাম। সাহাবায়ে কেরামদেরকে পাশ কাটিয়ে বা তাঁদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে কোরআনের আনুগত্য করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

যাঁর ওপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহর সেই রাসূল স্বশরীরে তাঁদের সামনে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁদেরকে কোরআন অনুসরণের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁরা যেভাবে কোরআন বুঝেছেন, অনুরূপভাবে কোরআন বুঝার যোগ্যতা তাঁদের পরবর্তী কোনো যুগের মানুষের পক্ষেই আর সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁরা ছিলেন কোরআনের আলোয় আলোকিত সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং জ্ঞানের জগতে তাঁদের প্রত্যেকে ছিলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ। জীবন পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রতি মুহূর্তে কোরআনের আলোয়

www.pathagar.com

পথ চলেছেন, কোরআনের কাছ থেকে তাঁরা অভ্রান্ত পথনির্দেশনা লাভ করে সঠিক পথে অগ্রসর হয়েছেন। কোরআনের আলোয় যাঁরা পথ পরিক্রমা অতিক্রম করে, তাঁদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ প্রশংসা করে বলেন–

فَبَشِّرْ عِبَادِ–الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَه–
اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰه وَاُولٰئِكَ هُمْ اُوا لُوا الاَلْبَابِ–

হে রাসূল! আপনি আমার সে সকল নেক বান্দাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন– যারা আমার কোরআনের কথা অন্তর দিয়ে শোনে এবং এর উত্তম বিষয়াবলীকে অনুসরণ করে। তারাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা সঠিক পথ দেখিয়েছেন, আর এরাই হলো সর্বাধিক বোধশক্তি সম্পন্ন লোক। (সূরা যুমার-১৭-১৮)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে গোটা মানব সভ্যতা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো, একথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত রয়েছেন। মানবতা মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিলো এবং পৃথিবী তার যাবতীয় উপকরণসহ ধ্বংসের ভীতিপ্রদ ও গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে চলছিলো। রাসূলের আবির্ভাবকালে সারা পৃথিবীর অবস্থা সেই ঘরের অনুরূপ ছিলো, যার ভিত্তি এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের তীব্র আঘাতে ভঙ্গর করে দিয়েছিলো। পৃথিবীর মানুষগুলোর অস্তিত্ব নিজেদের দৃষ্টিতেই নিজেরা যেন ছিলো নগণ্য ও মূল্যহীন। বৃক্ষ, তরু-লতা, প্রস্তরখন্ড, আগুন-পানি ও ঊর্ধ্ব জগতের গ্রহ-নক্ষত্র এবং তারকারাজিসহ বস্তুমাত্রই উপাস্য হিসাবে মানুষের কাছে পূজিত হচ্ছিলো।

মানুষের চিন্তার জগতে এতটাই স্থবিরতা ও বিশৃংখলতা নেমে এসেছিলো যে, দৈনন্দিন জীবনের স্থুল সত্যগুলো অনুধাবন করতেও তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিলো এবং তাদের অনুভূতি ভুল পথে চলছিলো। স্থুল ও সহজবোধ্য জ্ঞানও তাদের কাছে সূক্ষ্ম ও অবোধগম্য এবং সূক্ষ্ম ও অবোধ্যগুলোও তাদের কাছে স্থুল ও সহজবোধ্যে পরিণত হয়েছিলো। নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ও তাদের কাছে সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত এবং সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত বিষয়ও তাদের কাছে নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিলো। রুচি তাদের এতটাই বিকৃত হয়ে পড়েছিলো যে, তিক্ত ও বিস্বাদ

www.pathagar.com

জিনিসও সুস্বাদু এবং সুস্বাদু জিনিসও তাদের কাছে তিক্ত ও বিস্বাদ বলে বোধ হচ্ছিলো। তাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো–ফলে বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্খীদের সাথে শত্রুতা এবং শত্রু ও অকল্যাণকামীদের সাথে ছিলো তাদের গভীর বন্ধুত্ব ও মিত্রতা।

তদানীন্তন পৃথিবীতে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, প্রতিটি বস্তুই যেন ভুল আকার-আকৃতিতে ও ভুল স্থানে সজ্জিত ছিলো। সে সমাজে অরণ্যে বসবাসের উপযোগী হিংস্র নেকড়ে তুল্য মানুষগুলোকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করা হয়েছিলো। সে সমাজে দুরাচারী–অপরাধীরা ছিলো সৌভাগ্যবান ও পরিতৃপ্ত আর সদাচারী চরিত্রবান লোকগুলো ছিলো অপাংক্তেয়, দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট। সদাচরণ এবং সচ্চরিত্রতার চাইতে বড় অপরাধ ও বোকামি আর অসচ্চরিত্র ও অসদাচরণের চাইতে বড় যোগ্যতা ও গুণ সে সমাজে আর কিছুই ছিলো না। গোটা সমাজের আচার-আচরণ ছিলো ধ্বংসাত্মক যা সারা দুনিয়াকেই ধ্বংসের প্রান্তে উপনীত করেছিলো। শাসক শ্রেণী ও বিত্তবানরা অর্থ-সম্পদকে হাতের ময়লা এবং সাধারণ মানুষগুলোকে নিজেদের ক্রীতদাস মনে করতো। তথাকথিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দগণ সাধারণ মানুষের প্রভুর আসন দখল করেছিলো। তারা সাধারণ লোকদের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করতো এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখাই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত মানবীয় গুণাবলীকে অত্যন্ত নির্দয়-নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করা হচ্ছিলো অথবা অপাত্রে ব্যয় করা হচ্ছিলো এবং মানবীয় গুণাবলী থেকে কোনো উপকার গ্রহণ বা যথাস্থানে তা ব্যবহার করা হচ্ছিলো না। বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য ব্যবহৃত হচ্ছিলো অন্যায়-অত্যাচারের ক্ষেত্রে। উদারতা ও বদান্যতা ব্যবহৃত হচ্ছিলো অপব্যয় ও অপচয়ে। আত্মমর্যাদাবোধ ব্যবহৃত হচ্ছিলো অহঙ্কার ও দাম্ভিকতায়। ধীশক্তি ও মেধা ব্যবহৃত হচ্ছিলো প্রতারণা ও অপকৌশলে। জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহৃত হচ্ছিলো অপরাধের নিত্য-নতুন কৌশল উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে এবং প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির নতুন নতুন উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

তদানীন্তন পৃথিবীতে মানব সম্পদ সুদূর অতীতকাল থেকেই বিনষ্ট হচ্ছিলো। সে সময়ে মানুষই ছিলো এমন কাঁচামাল যার ভাগ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কোনো কারিগর জোটেনি–যিনি মানব সম্পদ ব্যবহার করে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশুদ্ধ কাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম ছিলেন। মানুষগুলো ছিলো যেন সেই মূল্যবান শস্যক্ষেত্র, যা আগাছায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছিলো। এমন কারো অস্তিত্ব ছিলো না, সেই আগাছা উৎপাটিত করে শস্য ক্ষেত্রসমূহ শস্য ফলনের উপযোগী করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন। সংগঠিত ও সুশৃংখল জাতি-গোষ্ঠী ছিলো না, রাজনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত হতো সেই বদ্ধ উন্মাদদের দ্বারা, যারা সেই শক্তি ব্যবহার করতো ধ্বংসাত্মক পন্থায়। আরব-অনারব নির্বিশেষে সবাই অত্যন্ত বিকৃত জীবন-যাপন করছিলো।

যেসব বস্তু ছিলো মানুষের অধীন এবং পৃথিবীতে যা অস্তিত্ব লাভ করেছে মানুষেরই কল্যাণের জন্য, যেসব বস্তু মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং যাদের আদেশ-নিষেধ ও শাস্তি-পুরস্কার দেয়ার একবিন্দু ক্ষমতা নেই, মানুষ সেসব বস্তুকে উপাস্য জ্ঞানে তার সামনে মাথানত করতো। তদানীন্তন পৃথিবীর মানুষগুলো এমন বিকৃত ধর্মের অনুসারী ছিলো, আখিরাতের জীবন দূরে থাক–চলমান জীবন-যিন্দেগীতে যার কোনোই প্রভাব ছিলো না এবং তাদের স্বভাব-চরিত্রে, মন-মস্তিষ্কে ও আত্মার ওপর যার কোনোই ক্ষমতা ছিলো না।

ধর্মজ্ঞানে তারা যা অনুসরণ করতো, চরিত্র ও সমাজ সেই ধর্ম দ্বারা আদৌ প্রভাবিত ছিলো না। তাদের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এমন ছিলো যে, যেমন একজন শিল্পী বা কারিগর তার কর্ম শেষ করে ক্লান্তি জনিত কারণে বিশ্রামের জন্য নির্জনতা বেছে নিয়েছেন এবং পৃথিবী নামক সাম্রাজ্যটি সেইসব লোকদের হাতে তুলে দিয়েছেন, সমাজে যারা বিত্তবান এবং ধর্মীয় আসনে আসীন। এখন তারাই পৃথিবী নামক সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিপতি। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের ভাগ্য নিয়ন্তা তারাই এবং সমস্ত কিছুই তাদের ব্যবস্থাপনাধীন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি তাদের ঈমান এক ঐতিহাসিক অবহিতির চেয়ে অধিক কিছু ছিলো না। ইতিহাসের কোনো ছাত্রকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে,

www.pathagar.com

আণবিক বোমা প্রথম কোথায় ব্যবহৃত হয়েছিলো, ছাত্রটি তার সঠিক উত্তর দেবে বটে– কিন্তু সঠিক উত্তর বলার সময় তার মন-মস্তিষ্ক আণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতার ভয়ে আতঙ্কিত হবে না এবং তার ওপর কোনো প্রভাবও পড়বে না। ঠিক তেমনি ছিলো আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস। মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না, ফলে আল্লাহর প্রতি ঈমান–তাদের দৈনন্দিন জীবনধারায় কোনো প্রভাব বিস্তার করতো না। আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে তাঁর প্রতি অনুরাগ, ভয়, শ্রদ্ধা ছিলো না, তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও বড়ত্বের কোনো চিত্র তাদের হৃদয়ে ছিলো না। মহান আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিলো অস্পষ্ট, যার ভেতরে কোনো গভীরতা ও শক্তি ছিলো না। ফলে সেই ঈমানের বাস্তব রূপায়নও ছিল তাদের চরিত্রে অনুপস্থিত।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহী ও রিসালাতসহ প্রেরণ করলেন, যাতে করে তিনি মুমূর্ষ মানবতাকে নব জীবন দান করেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে পরিচালিত করেন। বিশ্বনবীর আবির্ভাব মানবমন্ডলীকে নবজীবন, নতুন আলোক-রশ্মি, নতুন উত্তাপ, নবতর শক্তি, নবতর প্রত্যয়, নতুন কৃষ্টি-সভ্যতা ও নতুন সমাজ দান করলো। তাঁর আগমনে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস এবং মানব জাতির কর্মে নবজীবনের সূত্রপাত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিলেন। তিনি যে কোরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করলেন, তা বাস্তবে অনুসরণ করার আহ্বান জানালেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাঁরা ঈমান আনলো, তাদের স্বভাব-চরিত্রে যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হলো এবং এই ঈমানদার লোকগুলোর দ্বারা মানব সমাজে যে বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হলো–ইতিহাসের বুকে তা ছিলো এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

www.pathagar.com

মানুষের ওপরে কোরআনের প্রভাব

কোরআনুল কারীমের এই বিস্ময়কর বিপ্লবের প্রতিটি বস্তুই ছিলো একক ও অনন্য। এর দ্রুততা, গভীরতা, বিশালতা ও সার্বজনীনতা, বিস্তৃতি এবং মানবীয় উপলব্ধির কাছাকাছি হওয়া–এসবই ছিল সেই বিস্ময়কর বিপ্লবের অনন্যদিকসমূহ। রাসূল কর্তৃক সাধিত এই বিপ্লব অপরাপর অলৌকিক ঘটনার ন্যায় কোনো জটিল বিষয় ও দুর্বোধ্য ছিলো না। এটা ছিলো ঈমানী বিপ্লব এবং সেই ঈমান তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্লাবিত করে বাস্তব জীবনের প্রত্যেক দিক ভাসিয়ে দিয়েছিলো। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং তাঁদেরকে ঈমানের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। কোরআনের শিক্ষা তাদের দৈহিক পবিত্রতা ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এনেছিলো এবং হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভক্তি সৃষ্টি করেছিলো। মহান আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখছেন এবং শুনছেন, তাঁর কাছে পার্থিব জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুর হিসাব দিতে হবে–আল্লাহর কোরআন এই অনুভূতি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলো। ফলে তাঁরা প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহর সমীপে ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত অবস্থায় দন্ডায়মান হতেন এবং রাতে আরামের শয্যা ত্যাগ করে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়তেন।

কোরআন তাঁদের মধ্যে উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিকতার সমুন্নতি, মনের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি এবং নফসের তথা প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছিলো। কোরআনই তাঁদের মধ্যে ঊর্ধ্বজগৎ ও যমীনের মালিকের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ ক্রমশ বৃদ্ধিই করছিলো এবং তাঁদেরকে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ, ক্ষমাশীলতা ও আত্মসংযমের পথে অগ্রসর করিয়েছিলো। রক্তাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ও যুদ্ধ-মারামারি তাঁদের অস্থি-মজ্জায় মিশ্রিত ছিলো এবং অস্ত্রের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিলো মজ্জাগত। কোরআন তাদের সেই হিংস্রতা ও সামরিক স্বভাব-প্রকৃতিকে এবং আরবীয় অহংবোধকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের সামনে তাঁরা মোমের মতোই গলে পড়তেন। সামান্যতম কাপুরুষতা যাদের চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যেতো না, তাঁরাই কোরআনের প্রভাবে

www.pathagar.com

অবৈধ কাজ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নিতেন। কোরআনের প্রভাবে তাঁরা এমন পরিবেশ-পরিস্থিতিকে সহ্য করেছিলেন, পৃথিবীর কোনো সম্প্রদায় অথবা কোনো জাতি-গোষ্ঠী সহ্য করেনি।

পৃথিবীর ইতিহাস এমন একটি ঘটনাও পেশ করতে পারবে না, যেখানে কোনো ঈমানদার মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে হিংসা, জিঘাংসা, রক্তপাত, মারামারি বা যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে। মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজিররা মদীনার আনসারদের সাথে গভীর মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো, অথচ ঈমান ব্যতীত তাঁদের মধ্যে অন্য কোনো যোগসূত্র ছিলো না। ইতিহাসে আদর্শের শক্তি ও প্রভাবের এটাই একক ও অসাধারণ দৃষ্টান্ত। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্র পরস্পরের প্রাণের দুশমন ছিলো। এক গোত্র অপর গোত্রের পরম আপনজনকে হত্যা করেছিলো। অঢেল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেও তাদের ভেতরে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব ছিলো না এবং মমতার বাগডোরে তাদেরকে বাঁধা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু একমাত্র ঈমানই তাদের হৃদয় থেকে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও হিংসা দূর করে দিয়ে গভীর মমতার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলো। মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে এবং পরস্পরের প্রতি চরম বৈরীভাবাপন্ন মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে শুধুমাত্র ঈমানের কারণে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক এমনই শক্তিশালী সম্পর্কের রূপ নিয়েছিলো, যার সামনে রক্তের সম্পর্কও নিষ্প্রভ এবং পৃথিবীর যাবতীয় বন্ধুত্বই ম্লান ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিলো। পৃথিবীর জাতিসমূহের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান চালালেও এই ধরনের নিঃস্বার্থ প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

নবোত্থিত ঈমানদারদের এই দলটি ছিলো এক বিশাল ইসলামী উম্মাহর ভিত্তি। ঈমানদারদের এই দলের আবির্ভাব এমন এক কঠিন সঙ্কট সন্ধিক্ষণে হয়েছিলো যখন পৃথিবী ধ্বংসের একপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো। ঈমানদারদের দল পৃথিবীকে ধ্বংসের প্রান্ত থেকে সরিয়ে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলো, যে বিপদ পৃথিবীর সামনে মুখ ব্যাদন করে অপেক্ষা করছিলো। ঈমানদারদের ঐ দলের আবির্ভাব পুনরায় মানব জাতির অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। ঈমানের

www.pathagar.com

কারণে তাঁদের ভেতরে দৃঢ়তা ও সংহতি, প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার অভ্যাস, জান্নাতের প্রতি অনুরাগ, জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রবল পিপাসা সৃষ্টি হয়েছিলো। আল্লাহর দ্বীনকে উপলব্ধি করার তৃষ্ণা এবং আত্মজিজ্ঞাসার ন্যায় সম্পদ তাদের ভাগ্যে জুটেছিলো। সুখে দুঃখে যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার অনুপ্রেরণা তাঁদের ভেতরে সৃষ্টি হয়েছিলো। যে অবস্থায়ই তাঁরা থাকুন না কেনো, ঈমান তাঁদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করতো।

ঈমান তাঁদের মধ্যে পৃথিবীর সাথে সম্পর্কহীনতা খুবই সহজ-সাধ্য বিষয়ে পরিণত করেছিলো। ফলে পরিবার-পরিজনের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত হ্য করায় তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঈমান আনার পূর্বে তাঁরা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং আল্লাহর কোরআনের অসংখ্য আদেশ-নিষেধের সাথে তাঁরা পরিচিত ছিলেন না। ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে, নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে ও অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা খুব সহজ-সাধ্য বিষয় ছিলো না। কিন্তু একমাত্র ঈমানই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করা তাঁদের অভ্যাসে পরিণত করেছিলো। তাঁরা ঈমান আনার ব্যাপারে শুধু মাত্র কালেমা পাঠের জন্য নিজের কণ্ঠকেই ব্যবহার করেননি, বরং তাঁদের মন-মস্তিষ্ক, হাত-পা এবং দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঈমানের ছায়াতলে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন।

ঈমান আনার পরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁদের কখনো মানসিক অথবা আত্মিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। যে কোনো বিষয়ে আল্লাহর রাসূল যা সিদ্ধান্ত দিতেন, সে ব্যাপারে তাঁদের সামান্যতম মতানৈক্যের অবকাশ থাকতো না। একমাত্র ঈমানই তাঁদেরকে আল্লাহর রাসূলের সামনে তাঁদের গোপন ভুল-ভ্রান্তির কথা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য করতো এবং হঠাৎ ঘটে যাওয়া প্রাণদন্ড তুল্য সংঘটিত অপরাধের শাস্তি গ্রহণের জন্য নিজেকে পেশ করতে বাধ্য করতো।

www.pathagar.com

নিজের অজান্তে কোনো সময় পাশবিক শক্তি ও পশুপ্রবৃত্তির প্রভাবে তাঁদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হয়েছে আর এর সুযোগ তখন ঘটেছে যখন কোনো মানব চক্ষু তা অবলোকন করেনি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে আইনের ধারা-উপধারা গ্রেফতার করতে অক্ষম হয়েছে, এ অবস্থায় ঈমানই তখন তীব্র ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করেছে। ঈমানের রশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পা এমনভাবে বেঁধেছে যে, সে ব্যক্তি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

ঈমান তার মন-মস্তিষ্কে প্রবল ঝড় সৃষ্টি করেছে। তার ভেতরে গোনাহর স্মরণ ও পরকালের শাস্তির বিষয়টি এমন পীড়াদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, তার জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি বিদায় গ্রহণ করেছে। শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য হয়ে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে গোপনে সংঘটিত অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে কঠিন দন্ড ভোগের জন্য নিজেকে পেশ করেছে। এরপর নির্ধারিত চরম দন্ড সে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে এবং হাসি মুখে দন্ড ভোগ করেছে যেন মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তির মোকাবেলায় পৃথিবীতেই শাস্তি ভোগ করে হাশরের ময়দানে অপরাধ মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে পারে। ঈমানই ছিলো তাঁদের আমানত, সততা, নৈতিকতা, সচ্চরিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রহরীস্বরূপ।

প্রকাশ্যে-গোপনে, নীরবে-নির্জনে ও জনসমাবেশে ঈমানই ছিলো অতন্দ্র প্রহরী। যেখানে দেখার মতো কেউ থাকতো না, এমন নীরব নির্জন স্থান, যেখানে একজন মানুষের পক্ষে যা খুশী তাই করার পূর্ণ সুযোগ থাকতো, যেখানে কেউ দেখে ফেলবে–এই ভয় ছিলো না–সেখানেও একমাত্র ঈমানই তাঁদের নফস তথা প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামের বিজয়ের ইতিহাসে সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও নিষ্ঠার এমন সব ঘটনা বিদ্যমান যে, মানবেতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র ঈমানী শক্তির কারণেই এসব কিছু সম্ভব হয়েছিলো।

www.pathagar.com

তারীখে তাবারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাওহীদের বাহিনী পারস্যের তদানীন্তন রাজধানী মাদায়েনে যখন উপস্থিত হয়েছিলো, তখন সাধারণ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পারস্য সম্রাটের ধন-রত্ন সংগ্রহ করে একজন হিসাব রক্ষকের কাজে জমা দেয়া হচ্ছিলো। একজন মুসলিম সৈন্য সবথেকে মূল্যবান ধন-রত্নের স্তুপ এনে যখন হিসাব রক্ষকের কাছে জমা দিলো তখন উপস্থিত লোকজন তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'এই লোক যে মূল্যবান ধন-রত্ন এনেছে তা আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের সকলের সংগ্রহ করা সম্পদের তুলনায় এই লোকের একার সংগ্রহ করা সম্পদ অধিক মূল্যবান।' এরপর একজন লোক সেই লোককে প্রশ্ন করলো, 'ভাই, তুমি এসব মূল্যবান ধন-রত্ন থেকে কোনো কিছু নিজের জন্য কোথাও সরিয়ে রেখে আসনি তো?'

লোকটি মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামে শপথ করে বললো, 'বিষয়টি যদি মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত না হতো তাহলে এসব মূল্যবান ধন-রত্ন সম্পর্কে তোমরা কোনো সংবাদই জানতে পারতে না। সবটাই আমি সরিয়ে ফেলতাম।'

লোকজন স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারলো, এই লোক যা বলছে তার একটি শব্দও অসত্য নয়। তাঁর নাম-পরিচয় জানতে চাওয়া হলে সে জানালো, 'আমি আমার নাম ও বংশ পরিচয় প্রকাশ করলে তোমরা আমার প্রশংসা করবে–অথচ প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি যদি আমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে কোনো বিনিময় দিতে চান, তাহলে আমি তাতেই সন্তুষ্ট।' কথা শেষ করে লোকটি যখন চলে গেলো, তখন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে লোকটির পরিচয় জানা গেলো যে, লোকটি ছিলো আবদে কায়স গোত্রের লোক এবং তাঁর নাম ছিলো আমের।

তাওহীদের প্রতি ঈমান তাঁদের মাথা করেছিলো উঁচু এবং গর্দান করেছিলো উন্নত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি তথা রাজা-বাদশাহ্, শাসকগোষ্ঠী, ধর্মীয় নেতৃত্ব বা সমাজের কোনো শক্তিশালী লোকের সামনে তাঁদের মাথা নত হবে–এটা ছিলো তাঁদের কল্পনার অতীত। ঈমানী চেতনা তাঁদের হৃদয় ও দৃষ্টিকে আল্লাহ তা'য়ালার মহানত্ব ও মাহাত্ম্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলো। জাগতিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণ,

www.pathagar.com

পৃথিবীর চিত্তভোলা দৃশ্য ও প্রতারণাকারী বস্তুসমূহ এবং সাজ-সরঞ্জামের প্রদর্শনীর কোনো মূল্যই তাঁদের দৃষ্টিতে ছিলো না। তাঁরা যখন পৃথিবীর শাসকগোষ্ঠীর জাঁক-জমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির এবং তাদের দরবারের সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, তাঁরা দেখতেন–এসব শাসকগোষ্ঠী জাগতিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পরম তুষ্ট রয়েছে। কিন্তু তাঁদের কাছে মনে হতো, এসব রাজা-বাদশাহ্ যেন মাটির বানানো পুতুল–যাদেরকে মূল্যবান পোষাকে আবৃত করে সিংহাসনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রাজদরবারে যাতায়াতকারী লোকগুলো যখন রাজা-বাদশাহ্কে সিজ্দা দিতে ব্যস্ত, তখন রাজদরবারে দাঁড়িয়ে এক নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘোষণা করলেন, 'আমাদের মাথা একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে নত হয় না।'

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পারস্য সেনাপতি রুস্তমের কাছে দূত হিসাবে হযরত রিবঈ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রেরণ করলেন। তিনি রুস্তমের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, মহামূল্যবান বস্তু দ্বারা রাজদরবার সজ্জিত, পায়ের নীচের কার্পেট থেকে শুরু করে রুস্তমের দেহের পোষাক ও বসার আসন মহামূল্যবান মণি-মুক্তা দ্বারা সজ্জিত এবং রুস্তমের মাথায় হিরা-জহরত খচিত মুকুট। অথচ হযরত রিবঈ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পরনে সাধারণ পোষাক, তাঁর সাথে ছোট্ট একটি ঢাল আর বর্শা, মাথায় শিরস্ত্রাণ–দেহ বর্মাবৃত। তিনি রুস্তমের দরবারের সেই মহামূল্যবান গালিচার ওপর দিয়েই নিজের ঘোড়া চালিয়ে রুস্তমের মুখোমুখি হলেন। দরবারের লোকগুলো তাঁকে সামরিক সরঞ্জাম ত্যাগ করে রুস্তমের সামনে যেতে উপদেশ দিলো।

তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 'আমি তোমাদের কাছে নিজের ইচ্ছায় আসিনি। তোমরাই আমাকে ডেকে এনেছো। আমার অবস্থা যদি তোমাদের দরবারের উপযুক্ত বলে বিবেচনা না করো, তাহলে আমি এখনই ফিরে যাবো।' রুস্তম তার দরবারের লোকদের বাধা দিয়ে বললো, 'তিনি যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাতেই আসতে দাও।' হযরত রিবঈ বর্শার সূচালু অগ্রভাগের ওপর ভর দিয়ে দরবারে বিছানো

www.pathagar.com

কার্পেট মাড়িয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন আর তার বর্শার অগ্রভাগের চাপে কার্পেট কয়েক স্থানে ছিদ্র হয়ে গেলো। রুস্তমের লোকজন তাঁকে প্রশ্ন করলো, 'কেন তোমরা আমাদের দেশে এসেছো?

তিনি ঈমান দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামীর দিকে সোপর্দ করার জন্যই এসেছি। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা থেকে মানুষকে বের করে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং ধর্মের নামে যে জুলুম ও বাড়াবাড়ি চলছে, তা থেকে মুক্ত করে ইসলামের ছায়াতলে টেনে নেয়ার জন্যই এসেছি।' মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান তাঁদের হৃদয়ে এমনই নির্ভীকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলো–যা ছিলো বিস্ময়কর! আল্লাহর প্রেমে তাদেরকে মশগুল করেছিলো এবং জান্নাতের প্রতি প্রবল আগ্রহশীল আর পৃথিবীর জীবনের প্রতি চরমভাবে বীতস্পৃহ করেছিলো। আখিরাতের জীবন ও জান্নাতের চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সামনে এমনভাবে ভেসে উঠতো যে, সেই চিরস্থায়ী শান্তির জীবনে প্রবেশ করার জন্য তাঁরা সামান্য কয়েকটি খেজুর খাওয়ার সময়ও ব্যয় করেননি, দুনিয়ার সমস্ত পিছুটানের প্রতি পদাঘাত করে শত্রু বুহ্যে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতবরণ করেছেন।

ওহুদের ময়দানে সেই বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে হযরত আনাস ইবনে নযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা প্রবল বেগে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআযের সাথে দেখা হতেই তিনি আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভাই সা'দ, আমি মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, ওহুদ পাড়ারের ওপাশ থেকে আমি জান্নাতের ঘ্রাণ অনুভব করছি।' হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমরা দেখতে পেলাম আনাস ইবনে নযর শহীদদের মিছিলে শামিল হয়েছেন। তাঁর দেহে ৮০ টিরও অধিক আঘাত ছিলো, প্রত্যেকটি আঘাত ছিলো সামনের দিকে এবং তাঁকে এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছিলো যে, তাঁকে চেনার কোনো উপায় ছিলো না। তাঁর বোন তাঁর একটি অক্ষত আঙ্গুল দেখে তাঁকে শনাক্ত করেছিলো।

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর ইবনে আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আমার আব্বা ছিলেন শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি এবং তিনি ঘোষণা করছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।' তাঁর ঘোষণা শুনে এমন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো, যাঁর পরনে ছিলো জীর্ণ পোষাক। লোকটি বললো, হে আবূ মূসা! তুমি কি নিজের কানে আল্লাহর রাসূলকে এই কথা বলতে শুনেছো?' তিনি জানালেন, 'হ্যাঁ, আমি নিজের কানে আল্লাহর রাসূলের মুখ থেকে এই কথা শুনেছি।' তখন লোকটি নিজের পরিচিতজনদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'তোমরা আমার জীবনের শেষ সালাম গ্রহণ করো।' এ কথা বলেই সে তাঁর তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেলে কোষমুক্ত তরবারি হাতে শত্রু বুহ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতবরণ করলো।

ওহুদের রণপ্রান্তরে ইসলামের শত্রুরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আক্রমন করতে বদ্ধপরিকর। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। তিনি ছিলেন ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকা বাহক। তিনি ক্ষণিকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তাঁর দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তিনি রাসূলের দেহে সামান্যতম আঘাত বরদাস্ত করবেন না। আল্লাহর নবীর দিকে কাফের বাহিনী শানিত অস্ত্র হাতে ছুটে আসছে। হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক হাতে পতাকা আরেক হাতে তরবারী নিয়ে রাসূলকে নিজের পেছনে রেখে কাফেরদের আক্রমন প্রতিহত করতে থাকলেন।

কাফেরদের ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তিনি তাদের সামনে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে মুখ দিয়ে ভীতিকর শব্দ সৃষ্টি করতে লাগলেন। তাঁর এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করার কারণ হলো, কাফেরদের দৃষ্টি রাসূলের ওপর থেকে সরিয়ে নিজের ওপরে নিয়ে আসা। রাসূল যেন নিরাপদে থাকতে পারেন, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এভাবে হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর এক করুণ মুহূর্তে নিজের একটি মাত্র সত্ত্বাকে একটি বাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। তিনি কাফেরদের সামনে ঢালের মতই ভূমিকা পালন করছিলেন। শত্রুরা তাঁর দেহের ওপর দিয়েই আল্লাহর রাসূলকে আক্রমন করছিল।

www.pathagar.com

শত্রুদের তীব্র আক্রমনের মুখে যখন মুসলিম সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তো, তখন হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একাকী শত্রুর সামনে পাহাড়ের মতই অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাসূলকে আঘাতকারী জালিম ইবনে কামিয়াহ এগিয়ে এলো। হযরত মুসআব তাকে বাধা দিলেন। পাপিষ্ঠ কামিয়াহ তরবারী দিয়ে আঘাত করে তাঁর ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার সাথে সাথে তিনি বলে উঠলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ–قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُوْلُ–

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নন, তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন।'

কাফেরদের তরবারীর আরেকটি আঘাতে হযরত মুসআবের দ্বিতীয়টি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবারও তিনি পূর্বের মতই ঐ কথাটি উচ্চারণ করলেন। তিনি তাঁর কাটা হাতের বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা জড়িয়ে ধরে উড্ডীন রাখলেন। ইসলামের শত্রুরা এবার তাঁর ওপর বর্শার আঘাত হেনে তাঁকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিল। শাহাদাতের অমিয় সূধা তিনি পান করলেন।

তিনি যে মুহূর্তে শাহাদাত বরণ করেন, সে সময়ের সবচেয়ে অলৌকিক ঘটনা হলো, ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে বার বার আঘাত পেয়ে তিনি যে কথাটি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছিলেন, সেই কথাটিই পরবর্তীতে হু-বহু কোরআনের আয়াত হিসাবে আল্লাহর রাসূলের ওপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত পরে তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিবেন, সেই সিদ্ধান্তই তিনি তাঁর এক প্রিয় বান্দার মুখ দিয়ে তাঁর শাহাদাতের মুহূর্তে যেন জানিয়ে দিলেন।

হযরত মুসআব ইসলামের শত্রুদেরকে এবং মুসলমানদেরকে যেন স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন রাসূল মাত্র। তিনি মানুষের কাছে সত্য পৌঁছে দিয়ে এক সময় এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করবেন। ইতোপূর্বেও নবী রাসূলগণ এভাবে সত্য পৌঁছে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁরা যে সত্য পৃথিবীতে এনেছিলেন তাদের বিদায়ের কারণে সে সত্যর মৃত্যু ঘটবে না। মহাসত্যের প্রজ্জ্বলিত আলোক শিখার মৃত্যু নেই। যে

www.pathagar.com

আদর্শের বীজ সত্যের বাহকেরা বপন করে যান, তার অঙ্কুরোদগম সত্যের বাহকদেরকে হত্যা করে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সময়ের ব্যবধানে তা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে মহীরুহ ধারণ করবেই। ইসলামী আদর্শবাদী দলকে নিষিদ্ধ করে বা ইসলামী ব্যক্তিত্বকে হত্যা করে আদর্শকে হত্যা করা যাবে না, এ কথাই যেন শাহাদাতের পূর্বক্ষণে হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলে গেলেন।

দাফন কাফনের সময় হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশ পাওয়া গেল। হাত দুটো নেই। তিনি হাত দুটো দিয়ে মহাসত্যের পতাকা ধারণ করেছিলেন, এ অপরাধে শত্রুরা তাঁর হাত দুটো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাঁর পবিত্র শরীরে রয়েছে জোড়াতালি দেয়া শতছিন্ন পোষাক। সে পোষাকও রক্ত আর বালিতে বিবর্ণ। তবুও তাঁর গোটা মুখমন্ডল দিয়ে যেন জান্নাতের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল হযরত মুসআবের এই করুণ অবস্থা দেখে কান্না সংবরণ করতে পারলেন না।

সাহাবাগণ নীরবে চোখের পানি ফেলছিলেন, রাসূলের চোখে পানি ঝরতে দেখে সাহাবাগণ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মত ছোট এক টুকরা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সে কাপড় দিয়ে পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত থাকে, মাথা ঢাকলে পা উন্মুক্ত থাকে। তিনি ছিলেন মক্কার ধনীর আদোরের দুলাল। তাঁর কাফনের আজ এই করুণ অবস্থা। অথচ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর মত জাঁক-জমক পূর্ণ পোষাক আর সুগন্ধি কেউ ব্যবহার করতো না। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তরুণ বয়সেই পৃথিবীর সমস্ত বিলাসিতা আর ধন সম্পদের পাহাড়কে পদাঘাত করে রাসূলের আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন। বিশাল ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। দৃষ্টি আকর্ষণকারী মূল্যবান পোষাক ব্যবহার করা ছিল তাঁর অভ্যাস। শরীরে তিনি এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে, তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র আকর্ষণীয় গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠতো। ওহুদের যুদ্ধে তাঁর মা ছিল ইসলামের শত্রুদের দলে। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর মা তাঁকে বন্দী করে রাখতো। অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত

www.pathagar.com

করেছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম দূত হিসাবেই তাঁকে মক্কা থেকে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দেয়ার একক কৃতিত্ব যেন তাঁরই। একমাত্র ঈমানই তাঁকে এই দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলো।

হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী সুদর্শন যুবক। সুন্দরী তন্বী তরুণী এক ষোড়শীকে তিনি সবেমাত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। সেদিন ছিল তাঁর বাসর রাত। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বাসর রাত অতিবাহিত করেছেন। ফরজ গোছল আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন হযরত হানযালা। এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন ওহুদের রণপ্রান্তরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাতিল শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ফরজ গোছল উপেক্ষা করে তরবারী হাতে ওহুদের ময়দানের দিকে ছুটলেন। আল্লাহর এই ব্যঘ্র 'আল্লাহু আকবার' বলে গর্জন করে শত্রুবাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করে শত্রু নিধন করতে থাকলেন। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে এক সময় তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

সুন্দরী তন্বী তরুণী স্ত্রীর সাথে বাসর শয্যার কোনো মধুর স্মৃতিই হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে জিহাদের ময়দান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। স্ত্রীর মধুর আলিঙ্গনের চেয়ে তিনি বাতিল শক্তির রক্তলোলুপ তরবারীর নিষ্ঠুর আলিঙ্গনকেই অধিক পছন্দ করেছিলেন। যুদ্ধ অবসানে আল্লাহর রাসূল শহীদদের দাফন করছেন। এমন সময় হযরত হানযালার সদ্য বিবাহিতা-বিধবা স্ত্রী এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! আমার স্বামীর ওপর গোছল ফরজ ছিল, তাঁকে গোছল না দিয়ে দাফন করবেন না।'

আল্লাহর নবী তাঁর প্রিয় সাহাবীর লাশের সন্ধান করবেন, এ সময়ে হযরত জিবরাঈল এসে নবীকে অবগত করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! হানযালাকে গোছল দেয়ার প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এত খুশী হয়েছেন যে, জান্নাতে তাঁর গোছলের ব্যবস্থা করেছেন।'

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল সাহাবাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিলেন। উপস্থিত সাহাবাগণ হযরত হানযালার লাশের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর লাশ থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে আর মাথার চুল ও মুখের দাড়ি থেকে সুগন্ধ যুক্ত পানি ঝরছে। ঈমানের টানে পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণের মাথায় পদাঘাত করে হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের রণক্ষেত্রে ছুটে এসেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর এই উত্তম কর্মের পুরস্কার কিভাবে দান করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ তা ওহুদের রণক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিল।

পৃথিবীতে যারা ইসলামের মুজাহিদ নামে পরিচিত, তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত শাহাদাত বরণ করা। সাফল্যের শেষ স্তর হলো শাহাদাত। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রাণ দানের মধ্যে যে কি তৃপ্তি তা ভাষায় প্রকাশ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ইসলামের প্রেমিক যারা তাঁরা শুধু হৃদয়ের সুষমা দিয়েই অনুভব করেছেন। শাহাদাত বরণ করার মধ্যে কি যে অপূর্ব স্বাদ, তা শহীদ ব্যতীত অন্য কেউ অনুভব করতে পারবে না। ঈমানদারদের প্রাণ শাহাদাতের উদগ্র কামনায় ব্যাকুল থাকে। তাদের আত্মা শাহাদাতের অমিয় সঞ্জীবনী সূধা পান করার আশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুনে। তাদের মন ছুটে চলে যায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে এক প্রভাময় পৃথিবীতে। সে পৃথিবীতে তাদের দেহ-মন জান্নাতের সুষমা মন্ডিত স্নিগ্ধ বারিধারায় অবগাহন করে।

ওহুদের রণপ্রান্তরে সত্য আর মিথ্যার মধ্যে রণদামামা বেজে ওঠার শব্দে মদীনার ইসলামী সমাজের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছিল শাহাদাতের জান্নাতি আবেশ। মুসলিম সমাজের যুবক, বৃদ্ধ, শিশু আর নারীরা তাদের দেহের তপ্ত রক্ত ইসলামের জন্য ঢেলে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। জিহাদের আহ্বান শুনে মদীনা নগরী এমনভাবে সজ্জিত হয়েছিল, যেন নববধু সুসজ্জিতাবস্থায় শরীরে সুগন্ধির প্রলেপ দিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। মুসলমানদের ললাটে নবী প্রেমের দ্যুতি পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মতই বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। হযরত আমর ইবনে জমুহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন পঙ্গু। মসজিদে নববীর অদূরেই তিনি বাস করতেন। নবীর

www.pathagar.com

এই সাহাবী ঠিকভাবে হাঁটতে পারতেন না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন তিনি। তবুও তিনি যুদ্ধে যাবেন। পিতার জিদ দেখে সন্তানগণ তাঁকে আটকিয়ে রেখে তাঁর চার সন্তান ওহুদের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।

তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সন্তানগণ আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে আগ্রহী নয়। আমার ইচ্ছা আমি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করে জান্নাতে এভাবে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটবো।'

আল্লাহর নবী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' এরপর আল্লাহর রাসূল হযরত আমরের সন্তানদেরকে বললেন, 'তোমাদের পিতা যদি যেতে চায় তাহলে বাধা দিও না। হয়তো আল্লাহ তাঁকে শাহাদাত নছীব করবেন।'

হযরত আমরের চার সন্তান ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি তাঁর সন্তানদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন, সন্তানদের চেহারায় শাহাদাতের তীব্র আকাংখা। রণসাজে সজ্জিত সন্তানদেরকে জান্নাতের অধিবাসীদের মতই দেখাছিল। হযরত জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর সন্তানদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন, যতক্ষণ না তাঁরা ওহুদের পথে অদৃশ্য হলেন। তাঁর সন্তানগণ যদি শাহাদাত বরণ করে, তাহলে তাঁর আগেই তাঁরা আল্লাহর জান্নাতে যাবে। পঙ্গু পিতার বুকের ভেতরটা কেমন যেন দোল খেলো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন, একজন কিশোর সাহাবী তরবারি ঝুলিয়ে তাঁর দিকেই আসছে। কিশোর এসে তাঁর কাছে দোয়া কামনা করে ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, 'হে আমার আল্লাহ ! তুমি আমাকে আর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।'

আল্লাহর নবীর পঙ্গু সাহাবী হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের রণপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন। মক্কার ইসলাম বিরোধী বাহিনীর ভেতরে তিনি প্রবেশ করে বীর বিক্রমে আক্রমন করলেন। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর

www.pathagar.com

আশেপাশেই তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানগণ যুদ্ধ করছে। তাঁর চোখের সামনে একে একে তাঁর চার সন্তান শাহাদাত বরণ করলেন। কাফেরদের শানিত অস্ত্র এক সময় তাঁর পঙ্গু দেহকে দ্বিখন্ডিত করে দিল। তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

হযরত আমর ইবনে জমুহর স্ত্রী স্বামীর এবং সন্তানদের লাশ গ্রহণ করার জন্য উট নিয়ে ওহুদের ময়দানে এলেন। লাশ উটের পিঠে উঠিয়ে তিনি উটকে বাড়ির দিকে অগ্রসর করাতে চাইলেন। উট স্থির থাকলো। ওহুদের প্রান্তর ত্যাগ করতে উট রাজী হলো না। রাসূলকে এ কথা জানানোর পরে আল্লাহর রাসূল পঙ্গু সাহাবীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার স্বামী বাড়ি থেকে আসার সময় কি কিছু বলেছিলো ?'

স্ত্রী জানালেন, 'হে আল্লাহর! আমার স্বামী আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিল, 'হে আমার আল্লাহ ! তুমি আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।'

এ কথা শোনার পরে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রু সজল নয়নে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর নবুওয়্যতী দৃষ্টি শুভ্র মেঘমালা পার হয়ে ঐ দূর নীলিমা ভেদ করে সপ্তম আসমানের ওপরে আল্লাহর আরশে আজিমের কাছে গিয়ে পৌছলো। অপূর্ব মধুময় স্নিগ্ধ হাসির রেখা দেখা দিল রাসূলের পবিত্র অধরে। উন্মুক্ত দক্ষিণা মলয় সমিরণে দোল খাওয়া কচি লতার মতই রাসূলের মাথা মোবারক সামান্য হেলে উঠলো। তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমরের দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। তাঁকে ওহুদের ময়দানেই অন্তিম শয়নে শুইয়ে দাও।' রাসূলের আদেশ অনুসারে হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ওহুদের রক্তাক্ত উপত্যকায় অন্তিম শয়নে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল। ঈমান এভাবেই তাঁর ভেতরে শাহাদাতের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলো।

ওহুদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর সাথে বেশ কয়েকজন নারীও ছিল। তাঁরা সৈন্যদেরকে পানি পান করাতেন এবং আহতদেরকে সেবা-যত্ন করতেন। তাঁরা মশক ভর্তি করে পানি এনে সৈন্যদেরকে পান করাতেন এবং পানি শেষ হয়ে গেলে পুনরায় মশক ভর্তি করে আনতেন। সৈন্যদের ক্ষতস্থানে তাঁরা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতেন। মুসলিম বাহিনী যখন হঠাৎ শত্রুবাহিনীর আক্রমনের শিকার হয়ে পর্যদুস্ত

www.pathagar.com

হয়ে পড়েছিল, তখন হযরত উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আহত সৈন্যদের সেবা করায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যখন শুনলেন শত্রু বাহিনী চিৎকার করে বলছে, 'কোথায় মুহাম্মাদ! তাঁর সন্ধান করতে থাকো, সে জীবিত থাকলে আমরা কেউ বিপদ মুক্ত নই। তাঁকে হত্যা করতেই হবে।'

এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত উম্মে আম্মারা বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন আল্লাহর রাসূল যেখানে অবস্থান করছেন, সেদিকে শত্রুবাহিনী শানিত অস্ত্র হাতে ছুটে যাচ্ছে। তিনি কোমল দেহের অধিকারী একজন নারী, তবুও নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। নিজের প্রাণ শেষ হয়ে যায় যাক, কোন আফসোস নেই। তাঁদের মত শত কোটি জীবনের তুলনায় আল্লাহর রাসূলের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান। রাসূলকে এবং তাঁর সম্মান-মর্যাদা হেফাজত করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অবশ্যই কর্তব্য।

হযরত উম্মে আম্মারা হাত থেকে পানির পাত্র সজোরে নিক্ষেপ করলেন। যৎ সামান্য যে অস্ত্র হাতের কাছে পেলেন তাই উঠিয়ে নিয়ে উল্কার গতিতে রাসূলের সামনে উপস্থিত হলেন। একটা ঢাল যোগাড় করে তিনি শত্রুর আক্রমন প্রতিরোধ করতে লাগলেন। শত্রুর আক্রমন এতটা তীব্র ছিল যে, অনেক বিখ্যাত মুসলিম বীরও ময়দানে টিকে থাকতে পারেননি। অথচ এ ধরনের মারাত্মক এবং নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত উম্মে আম্মারা অতুলনীয় বিক্রমে শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধ করছিলেন।

তিনি তীর বেগে ছুটে একবার ডানে এবং আরেকবার বামে যাচ্ছিলেন, যেন শত্রুবাহিনীর কেউ রাসূলের কাছে যেতে না পারে। তাঁর দুটো সন্তানও ওহুদের ময়দানে যুদ্ধ করছিলেন। শত্রুপক্ষ যখন দেখলো, এই নারীর কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছা যাচ্ছে না, তখন তারা হযরত উম্মে আম্মারার ওপরে আক্রমণ চালালো। একজন কাফির তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তরবারীর আঘাত করলো। হযরত উম্মে আম্মারা সে আঘাত ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন। তারপর তিনি তরবারীর আঘাত করে কাফিরের ঘোড়ার পা কেটে

www.pathagar.com

ফেললেন। ঘোড়া মাটিতে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে শত্রু সৈন্যও মাটিতে পড়ে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে হযরত উম্মে আম্মারার দুই সন্তানকে তাঁদের মা'কে সাহায্য করার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁরা অগ্রসর হয়ে শত্রুকে জাহান্নামে প্রেরণ করলো।

এক পর্যায়ে তাঁর সন্তান আহত হলো। কলিজার টুকরা সন্তানের রক্তাক্ত দেহ দেখেও মায়ের মধ্যে সামান্য ভাবাবেগ সৃষ্টি হলো না। সন্তানকে তিনি কোনো ধরনের সান্ত্বনার বাণীও শোনালেন না। তিনি নির্বিকার চিত্তে সন্তানের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে আদেশ দিলেন, 'দ্রুত ময়দানে গিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

আল্লাহর রাসূল তাঁর এই মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে আম্মারার সাহসিকতা এবং নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানেই তিনি বারবার মহান আল্লাহর কাছে তাঁর এই মহিলা সাহাবীর জন্য দোয়া করছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে হযরত উম্মে আম্মারার সামনে এলো ঐ ব্যক্তি, যে তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানকে আঘাত করেছিলো। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করার লক্ষ্যে শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল তাঁকে সতর্ক করে বললেন, 'হে উম্মে আম্মারা ! সতর্ক হও ! এই জালিম তোমার সন্তান আব্দুল্লাহকে আহত করেছে।'

নবীর কথা শুনে হযরত উম্মে আম্মারার শরীরে যেন সিংহের শক্তি এসে জমা হলো। তিনি তরবারি দিয়ে পুত্রের ওপর আঘাতকারীর ওপরে এমন শক্তিতে আঘাত হানলেন যে, তাঁর আঘাতে শত্রু সৈন্য দ্বিখন্ডিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মক্কার কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বীর জাহান্নামী আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়ার সাথেও হযরত উম্মে আম্মারা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে যুদ্ধ করেছিলেন। ইবনে কামিয়াহ বারবার রাসূলকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করছিল। সেই কঠিন মুহূর্তে হযরত উম্মে আম্মারার মত একজন কোমল দেহের নারী নিজের জীবন বিপন্ন করে ইবনে কামিয়াকে প্রতিরোধ করছিলেন। আক্রমনকারী জালিমের দেহ ছিল লৌহ বর্মে আবৃত। হযরত উম্মে আম্মারা জালিমকে হত্যা করার জন্য তরবারির আঘাত করেন। কিন্তু জালিমের দেহে বর্ম থাকার কারণে হযরত উম্মে আম্মারার তরবারি

www.pathagar.com

ভেঙ্গে গেল। জালিম এবার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর এই বাঘিনীর ওপর আক্রমন করলো। তিনি ঢাল দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করতে গিয়েও কাঁধে মারাত্মক আঘাত পেলেন।

কিন্তু রাসূলের এই মহিলা সাহাবী সামান্যতম কাতর হলেন না। আহত দেহ নিয়েই তিনি আল্লাহর দুশমনের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখলেন। তাঁর মোকাবেলায় টিকতে না পেরে জালিম আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, ইসলামের এই বঘিনীর কোমল শরীরে ইসলামের শত্রুরা ১২ স্থানে আঘাত করেছে। এতগুলো আঘাত পাওয়ার পরও তিনি যুদ্ধে বিরতি দেননি। আল্লাহর রাসূলকে অক্ষত রাখার জন্য তিনি নিজের প্রাণের কোন পরোয়া করেননি। মৃত্যুকে তাঁরা পায়ের ভৃত্য মনে করতেন। তাঁরা শহীদী মৃত্যুকে খুঁজে বেড়াতেন। পৃথিবীর বুকে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শুধুমাত্র পুরুষই ময়দানে রক্ত দান করেনি। মুসলিম নারীগণ কোন দিক থেকে কোন অংশেই পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরা ইসলামের জন্য স্বামীকে, সন্তানকে, ভাইকে, পিতাকে, নির্বিশেষে নিজের প্রিয় প্রাণও উৎসর্গ করেছে। আল কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সামান্যতম কার্পণ্যতা প্রদর্শন করেনি আর ঈমানী শক্তিই তাঁদেরকে এই পথে অগ্রসর করিয়েছিলো।

মূতার যুদ্ধে ঈমানদারদের সংখ্যা ছিলো মাত্র তিন হাজার। এক সময়ের ক্রীতদাস, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের সন্তানের সতই দেখতেন। সেই শিশুকাল থেকেই তিনি নবীর সাহচর্যে রয়েছেন। তিনি ছিলেন হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু । তাঁকেই ঈমান দীপ্ত বাহিনীর প্রথম সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই একজন করে সেনাবাহিনী নিযুক্ত করা হতো। এই যুদ্ধে পরপর তিনজন সেনাপ্রধান আল্লাহর রাসূল নিযুক্ত করলেন। বিষয়টা ছিল অন্য যুদ্ধের তুলনায় একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। দ্বিতীয় প্রধান করা হলো হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু তা'য়াল আনহুকে। তৃতীয় প্রধান করা হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে।

www.pathagar.com

আল্লাহর নবী ঘোষনা করলেন, 'যায়িদ শাহাদাতবরণ করলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে জাফর, জাফর শাহাদাতবরণ করলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে আব্দুল্লাহ। সে-ও যদি শাহাদাতবরণ করে তাহলে মুসলিম বাহিনী যাকে ইচ্ছা তাকে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করবে।' কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ইহুদী আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে মন্তব্য করেছিলো, 'খোদার শপথ! এই তিনজনই আজ শাহাদাতবরণ করবে।'

মুসলিম বাহিনী সিরিয়া প্রদেশে উপনিত হয়ে জানতে পারলো, তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য শোরহাবিল এক লক্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে এবং আরো এক লক্ষ সৈন্য তাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। হযরত যায়িদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দক্ষতার সাথে সৈন্য বিন্যাস করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে এক সময় তিনি শাহাদাতের সুধা পান করলেন। এরপর হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পতাকা হাতে উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একলক্ষ বাহিনীর সাথে মাত্র তিন হাজার সৈন্যর এক অসম যুদ্ধ হচ্ছে। হযরত জাফরের ঘোড়া আহত হলো। শত্রু পক্ষ তাঁর বাম হাত কেটে দিলে তিনি ডান হাতে পতাকা তুলে ধরলেন। ডান হাত কেটে দিলে তিনি কাটা বাহু দিয়ে পতাকা উড্ডীন রাখলেন। এরপর তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মুখ দিয়ে পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন। হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাঁকে জান্নাতে এমন দুটো পাখা দান করা হয়েছে যে, সে পাখার সাহায্যে তিনি জান্নাতের যেখানে খুশী সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছেন।'

এবার এগিয়ে এলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তরবারি চালনা করতে করতে তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। একজন সাহাবী তাঁকে এক টুকরা গোস্ত দিয়ে বললেন, 'আপনি বড় ক্ষুধার্ত, এই টুকু খেয়ে তরবারি চালনা করুন।' গোস্তের টুকরা তিনি মুখে দিয়েছেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, একজন মুসলিম সৈন্য বড় বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। তিনি গোস্তের টুকরা ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমার জন্য এ পৃথিবীতে খাবারের কোনো প্রয়োজন আর নেই।' হযরত

www.pathagar.com

জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর গোটা দেহ অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমি তাঁর শরীরে তরবারী এবং বর্শার ৯০ টি আঘাত দেখেছি। সমস্ত আঘাতগুলো ছিল সামনের দিকে।'

এই যুদ্ধের সংবাদ আল্লাহর মদীনাতেই ফেরেশতার মাধ্যমে দেয়া হচ্ছিলো। কে কখন শাহাদাত বরণ করছেন, আল্লাহর নবী তাঁর সাহাবাদেরকে শোনাচ্ছিলেন। হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূলের সামনে যেন মূতার প্রান্তর তুলে ধরা হয়েছিল। যুদ্ধের দৃশ্য দেখে দেখে তিনি বর্ণনা করছিলেন। যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন হযরত ইয়ালী ইবনে মাম্বাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু । তিনি সংবাদ বলার আগেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'তুমিই সংবাদ বলবে না আমি তোমাকে শোনাবো ?' তিনি রাসূলের মুখ থেকে যুদ্ধের ঘটনা শুনে বললেন, 'আল্লাহর কসম ! আপনি বাড়িয়েও বলেননি কিছু কমও বলেননি।' ঈমানী চেতনা তাঁদেরকে মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করেছিলো।

একজন বেদুঈন ঈমান এনে আল্লাহর রাসূলকে বললেন, 'আমি আপনার সাথে হিজরত করতে আগ্রহী।' খয়বরের যুদ্ধে সে যোগ দিয়েছিলো। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করার সময় আল্লাহর রাসূল সেই বেদুঈনের অংশ পৃথক করে রাখলেন। তাঁকে যখন তাঁর অংশ দেয়া হলো তখন তিনি জানতে চাইলেন, 'এ সম্পদ তাঁকে কেনো দেয়া হচ্ছে?' তাঁকে জানানো হলো, 'এটা তোমার প্রাপ্য অংশ।' সেই বেদুঈন সম্পদের অংশ হাতে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সম্পদের আশায় ঈমান আনিনি। আমি ঈমান এনেছি যেন আমার কণ্ঠে শত্রুর তীর বিদ্ধ হয়, আমি শাহাতাদবরণ করি এবং জান্নাতে যেতে পারি।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর সাথে তোমার চুক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি তোমার আকাঙ্খা পূরণ করবেন।' যুদ্ধ শেষে সেই বেদুঈনের লাশ যখন পাওয়া গেলো, তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর সাথে তাঁর চুক্তি সঠিক ছিলো,

www.pathagar.com

আল্লাহও তাঁর আশা পূরণ করেছেন।' এসব লোকগুলো ঈমান আনার পূর্বে কী বিশৃঙ্খল জীবন-যাপনই না করছিলো! তাঁরা কোনো নিয়ম-পদ্ধতি, জীবন বিধানের পরোয়া করতো না এবং কোনো শক্তির আনুগত্যও করতো না। তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যেদিকে পরিচালিত করতো, তারা সেদিকেই ছুটে যেতো। ভ্রান্তির বেড়াজালে ছিলো তারা বন্দী। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার পরে তাঁরা মহান আল্লাহর গোলামীর এক সুনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছিলেন যে, তাঁদের জন্য ঈমান যে বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো, সেই বৃত্তের বাইরে আসা কল্পনারও অতীত হয়ে পড়েছিলো।

তাঁরা মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর ক্ষমতা মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং অনুগত প্রজা, ভৃত্য ও গোলাম হিসাবে জীবন পরিচালিত করতেন। তাঁরা পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহর সমীপে নিজেদের আমিত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সোপর্দ করে দিয়েছিলো। মহান আল্লাহর বিধানের সামনে নিঃশর্তে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছিলেন এবং নিজেদের কামনা-বাসনাকে ঈমানের রঙে রঙিন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা এমনভাবে ঈমান এনেছিলেন যে, নিজেদেরকে নিজেদের অর্থ-সম্পদ, শক্তি-মত্তা, বীরত্ব, নেতৃত্ব, জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও যোগ্যতার মালিক মনে করতেন না এবং এগুলো নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহারও করতেন না। তাঁদের প্রেম-ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, আত্মীয়তা, অনুরাগ-বিরাগ, লেন-দেন, কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ছিন্নকরণ সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর কোরআনের অধীন করে দিয়েছিলেন।

তাঁদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন কোরআনের দাবি অনুসারে স্পন্দিত হতো। তাঁরা নিশ্বাস গ্রহণ করতেন কোরআনের দাবি অনুসারে এবং তা ছাড়তেনও কোরআন নির্দেশিত পন্থায়। কোরআনের বিপরীত জীবনধারা সম্পর্কে তাঁরা খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, কারণ তাঁরা জাহিলিয়াতের ছায়াতলেই বর্ধিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা কোরআনের মর্ম সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো, এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দিকে

www.pathagar.com

অগ্রসর হওয়া। একদিকে মানুষের প্রভুত্ব ও অন্য দিকে মহান আল্লাহর গোলামী। তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো, আমিত্বের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলামীকে কবুল করতে হবে। আমি যখনই ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখনই আমার আমিত্ব বা মতামত বলতে অবশিষ্ট কিছু নেই। স্বেচ্ছাচারিতামূলক কোনো কাজ আর করা যাবে না। ঈমান আনার পরে আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলতে আর কিছুই নেই।

ঈমান আনার পরে রাসূলের সিদ্ধান্তের মোকাবেলায় কোনো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা যাবে না। কোরআনের বিপরীত বিধানের সামনে কোনো মামলা-মোকদ্দমা পেশ করা যাবে না বা নিজের ইচ্ছানুসারে কোনো সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় সমাজ ও দেশে প্রচলিত কোনো প্রথার অনুসরণ করা যাবে না। ঈমান আনার পরে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না বা আত্মপূজায় নিমগ্ন থাকা যাবে না। এসব দিক তাঁরা ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই যখনই তাঁরা ঈমান এনেছিলেন, তখনই জাহিলিয়াতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, নীতি-পদ্ধতি ও অভ্যাস পরিত্যাগ করে ইসলামকে তার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় বিষয়াদিসহ গ্রহণ করেছিলেন–ফলে তাঁদের জীবনে এক পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো। ফুযালা নামক এক ব্যক্তি রাসূলের হাতে হাত দিয়ে ঈমান আনার পরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। ইতোপূর্বে তাঁর সাথে এক মহিলার সম্পর্ক ছিলো। পথে সেই মহিলার সাথে দেখা হলে মহিলা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার আগ্রহ প্রকাশ করলো। হযরত ফুযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই মহিলাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'এখন আর সেই সুযোগ নেই, আমি ঈমান এনেছি–আমি আল্লাহর গোলাম, এখন আর তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার কোনো অবকাশ নেই।'

কোরআনের শিক্ষা তাঁদের মধ্যে মানবতার সকল শাখা-প্রশাখা ও সৌন্দর্যের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ও দৃশ্যমান করেছিলো। তাঁরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকতেন এবং যেখানেই যেতেন, সেখানে নীতি-নৈতিকতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। তাঁরা শাসক হিসাবেই থাকুন অথবা রাষ্ট্রের একজন কর্মচারী হিসাবে,

www.pathagar.com

তাঁদের সর্বদাই সংযত, শুচি-শুভ্র, চরিত্রবান, আমানতদার, বিনয়ী, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি হিসাবেই দেখতে পাওয়া যেতো। প্রতিপক্ষ তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করতো, 'রাতে তাঁদেরকে দেখতে পাবে যেন পৃথিবীর সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্কই নেই এবং ইবাদাত-বন্দেগী ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো কাজই নেই। আর দিনের বেলা দেখতে পাবে, রোযাদার হিসাবে ও প্রতিজ্ঞা পালনকারী হিসাবে। তাঁরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। নিজেদের বিজিত এলাকায়ও তাঁরা মূল্য প্রদান করে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে খায়। কোথাও প্রবেশ করতে হলে সর্বাগ্রে সালাম প্রদান করে এবং যুদ্ধের ময়দানে এমন দৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে যে, শত্রুকে পরাজিত করেই যুদ্ধে বিরতি দেয়। নিজেদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার করে আর সাম্যের পরিচয় দেয়। দিনের বেলা তাঁরা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন এবং মনে হবে যে, শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করাই যেন তাঁদের একমাত্র কাজ।' আল্লাহর কোরআন এভাবেই তাঁদের গোটা জীবনে পরিপূর্ণ এক বিস্ময়কর বিপ্লব সাধন করেছিলো।

এসব সম্মানীত ও মর্যাদাবান লোকদের দ্বারা আল্লাহর রাসূল যে শান্তি ও নিরাপত্তার সমাজ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের পরও দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তার একটি ক্ষীণধারা সমাজ ও রাষ্ট্রে বইতে থাকে–যার সামান্য ছোঁয়া বর্তমান সময় পর্যন্তও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে মানবতার শান্তির কল্পনায় মানুষের মনগড়া তথা মানব রচিত মতবাদসমূহ মানুষের প্রাণ, ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিধানে ও সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হওয়ায় পুনরায় নবোদ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অধিক অনুভূত হচ্ছে।

মানব জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে মুসলিম উম্মার সম্মানীত আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের সামনে যে গুরুদায়িত্ব উপস্থিত বলে আমি মনে করি তাহলো, একদিকে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ইসলামের বিপরীত কুসংস্কার, চিন্তা-চেতনা ও অপসংস্কৃতি থেকে

www.pathagar.com

মুসলিম মিল্লাতকে মুক্ত ও পবিত্র করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে, অপরদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খেলাফতে রাশিদার সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বমানবতার সামনে তুলে ধরতে হবে। আর এসব কার্যাবলী বাস্তবায়ন করার জন্য কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক কর্মসূচী ও শক্তিশালী সাংগঠনিক তৎপরতা থাকতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলাম বিরোধী কুসংস্কার ও তার প্রতিকার

একটি বিষয় অত্যন্ত দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী একশ্রেণীর অমুসলিমরা ইসলামের বিধি-বিধান দুর্বোধ্য ও বিকৃতভাবে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করছেই সেই সাথে মুসলিম নামধারী একশ্রেণীর লোক স্বীয় অজ্ঞতা-মূর্খতা অথবা পার্থিব স্বার্থের বশিভূত হয়ে কোরআন-সুন্নাহর আদর্শ ও ইসলামের সঠিক ইতিহাসের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে জঘন্য ধরনের বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত বিকৃতি ঘটানোর অশুভ কর্মে বিরতি দেয়নি। ফলে ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত মুসলমানদের মধ্যে আলিম নামে পরিচিত এমন একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যারা পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এরা কোরআন-সুন্নাহ্ তথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের অনুপম আদর্শকে সঠিক জ্ঞানের নিরিখে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে অক্ষম।

এদের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও সার্বিক কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের অনুপম আদর্শকে সঠিক জ্ঞানের নিরিখে যথাযথভাবে অনুধাবন করতেও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অথবা নিজেরা কোরআন-সুন্নাহ্র রঙে নিজেদেরকে রঙিন করতে প্রস্তুত নয়, বরং নিজেদের বিকৃত রঙেই কোরআন-সুন্নাহ্কে রঙিন দেখার অপচেষ্টা করেছে। সাহাবায়ে কেরামদের জীবনাচারকে নিজেদের ইচ্ছার অধীনে নিষ্পেষিত করে মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার অপচেষ্টা করেছে। এই শ্রেণীর পথভ্রষ্ট লোকগুলো সভ্য, রুচিবান, সম্মানীত ও মর্যাদার অধিকারী জ্ঞানী লোকদের আদর্শ ইসলামকে উন্মাদ, অর্ধোন্মাদ, রুচি বিকৃত, নেশাখোর, মাতাল লোকদের প্রলাপসুলভ আচার-আচরণে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

www.pathagar.com

এদের রুচি ও চিন্তার জগতে বন্ধ্যাত্ব নেমে এসেছে বলে এরা নোংরা লালসালুয় আবৃত জটাধারী অথবা বস্ত্রহীন উলঙ্গ, ময়লাযুক্ত কুৎসিত দন্তরাশি, মাসের পর মাস গোছল না করার ফলে দুর্গন্ধযুক্ত শরীর, গঞ্জিকা সেবনের ফলে যাদের চোখ সর্বদা রক্তিম বর্ণ, নেশায় ঢুলু ঢুলু নেত্র, হাতের কব্জি ও গলায় নানা পাথরে মালা অথবা লোহার শিকল– এই ধরনের উন্মাদ লোকদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার 'শ্রেষ্ঠ ওলী, জামানার মুজাদ্দীদ, হাদীয়ে জামান, গাউছুল আযম, কুতুবে জামান, আশেকে রাসূল, বাহ্‌রুল মারিফাত' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে থাকে। এই শ্রেণীর লোকজনই শরীআত আর মারিফাতের নামে ইসলামকে খন্ডিত করে মুসলমানদের ভেতরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে হিন্দুদের বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে ইসলামের মারফতী সংস্কৃতি হিসাবে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা করে থাকে। তারা সুস্পষ্ট কুফুরী উক্তি করে থাকে যে, 'মা'রিফাত হাসিল হয়ে গেলে আর শরীআত অনুসরণের প্রয়োজন থাকে না'–অর্থাৎ তখন আর নামাজ-রোজা, হজ্জা-যাকাত আদায়ের কোনো প্রয়োজন নেই এবং তাদের জন্য পরপুরুষ বা পরনারীর সাথে পর্দা করারও প্রয়োজন নেই।

আরবী হরফ সম্পর্কে যাদের প্রাথমিক ধারণা নেই, জীবনে যারা মাদ্রাসায় এক ঘন্টার জন্যও শিক্ষা গ্রহণ করেনি, কোরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কে যাদের প্রাথমিক জ্ঞান নেই, ইল্‌মে আকাঈদ ও ইসলামী ফিকাহ্ সম্পর্কে যারা ন্যূনতম জ্ঞানও রাখে না তাদেরকে যুগের মুজাদ্দিদ অথবা সুফী সম্রাট হিসাবে সাধারণ মুসলমানদের কাছে পরিচিত করে দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এক শ্রেণীর বিদআতপন্থীরা। জীবিত অথবা মৃত পীর-বুযুর্গদেরকে বিশাল শক্তির অধিকারী, মানুষের তকদীর পরিবর্তনকারী, সন্তান দানকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, মনের কামনা-বাসনা পূরণকারী হিসাবে উপস্থাপন করে সাধারণ অজ্ঞ মুসলমানদেরকে আল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে কবর তথা মাজার মুখী করা হচ্ছে। কোথাকার এক অখ্যাত, অপরিচিত লোক নিজেকে রাসূলের প্রেমিক তথা আশেকে রাসূল হিসাবে ঘোষণা দিয়ে দাবি করলো যে, স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তার সাথে দেখা করে ইসলামের পতাকা হাতে তুলে দিয়ে

www.pathagar.com

বলেছে, 'তুমি মুহাম্মাদী ইসলামের পুনর্জীবন দানকারী' আর অমনি একশ্রেণীর স্বার্থন্বেষী লোকজন তাকে সুফী সম্রাট হিসাবে ঘোষণা দিয়ে সাধারণ মুসলমানেদরকে বিভ্রান্তির দিকে এগিয়ে দিলো।

মুসলিম হিসাবে পরিচয় দানকারী একশ্রেণীর লোকজন অমুসলিমদের অনুকরণে ইসলামের নামে এমন ধরনের আকীদা-বিশ্বাস, নীতি-পদ্ধতির আবিষ্কার করে তা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত করেছে, যার সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই। কোনো একজন নবী-রাসূল ও তাঁদের একজন সাহাবাও যে কাজ করেননি, এসব বিদায়াতপন্থী লোকগুলো সেই সব কাজের দিকে সাধারণ মুসলমানদেরকে পরিচালিত করার লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহন হিসাবে যে পশু ব্যবহার করতেন, সাহাবায়ে কেরাম বরকত লাভের আশায় সেসব পশুসমূহের প্রতি বিশেষ কোনো সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করতেন না। কিন্তু এদেশে যেসব সম্মানীত বুযুর্গ ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জান-মাল বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের কবরের আশে-পাশে নানা ধরনের প্রাণী পালন করা হয় এবং এসব প্রাণীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করলে তকদীর পরিবর্তন হয়ে যাবে বলে সাধারণ মুসলমানদেরকে ধারণা দেয়া হয়েছে।

ফলে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাজারের কুমীর আর কাছিমের কাছে আবেদন-নিবেদন জানিয়ে এসব প্রাণীর পেছনে কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে থাকে ও ভক্তিভরে এসব প্রাণীকে স্পর্শ করে সে হাত নিজের শরীরে মাসেহ্ করে। আকীদা-বিশ্বাসে কতটা পচন ধরলে সৃষ্টির সেরা একজন মানুষ–যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্ব করা লক্ষ্যে, সেই মর্যাদাবান মানুষ কাছিম আর হিংস্র কুমিরের কাছে মনের কামনা-বাসনা পেশ করে প্রার্থনা জানাতে পারে! আকীদা-বিশ্বাসে যখন পচন ধরে, তখন এই মানুষ নিচে নামতে নামতে এতটাই নিচে নেমে যায় যে, মানুষ হিসাবে নিজের সম্মান-মর্যাদার কথা ভুলে যায়, নিজেকে নিম্নস্তরের প্রাণীর থেকেও নিকৃষ্ট হিসাবে ভাবতে থাকে। ফলে তারা মহান আল্লাহর কাছে সাহায্যের আশায় হাত না উঠিয়ে মৃত মানুষ আর তাদের কবর কেন্দ্রিক লালিত-পালিত প্রাণীসমূহের কাছে সাহায্যের হাত উঠায়।

www.pathagar.com

এই শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারেই বোখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে আমার উম্মত! তোমরা (তোমাদের মধ্য থেকে একদল ভ্রান্ত পথের অনুসারী লোক) তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবশ্যই অনুসরণ করবে, বিগতের সাথে বিগত মিলিয়ে আর হাতের সাথে হাত মিলিয়ে, অর্থাৎ সমানে সমানে তাদের কুসংস্কারমূলক আকীদা-বিশ্বাস ও আচার-আচরণের পেছনে ধাবিত হবে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করবে।' হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'তখন আমরা জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পূর্ববর্তী বলতে ইয়াহুদী-নাসারাদের কথা বুঝাচ্ছেন নাকি?' উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তবে আর কার কথা বলছি! তাদের কথাই তো বলছি। আমার উম্মতের একদল লোক ইয়াহুদী-নাসারাদের কুসংস্কারমূলক আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকান্ডে লিপ্ত হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরনের সতর্ক বাণীর প্রতি লক্ষ্য রেখে সব ধরনের কুসংস্কার থেকে আত্মরক্ষার পথ বেছে নেয়ার মধ্যেই যথার্থ ঈমানী জিন্দেগীর নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে। আর এই নিরাপদ পথ অনুসরণ করার মধ্যেই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ আর নাস্তিক্যবাদী দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর লোক–যারা বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ নামে নিজের পরিচয় জাহির করে থাকে। পাশ্চাত্যের এসব মানস সন্তানরা নিজেদেরকে বুদ্ধিমান এবং উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানী বলে মনে করে। তারা নিজেরা অমুসলিমদের ক্ষয়িষ্ণু বস্তুবাদী নগ্ন সভ্যতার গড্ডালিকা প্রবাহে দেহ-মন ভাসিয়ে দিয়েছে এবং গোটা মুসলিম মিল্লাতকে সেই একই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ধর্মহীন গণতন্ত্র ও নাস্তিক্যবাদী মতবাদ-মতাদর্শ দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ওকালতী করছে।

ইসলামকে এ সকল লোকজন নিজেদের প্রাণের দুশমন বলে মনে করে থাকে। সুযোগ পেলেই এরা লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার

www.pathagar.com

নামে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ–বাংলাদেশে এরা বাঙালী সংস্কৃতির নামে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রচলিত করার লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। মঙ্গল প্রদীপ, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, রাস্তা-পথে ও শিক্ষাঙ্গনে মূর্তি নির্মাণ করে ও বাংলা ভাষা থেকে মুসলিম সাংস্কৃতিক শব্দসমূহ বিদায় করে দেয়ার এক অশুভ অভিযান শুরু করে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী নামধারী পরজীবীরা। তারা মুসলিম মিল্লাতকে শির্ক ও কুফুরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করার লক্ষ্যে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নামে মাদ্রাসা শিক্ষা উঠিয়ে দেয়ার জিগির তুলেছে। আল্লাহদ্রোহী ইসলামের এসব কঠিন দুশমনদের চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে উল্লেখিত হাদীসে। ব্যাধিগ্রস্থ মন-মানসিকতার অধিকারী এসব মানুষ নামের চতুষ্পদ জানোয়ার পরিচয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এভাবে পেশ করেছেন–

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ-لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّايَفْقَهُوْنَ بِهَا-وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّايُبْصِرُوْنَ بِهَا-وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا-اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ-اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ-

বস্তুত বহু সংখ্যক মানুষ ও জ্বিন (আছে যাদের) আমি জাহান্নামের জন্যেই সৃষ্টি করেছি, তাদের কাছে যদিও (বুঝার মতো) হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা চিন্তা করে না, তাদের কাছে (দেখার মতো) চোখ থাকলেও তারা তা দিয়ে (সত্যকে) দেখতে পায় না, আবার তাদের কাছে (শোনার মতো) কান আছে, কিন্তু তারা সে কান দিয়ে (সত্য কথাকে) শুনতে চায় না। (আসলে) এরা হচ্ছে জন্তু-জানোয়ারের মতো; বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তাদের চাইতেও এরা বেশী বিভ্রান্ত। এসব লোকেরা (দারুণভাবে) উদাসীন। (সূরা আ'রাফ-১৭৯)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান যারা বুঝে অথবা বুঝার চেষ্টাও করে না, তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের স্থায়ী কল্যাণ-অকল্যাণের মৌলিক বিষয়াবলীই বুঝে না। এই প্রকৃতির লোকগুলো নিজেদেরকে যতোই জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষাবিদ বা বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচয় দিক না কেনো, এরা দেখতে মানুষের মতো হলেও আসলে তারা চতুষ্পদ জানোয়ারের সমপর্যায়ের; বরং কতক ক্ষেত্রে জানোয়ারের চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত।

www.pathagar.com

এদের মস্তিষ্ক যে একেবারেই জ্ঞান শূন্য, এই সহজ-সরল কথাটিও তাদের মাথায় প্রবেশ করতে চায় না। এ জন্য এরা এদের মুর্খতা ও অবোধগম্যতাকে বুদ্ধিজীবী আর শিক্ষাবিদের পোষাকী নামের আড়ালে রাখার চেষ্টা করে। এই শ্রেণীর দুষ্টকীটদের বিভ্রান্তিকর মতামতের ছড়াছড়িতে দেশের সহজ-সরল স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ মানুষ এদেরকে বুদ্ধিমান ও জাতির বিবেক বলে ধারণা করে এবং বিভ্রান্তির অথৈ সাগরে নিমজ্জিত হয়। তরুণ ও যুবক শ্রেণী এদেরই কারণে নৈতিক চরিত্র বিসর্জন দেয় এবং নারী সমাজ পর্দাহীন জীবন-যাপনে অনুপ্রাণিত হয়। এভাবে সমাজ ক্রমশ ধ্বংসের অতল তলদেশে তলিয়ে যেতে থাকে। এ অবস্থায় সমাজে সততা ও নৈতিকতার শেষ রেশ টুকুও নিঃশেষ হয়ে সমাজ দেউলিয়া সামজে পরিণত হয়। তখন মানব সমাজ আর পশু সমাজে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এসব বুদ্ধিজীবী নামধারী দেউলিয়া মস্তিষ্কের অধিকারী লোকগুলো প্রকৃতপক্ষে সামজ, দেশ ও জাতির কল্যাণ যে কিসে, তা অনুভব করার চেষ্টা করে না। এরা যে দর্শন ও আদর্শ পেশ করে, যে আদর্শ ও দর্শন নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে বিশ্ব মানবতার জননীকুল নারী পরিণত হয় বিলাসের পণ্যদ্রব্যে এবং পারিবারিক বন্ধন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মানব সমাজে পশু প্রবৃত্তির আধিক্য দেখা দেয়। এসব লোক প্রকৃতপক্ষে মানবতার শত্রু এবং সমাজের দুষ্টকীট। ঘুণের মতো এরা সমাজকে কুরে কুরে খেয়ে সমাজের ভিত্তিই নিঃশেষ করে দেয়। ছলে বলে কৌশলে এরা ইসলামী মূল্যবোধের ওপরে আঘাত হানতে সিদ্ধহস্ত। এদের কাজই হলো মানুষকে আল্লাহ, রাসূল ও কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক ভোগবাদী পশু সভ্যতার দিকে মানুষকে নিক্ষেপ করা।

সুতরাং এই মুহূর্তে জাতির সচেতন ব্যক্তিদের কর্তব্য হলো, এসব বুদ্ধিজীবী নামধারী দুষ্টকীটদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদের ব্যর্থতা জাতির সামনে তুলে ধরা এবং সেই সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কল্যাণকর ব্যবস্থাপনার অপরিহার্যতা ও কৃতকার্যতার বাস্তবতা তুলে ধরা। সেই সাথে মুসলমান নামধারী ইসলামের দুশমনদের ও কতিপয় ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিমদের প্রচারিত বিভ্রান্তি ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই ইসলামপন্থীদেরকে কোরআন ও সুন্নাহর যথাযথ অনুসরণে

www.pathagar.com

আরো মনোযোগী এবং কঠোর হতে হবে। এভাবে যারা ইসলামের পতাকা বাতিলের মোকাবেলায় উড্ডীন রাখার চেষ্টা করবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেন–

لاتزال من امتى امة قائمة بامرالله مايضرهم من كذبهم ولامن خلفهم حتى يأتى امر الله وهم على ذالك–

আমার উম্মতের মধ্যে থেকে একদল লোক সর্বদা আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদেরকে যারা অস্বীকার করবে এবং যারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, ওরা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ কর্তৃক কিয়ামতের ফায়সালা পর্যন্ত সত্যনিষ্ঠ এই দলটি দ্বীনে হকের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (বোখারী)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, 'এই ধরনের পথভ্রষ্টতা ও সঙ্কট মুহূর্তে যারা দ্বীনে হকের ওপর কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে।'

www.pathagar.com

সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর ভালোবাসা

সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসা দেখলে আপনা-আপনি সিজ্‌দায় মাথানত হয়ে আসে। মাতৃগর্ভে সন্তান থাকে, সেখানেও আল্লাহ তা'য়ালা মায়ের নাড়ির মাধ্যমে শিশুর আহারের ব্যবস্থা করেন। একটি মেয়ে কিশোরী, তরুণী অথবা যুবতী হলো, তবুও তার স্তনে দুধের সঞ্চার হলো না। কিন্তু যখনই সে সন্তান প্রসব করলো, অমনি তার স্তনে দুধের সঞ্চার হলো। শিশু পৃথিবীতে আসার পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা তার খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন মাতৃগর্ভে আর পৃথিবীতে আসার পরেই তার খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবস্থা করলেন তার মায়ের বক্ষে। মায়ের হৃদয়ে শিশুর প্রতি এমন মমতা সৃষ্টি করে দিলেন যে, সন্তানের কান্না মায়ের কলিজায় তীরের মতোই বিদ্ধ হয়। সন্তানের কান্নার আওয়াজ মায়ের কানে প্রবেশ করার সাথে সাথেই মা ছুটে আসে। সন্তানের জন্য মা নিজের জীবন বিপন্ন করে। এ দেশের একজন চিকিৎসক দুর্ঘটনা কবিলত হওয়ার ফলে তার মুত্র নালিটি বিনষ্ট হয়ে যায়। এদেশে এবং ভারতে তার চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা না থাকার ফলে তিনি লন্ডনের কয়েকজন চিকিৎসকের কাছে পত্র লিখে নিজের অবস্থার কথা জানালেন। সেখানে থেকে তাকে জানানো হলো, লন্ডনে তার চিকিৎসা সম্ভব তবে বাংলাদেশী টাকার প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

অকেজো মুত্রনালী সচল করতে যদি এই বিশাল অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে যে আল্লাহ তা'য়ালা মুত্রনালী দান করেছেন, প্রতিদিন কয়েকবার করে যিনি পাকস্থলি পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করেছেন, প্রতি মুহূর্তে যিনি দেহের অভ্যন্তরে কিডনিকে ফিলটারে পরিণত করে রক্ত পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করছেন, সেই আল্লাহ তা'য়ালাকে কি পরিমাণ সিজ্‌দা দেয়া উচিত? চোখে পানি না থাকলে দৃষ্টিশক্তি থাকবে না, কৃত্রিম উপায়ে চোখে পানির ব্যবস্থা করতে গেলে বিশাল অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হবে। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করুণার সাগর, তিনি তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টিশক্তি সচল রাখার জন্য চোখে পানির ব্যবস্থা করেছেন।

www.pathagar.com

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং তিনি এই মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত রয়েছেন। মানুষ কি চায়, কিসে তার কল্যাণ এবং অকল্যাণ, বিষয়টি মানুষের চেয়ে যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন–তিনিই বেশী জানেন। মহান রব্ব মানুষের এই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছেন। মানুষের জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তা তিনি যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন। মানব সভ্যতা স্থিতি ও বিকাশ লাভের জন্য যেসব উপাদান অপরিহার্য তার সমস্ত কিছুই রাব্বুল আলামীন লাভ করার ব্যবস্থা করেছেন। আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছুই রয়েছে, তা এমন সব আইন ও বিধানের অনুগত করা হয়েছে যে, এসব থেকে যেন মানুষ কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। তিনি যদি নৌ-যানকে কতকগুলো নিয়ম ও বিধানের অধীন না করতেন, তাহলে মানুষ কখনোই জলপথে ভ্রমণ করার কথা কল্পনাও করতে পারতো না। নদী, সাগর-মহাসাগরকে যদি বিশেষ নিয়মের অধীন না করতেন, তাহলে এসব থেকে মানুষ পানি বের করে এনে তা ব্যবহার করতে পারতো না। আকাশের ঐ বিশাল সূর্য এবং মায়াবী চাঁদকে যদি বিশেষ নিয়মে পরিচালিত না করতেন, তাহলে পৃথিবীতে মানব জীবনের উদ্গম হতো না, কোনক্রমেই একটি বিকাশমান সভ্যতা বিকশিত হতো না। মহান আল্লাহই হলেন সমস্ত কিছুর একমাত্র রব্ব-তাঁর নিয়ামত গুণে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ–وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ–وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ–وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ–وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ–وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوْهُ–وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا–

আল্লাহ তো তিনিই, যিনি যমীন ও আকাশকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। আর তার সাহায্যে তোমাদেরকে রিযিক পৌঁছানোর জন্য নানা

www.pathagar.com

ধরনের ফল সৃষ্টি করেছেন, যিনি নৌ-যানকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও আয়ত্বাধীন করেছেন, যেন তার আদেশে তা নদী-সমুদ্রে চলাচল করে। আর নদ-নদীগুলোও তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, তারা প্রতিনিয়ত চলছে। আর রাত ও দিনকেও তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সেসব কিছুই দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছো (তোমাদের স্বভাব ও প্রকৃতির দাবিই এসব)। তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও, তাহলে তা গুণতে পারবে না। (ইবরাহীম-৩২-৩৪)

এমন অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে এই পৃথিবীতে যা মানুষ চোখে দেখতে পায় না। এসব সৃষ্টি মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। আকাশ ও পৃথিবীতে বিপুল পরিমাণ জিনিস এমন রয়েছে যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছে, অথচ কোথায় কত সেবক তার সেবা করে যাচ্ছে এবং কি ধরনের সেবা প্রদান করছে সে সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا-لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ-وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ-وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ-اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً-وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ-

তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য পোষাক, খাদ্য এবং অন্যান্য নানাবিধ উপকারিতাও। তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য যখন সকালে তোমরা তাদেরকে চারণভূমিতে পাঠাও এবং সন্ধ্যায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনো। তারা তোমাদের জন্য বোঝা বহন করে এমন সব স্থানে নিয়ে যায় যেখানে তোমরা কঠোর প্রাণান্ত পরিশ্রম না করে পৌঁছতে পারো না। আসলে তোমার রব্ব বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময়। তোমাদের আরোহণ করার এবং তোমাদের জীবনের

www.pathagar.com

শোভা-সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। তিনি (তোমাদের কল্যাণার্থে) আরো অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো তোমরা জানো না। (সূরা আন্ নাহ্‌ল-৫-৮)

মানুষের প্রয়োজনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পশুদল সৃষ্টি করেছেন। তাদের চামড়া থেকে মানুষ নানা উপকার গ্রহণ করে। পশম দিয়ে কম্বল, পোষাক এবং অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত করে। গোস্ত খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। হাড় দিয়ে ব্যবহার্য সামগ্রী নির্মাণ করে। পশুর নাড়িভূড়িও মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। পাহাড়ী এলাকায় বন্ধুর পথে যেখানে কোন যান-বাহন চলে না, সেখানে পশুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গভীর অরণ্যে কাঠের প্রয়োজনে বিশালাকারের গাছ কেটে তা বাইরে বের করে আনার জন্য এখানো হাতীকে ব্যবহার করা হয়। সেখানে কোন যান-বাহন প্রবেশ করতে পারে না। কাটা গাছের সাথে লোহার শিকল বেঁধে তার আরেক প্রান্ত হাতীর দেহে বেঁধে দেয়া হয়। হাতী তা টেনে ঘন জঙ্গলের বাইরে বের করে নিয়ে আসে।

আল্লাহ তা'য়ালা লোহা অবতীর্ণ করেছেন, এই লোহা দিয়ে যমীন কর্ষণ করে ফসল উৎপাদন করা হয়। লোহা ব্যতীত মানব সভ্যতা সম্পূর্ণ অচল। নানা ধরনের যান-বাহন নির্মাণে, অস্ত্র প্রস্তুতকরণে, দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরীতে লোহা ব্যবহার করা হচ্ছে। আল্লাহ স্বর্ণ দিয়েছেন অল্প পরিমাণে আর লোহা দিয়েছেন বিপুল পরিমাণে। কারণ সোনার ব্যবহার কম আর লোহার ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। জলযান নির্মাণ লোহা ব্যতীত সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ-اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا-

তোমার প্রকৃত রব্ব তো তিনিই যিনি সমুদ্রে তোমাদের নৌযান পরিচালনা করেন যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো। আসলে তিনি তোমাদের অবস্থার প্রতি বড়ই করুণাশীল। (বনী ইসরাইল-৬৬)

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালা এমন রব্ব-যিনি পশুর ভেতরে তাঁর বান্দাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য মওজুদ রেখেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً-نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ-وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا-

নিশ্চয়ই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাদের পেট থেকে গোবর ও রক্তের মাঝখানে বিদ্যমান একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই, নির্ভেজাল দুধ, যা পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর। এভাবে খেজুর গাছ ও আঙ্গুর লতা থেকেও আমি একটি জিনিস তোমাদের পান করাই, যাকে তোমরা মাদকে পরিণত করো এবং পবিত্র খাদ্যেও। (সূরা নহ্ল-৬৬-৬৭)

পশু যে খাদ্য আহার করে তা থেকে একদিকে রক্ত প্রস্তুত হয় এবং অন্যদিকে প্রস্তুত হয় মলমূত্র। কিন্তু এ পশুদের স্ত্রী জাতির ভেতরে আবার এই একই খাদ্য থেকে তৃতীয় আরেকটি জিনিসও প্রস্তুত হয়। বর্ণ, গন্ধ, গুণ-বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে গোবর আর রক্তের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। তারপর বিশেষ করে গবাদি পশুর মধ্যে এই দুধের উৎপাদন আল্লাহ এতটা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যে, পশু শাবকের প্রয়োজন পূরণ করার পরও মানুষের জন্যও উৎকৃষ্টতম খাদ্য বিপুল পরিমাণে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এরপর ফলের রস সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ রসের মধ্যে এমন উপাদানও রয়েছে যা মানুষের জন্য জীবনদায়ী খাদ্যে পরিণত হতে পারে, সেই সাথে এমন উপাদানও বিদ্যমান রয়েছে যে, যা পচে যাবার পরে তার মূল গুণ-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মাদকদ্রব্যে পরিণত হয়।

এখন মানুষ জীবনদায়ী এই রস থেকে পাক-পবিত্র রিযিক গ্রহণ করবে, না বিবেক, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি বিনষ্টকারী মাদক গ্রহণ করবে, তা মানুষের নিজের নির্বাচন ক্ষমতার ওপরে নির্ভর করে। মাদকদ্রব্য যে অপবিত্র, এ কথাও উল্লেখিত আয়াতে পরোক্ষ্যে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি রব–শুকনো খেজুর গাছের ভেতরে তিনি

www.pathagar.com

মানুষের জন্য রিযিক রেখেছেন, গবাদি পশু আহার করে ঘাস, শুকনো খড় আর গুল্ম-লতা-পাতা। যিনি রব তিনি এসব থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করেছেন। এমনভাবে ব্যবস্থা করেছেন যে, গরুর বাচ্চার প্রয়োজনও পূরণ হবে সেই সাথে মানুষেরও প্রয়োজন পূরণ হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً-نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ-

আর প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য গবাদি পশুদের মধ্যেও শিক্ষার বিষয় রয়েছে। তাদের পেটের মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে আরো অনেক উপকারিতাও রয়েছে, তাদেরকে তোমরা খেয়ে থাকো। (সূরা মু'মিন-২১)

স্ত্রী জাতিয় গবাদি পশুর দেহের অভ্যন্তরে অন্ত্রের বস্তুনিচয় এবং রক্তের সংযোগের ফলে দুগ্ধ উৎপাদন হয় এবং তা মানুষ পান করে। শরীরে সাধারণ পুষ্টির জন্য যে বস্তুটির প্রয়োজন, তা মানুষ বা প্রাণী লাভ করে খাদ্যবস্তু থেকে। ভক্ষিত খাদ্যবস্তু প্রথমে পরিপাকযন্ত্রে পৌঁছায় এবং সেখানে তার রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে। সেই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে সারবস্তু নির্গত হয়, তা অন্ত্রে প্রবিষ্ট হবার পরে আবার রূপান্তরিত হয়।

এই রূপান্তরিত বস্তুটি একটি উপযুক্ত সময়ে অন্ত্রের আবরণের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে দেহের সরবরাহ যন্ত্রের দিকে ধাবিত হতে থাকে। রূপান্তরিত সেই রাসায়নিক বস্তুটি প্রত্যক্ষভাবে রসবাহী নালী দিয়ে আর পরোক্ষভাবে মুখবাহী নালী দিয়ে প্রবাহিত হয়। তারপর সেই রূপান্তরিত রাসায়নিক বস্তুটি প্রথমে লিভারে উপনীত হয় এবং সেখান থেকে আবার পরিবর্তিত হয়। এরপর সেই রূপান্তরিত রাসায়নিক বস্তুটি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে যুক্ত হয় দেহের সরবরাহ যন্ত্রের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে। আর এ প্রক্রিয়াতেই সর্বশেষ রূপান্তরিত রাসায়নিক বস্তুটি রক্তধারার সাথে মিশ্রিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দেহের সর্বত্র। এই অদ্ভূত ও অপূর্ব জটিল ব্যবস্থা যিনি সম্পাদন করেন তিনিই হলেন রব। এটা তাঁরই অনুগ্রহরাজি।

www.pathagar.com

আধুনিক দেহতত্ত্ববিদগণ বলেছেন, দুধ যেসব উপাদানে প্রস্তুত হয়, সেসব উপাদান নিঃসৃত হয় দেহের মামারী গ্লান্ড নামক দেহস্থিত একটি রসস্রাবী গ্রন্থি থেকে। এই মামারী গ্লান্ড পরিপুষ্টি লাভ করে খাদ্যের সেই সারবস্তু থেকে, যে সারবস্তু বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও রূপান্তরের মাধ্যমে রক্তধারার সহায়তায় মামারী গ্লান্ডে পৌছায়। সুতরাং খাদ্যবস্তু থেকে যা কিছুই লাভ করা যায় তা রক্ত এবং একমাত্র রক্তই সেসব কিছুর সংগ্রাহক ও নিয়ামক হিসাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

এভাবে এই রক্তই দেহের অন্যান্য যন্ত্রের মতো মামারী গ্লান্ডেরও প্রয়োজনীয় পুষ্টিসাধন করে। এই প্রক্রিয়ায় রক্ত ও অন্ত্রের রাসায়নিক বস্তু সম্মিলিতভাবে মামারী গ্লান্ডে প্রস্তুত করে থাকে দুধ উৎপাদনের উপাদান। যে আল্লাহ অনুগ্রহ করে এসব কিছুর নিপুণ ব্যবস্থা করেছেন, তিনিই হলেন রব্ব অতএব একমাত্র প্রশংসা তাঁরই।

নদী, সাগর, সমুদ্রে জলযান নিয়ে মানুষ বেরিয়ে পড়ে। সেখানে মানুষের জন্য রিয্‌কের ব্যবস্থা আল্লাহ করে রেখেছেন। একশ্রেণীর মানুষ ধারণা করে, এসব জলযান বোধহয় আর্কিমিডিসের সূত্র অনুসারে চলে। পানির ভেতরে যে বস্তু যতটুকু নিমজ্জিত হয়, নিমজ্জিত বস্তু পানির ততটুকু ভর অপসারিত করে এবং এ কারণে তা ভেসে থাকে। পানির মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা যদি নৌযানকে ভাসিয়ে রাখার গুণাগুণ দান না করতেন, কোন সূত্রই তা ভাসিয়ে রাখতে সক্ষম হতো না। সুতরাং বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের কৃপায় সমুদ্রে জাহাজ চলে না, সমস্ত জ্ঞানের ভান্ডার যাঁর হাতে নিবদ্ধ, সেই আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি করুণা করেই জলযানসমূহ চলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি সমগ্র আকাশ জগতে সীমা-সংখ্যাহীন বিশাল গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জকে যার যার গতি পথে অদৃশ্য স্তম্ভের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা করেছেন। কোন তারের সাহায্যে তাদের পরস্পরকে সংযুক্ত করে রাখা হয়নি। কোন বিশাল আকারের গজাল বা পেরেকের সাহায্যে তাদের একটির অন্যটির ওপর উল্টে পড়ে যাওয়াকে ঠেকিয়ে রাখা হয়নি। একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই এ ব্যবস্থাকে সচল রেখেছে। গোটা সৃষ্টি জগতের রব্ব আল্লাহ বলেন–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ

www.pathagar.com

رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ-وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ-

তিনি আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়াই, যা তোমরা দেখতে পাও। তিনি পৃথিবীতে পাহাড় গেঢ়ে দিয়েছেন, যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। তিনি সবধরনের জীব-জন্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং জমিতে নানা ধরনের উত্তম জিনিস উৎপন্ন করি। (সূরা লোকমান-১০)

রাব্বুল আলামীন বলেন, নদী-সাগর ও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখো, পানির দুটো ধারা কিভাবে বয়ে চলেছে। একটি ধারা সুমিষ্ট আরেকটি ধারা লবণাক্ত। এই পানির ভেতরে নানা ধরনের মাছ আমি তোমাদের খাদ্য হিসাবে মওজুদ রেখেছি। তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ নানা ধরনের অলঙ্কার প্রস্তুত করার উপাদান রেখেছি। পবিত্র কোরআন বলছে-

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ-هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ-وَمِنْ كُلٍّ تَاْ كُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا-وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ-وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ-كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى-ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ-

পানির দুটো উৎস সমান নয়। একটি সুমিষ্ট ও পিপসা নিবারণকারী সুস্বাদু পানীয় এবং অন্যটি ভীষণ লবণাক্ত যা কণ্ঠনালীতে ক্ষত সৃষ্টি করে, কিন্তু উভয়টি থেকে তোমরা সজীব গোস্ত লাভ করে থাকো, পরিধান করার জন্য সৌন্দর্যের সরঞ্জাম বের করো এবং এ পানির মধ্যে তোমরা দেখতে থাকো নৌযান তার বুক চিরে ভেসে চলছে, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

www.pathagar.com

তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি অনুগত করেছেন। এসব কিছু একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এ আল্লাহই তোমাদের রব, সার্বভৌমত্বও তাঁরই। (সূরা ফাতির)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন রব, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। লবণাক্ত পানি পান করার অযোগ্য কিন্তু লোনা পানির ভেতর দিয়ে মানুষ যখন জলযানে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তখন যদি তার পানির প্রয়োজন হয়, এ জন্য আল্লাহ সাগর-মহাসাগরের ভেতরে অসংখ্য মিষ্টি পানির স্রোতধারা প্রস্তুত করে রেখেছেন। তিনি বলেন–

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ–وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا–

আর তিনিই দুই সাগরকে মিলিত করেছেন। একটি সুস্বাদু ও মিষ্টি এবং অন্যটি লোনা ও খারযুক্ত। আর দু'য়ের মাঝে একটি অন্তরাল রয়েছে, একটি বাধা তাদের এককার হবার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে রেখেছে। (সূরা আল ফুরকান-৫৩)

পৃথিবীর কোন বড় নদী এসে যেখানে সাগরে মিলিত হয়, সেখানেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সমুদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি পানির স্রোত পাওয়া যায়। সমুদ্রের ভীষণ লবণাক্ত পানির মধ্যেও মিষ্টি পানির স্রোত তার নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম। পারস্য উপসাগরেও মিষ্টি পানির স্রোত রয়েছে। চারদিকে লবণাক্ত পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে, আর মাঝখানে গোল বৃত্তের মতো মিষ্টি পানির স্রোত ঘুরছে। একটি লবণাক্ত পানির স্রোত এসে মিষ্টি পানির স্রোতের সাথে মিলিত হয়েছে, কিন্তু সে পানি পরস্পর মিলিত হয়ে আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে না। রাব্বুল আলামীন এমন এক অদৃশ্য প্রহরার ব্যবস্থা সেখানে করেছেন, যেন তারা পরস্পর মিলিত হতে না পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ–بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّايَبْغِيٰنِ–

www.pathagar.com

দুটো সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেন পরস্পরে মিলিত হয়। এরপরেও উভয়ের মাঝে একটি আবরণ আড়াল হয়ে রয়েছে, যা তারা অতিক্রম বা লংঘন করে না। (সূরা রাহ্‌মান-২০)

পৃথিবীর এই মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলো কোন সাধারণ মানুষ সৃষ্টির সেই শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহান আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণ করেনি। আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণ করেছে এবং বর্তমানেও করছে, শিক্ষিত শ্রেণীর ভেতরে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি। জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর তথাকথিত দার্শনিক-বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগণই আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। বিশ্বের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নাস্তিক্যবাদে আস্থাশীল ব্যক্তিবর্গ নানা ধরনের ডিগ্রী অর্জন করেও গ্রামের ঐসব নিরক্ষর কৃষকের সমপর্যায়ের যোগ্যতাও অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, যে কৃষক তার নিজের দেহ আর পালিত পশুর মল ত্যাগের দৃশ্য অবলোকন করে মহান আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস দৃঢ় করেছে। কৃষক যখন দেখেছে, তার পালিত পশুটি বৃক্ষ-তরুলতার পাতা আর ঘাস ভক্ষণ করে এবং মল হিসেবে ত্যাগ করে ভক্ষিত দ্রব্যের বিপরীত বস্তু, তখন তার চিন্তার জগতে এ কথার উদ্রেক হয়েছে, বিষয়টি কোন পরিকল্পনাবিদের পরিকল্পনা ব্যতীত কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারেনা। পদার্থের রূপান্তর এভাবে যিনি ঘটাচ্ছেন তার পেছনে একজন মহান স্রষ্টা নিশ্চয় রয়েছেন, যার নাম আল্লাহ এবং তিনিই আমাদের রব, তিনিই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন।

নিরক্ষর কৃষক যখন তার নিজের হাতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, তার এই হাতটি কিভাবে খাদ্য উঠিয়ে নিয়ে মুখের কাছে আসে। হাতের এই অবস্থা দেখে তার চিন্তার সাগরে ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে। সহজ-সরলভাবে সে বুঝেছে, তার এই গোটা হাতের মধ্যে রয়েছে ছয়টি গ্রন্থি। এই গ্রন্থিগুলো না থাকলে তার এই হাত নামক অঙ্গটি একটি লাঠি ব্যতিত আর কিছুই হতো না এবং তা বক্র হয়ে মুখের কাছেও আসতো না। এক মহান সত্তার পরিকল্পনার অধীনে হাতে এই গ্রন্থিগুলো সৃষ্টি হয়েছে, সেই পরিকল্পনাবিদের নাম হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অক্ষর জ্ঞানহীন

www.pathagar.com

মজুর ব্যক্তিটি তার বাড়িতে পালিত কবুতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। সে দেখেছে, ক্ষুদ্রাকৃতির দুটো ডিম থেকে ২০/২১ দিনের ব্যবধানে বিস্ময়কর ছোট্ট দুটো বাচ্চা বেরিয়ে এলো।

একটি শস্যদানাও আহার করার এবং পরিপাক করার ক্ষমতা তার নেই। বাচ্চা দুটোর জনক-জননী নরম মাটি ভক্ষণ করে এসে তা উদগিরণ করে বাচ্চাকে আহার করাচ্ছে। নিরক্ষর ব্যক্তিটি এ দৃশ্য দেখে চিন্তা করেছে, কবুতর আহার করে শক্ত শস্যদানা। কিন্তু যে কবুতরের ছোট্ট শাবক রয়েছে সে কবুতর আহার করছে কোমল মৃত্তিকা। এর কারণ কি ? এর কারণ হিসেবে তার সহজ-সরল বুদ্ধিতে ধরা পড়েছে, শক্ত শস্যদানা আহার করালে তার বাচ্চা এখন তা হজম করতে পারবে না। এ কারণে কবুতর তার ছোট্ট শাবককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোমল মৃত্তিকা আহার করে এসে তা বাচ্চার মুখে উদগিরণ করে দিচ্ছে–যেন বাচ্চা তা সহজে পরিপাক করতে পারে। বাকশক্তিহীন সামান্য একটা কবুতরকে এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের জ্ঞান যিনি দান করেছেন, তার পরিচয় হলো রাব্বুল আলামীন।

গৃহপালিত গাভী বা ছাগল বাচ্চা প্রসব করেছে। সে বাচ্চা কিছুক্ষণ পরেই টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে গর্ভধারিণীর পেছনের দু'পায়ের মাঝে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে খাদ্যের সন্ধান করছে। দুধ মুখের ভেতরে নিয়ে চুষতে আরম্ভ করেছে আর মাথা দিয়ে বার বার দুধের স্থানের গোস্ত পিন্ডে আঘাত করেছে। বাচ্চা প্রসবের পূর্বে সে স্থানে দুধ ছিল বরফের মতই জমাট বাঁধা। শাবকের মাথার আঘাতে সে দুধ গলে গলে দুধবাহী নালীতে এসেছে আর শাবক তা চুষে পান করে উদর পূর্ণ করেছে। এই দৃশ্য যখন রাখাল অবলোকন করেছে, তখন তার মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে, এই প্রক্রিয়া সদ্যজাত ঐ শাবককে কে শিখিয়ে দিল? তার মনের গহীন থেকে প্রশ্নের উত্তর এসেছে, শিক্ষাদাতা হলেন স্বয়ং আল্লাহ এবং তিনিই সৃষ্টি জগতসমূহের রব।

মুরগীর বাচ্চার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, চিল বা বাজ পাখী দেখলে মা মুরগী একটা বিশেষ ধরনের শব্দ করে। সদ্যজাত মুরগী ছানা সে শব্দ শোনার সাথে সাথে আত্মগোপন করে। মা মুরগী একটা বিশেষ শব্দ করলো আর সদ্যজাত

www.pathagar.com

ছানাগুলো বুঝে নিল এটা একটি বিপদ সংকেত। এখন ঐ বাচ্চাকে এই সিগ্‌ন্যাল সম্পর্কে কে অভিহিত করলো যে এটা বিপদ সংকেত ? এই বিপদ সংকেত বোঝার ক্ষমতা যিনি দান করলেন তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন। একশ্রেণীর নাস্তিকগণ বলে থাকেন যে, মুরগী ছানার জনক-জননীর ভেতরে ভীতির প্রবণতা বিদ্যমান ছিল, চিল বা বাজপাখী যে তাদের জন্য বিপজ্জনক এই প্রবণতা তাদের রক্তের ভেতরে বিদ্যমান। যে ধরনের অনুভূতি জনক-জননীর ভেতরে বিদ্যমান ছিল, প্রজননের মাধ্যমে যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলো, ঐ প্রবণতা বাচ্চার ভেতরেও সংক্রামিত হলো।

এ কারণে মুরগীর বাচ্চা চিল দেখেই আত্মগোপন করেছে। তাদের এই যুক্তি যে কতটা অর্থহীন তা এই নাস্তিকগণ অনুভব করতে চায় না। এরা হলো হতভাগ্য, এ কারণে সামান্য বিষয় তাদের মাথায় প্রবেশ করে না। যেমন মানুষ সাপ দেখলে ভয় পায়। নারী-পুরুষ উভয়েই সাপ দেখলে ভয় পায়। এই নারী ও পুরুষ থেকে আরেকটি শিশু জন্মগ্রহণ করলো, এই শিশুটি যখন এক বা দেড় বছরের হলো তখন সে হাতের কাছে যা পায় তাই ধরতে শিখলো। তার সামনে যদি একটি বিষাক্ত সাপ এসে ফণা তুলে দাঁড়ায়, শিশু সাপ দেখে ভয় পেয়ে পালায় না বা চিৎকার দেয় না। সে খেলার ছলে সাপটিকে ধরতে যায়।

মাতা-পিতা সাপ দেখলে ভয় পায় অর্থাৎ তাদের ভেতরে ভীতির অনুভূতি বিদ্যমান ছিল। এই অনুভূতি কেন তার শিশু সন্তানের ভেতরে সংক্রামিত হলো না ? প্রকৃত অর্থে বিষয়টি হলো, মুরগীর বাচ্চার কাছে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ নেই, তাকে হেফাজত করার কেউ নেই, এ কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে বোঝার তওফিক দান করেছেন কোনটা বিপদ সংকেত। আর মানুষের শিশুকে লালন-পালন করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন তার মাতা-পিতার ওপরে। এ কারণে শিশুর ভেতরে বিপদ সংকেত বোঝার মত অনুভূতি দেয়া হয়নি। এই ব্যবস্থা যিনি করেছেন, তাঁর নাম হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

বিড়ালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, তার যখন প্রসব কাল অত্যাসন্ন হয়ে ওঠে তখন সে নিরব নির্জন গোপন স্থান অনুসন্ধান করতে থাকে। প্রসবের কয়েক

www.pathagar.com

দিন পূর্ব থেকেই গর্ভবতী বিড়াল প্রসবের স্থান খুঁজতে থাকে। তারপর সে গোপন স্থানে বাচ্চা প্রসব করে। এই বাচ্চা সে একস্থানে রাখে না, কয়েক দিন পরপর সে স্থান পরিবর্তন করে। মা তার শাবকের ঘাড়ে আলতোভাবে কামড়ে ধরে স্থান পরিবর্তন করে। শত্রু যেন কোনক্রমেই তার শাবকদের সন্ধান না পায় এ জন্য মা বিড়াল এটা করে থাকে। শাবককে রক্ষা করার জন্য বিড়ালকে সতর্কতা অবলম্বনের অনুভূতি যিনি দান করেছেন, তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এসব দেখে সাধারণ মানুষের মনে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রচলিত যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার পরও এক শ্রেণীর পন্ডিত ব্যক্তি মহান আল্লাহ সম্পর্কে অবিশ্বাস পোষণ করেছে। যৌগিক পদার্থ আর মৌলিক পদার্থের পেছনে ছোটাছুটি করতে করতে এদের অনেকেই বয়সের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে, কিন্তু নিরক্ষর কৃষকের মতো স্রষ্টার নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের সময় এদের ভাগ্যে জোটেনি। পৃথিবীতে এই শ্রেণীর লোকগুলো হলো সবচেয়ে হতভাগা। এরা আকার আকৃতি মানুষের মত দেখতে হলেও মহান আল্লাহ এদেরকে পশুর থেকেও নিকৃষ্ট বিশেষণে বিশেসিত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ-لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّايَفْقَهُوْنَ بِهَا-وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّايُبْصِرُوْنَ بِهَا-وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا-اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ-اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ-

এ কথা একান্তই সত্য যে বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তকরণ রয়েছে, কিন্তু তার সাহায্যে তারা চিন্তা-গবেষণা করে না। তাদের চোখ রয়েছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের শ্রবণ শক্তি রয়েছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনতে পায় না। তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মত, বরং তা থেকেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমগ্ন। (সূরা আ'রাফ-১৭৯)

যারা মহান আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারা এই সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। কারণ তাদের বুঝার মত জ্ঞান রয়েছে, এই জ্ঞান দিয়ে তারা সমস্ত কিছুই

www.pathagar.com

অনুভব করলো, অনুভব করতে পারলো না শুধু মহান আল্লাহকে। এদের দর্শনশক্তি এবং শ্রবণশক্তি রয়েছে, আল্লাহর দেয়া এসব শক্তির সাহায্যে তারা পৃথিবীর সমস্ত কিছুই দেখেছে এবং শুনেছে কিন্তু মহাসত্য তারা দেখতে পায়নি; মহাসত্যের বাণী তারা শুনেও শোনেনি। এ জন্যই এদেরকে পশু পদবাচ্যে বিশেষিত করা হয়েছে। আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিদেরকে পশু পদবাচ্যে চিহ্নিত করার কারণ হলো, এক শ্রেণীর পশু তার মনিবের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত এবং অবগত। বর্তমান পৃথিবীতে অনেক দেশেই বাড়িতে কুকুর লালন-পালন করা হয়।

বিভিন্ন দেশের সরকারের কুকুর বাহিনী রয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরগুলো লুকায়িত মাদক দ্রব্যের, অস্ত্রের সন্ধান জানিয়ে দেয় এবং অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারে। গৃহপালিত কুকুর চৌকিদারের ভূমিকা পালন করে। তার শ্রবণ ইন্দ্রিয় সজাগ করে সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে। গভীর রাতে নিকষ কালো অন্ধকারে গৃহকর্তা বাড়িতে আসার সময় কুকুর তার ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে অনুভব করতে পারে, তার মনিব আসছে। সে ছুটে গিয়ে মনিবকে স্বাগতম জানায়। আর অপরিচিত কেউ আসতে লাগলে কুকুর ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করতে থাকে, আক্রমণ করার জন্য ছুটে যায়। সুতরাং কুকুরের মতো একটি প্রাণীও তার মনিবকে চিনে। কিন্তু মানুষের মতো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ একটি জীব যখন তার আপন প্রভু আল্লাহকে চিনতে ব্যর্থ হয়; আল্লাহকে অস্বীকার করে তখন তো সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। কারণ পশুর যে যোগ্যতা বিদ্যমান, সে যোগ্যতা আল্লাহকে অস্বীকারকারী ঐ মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

আল্লাহ যে রব্ব–এ কথার ওপরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যেমন পানি, পানির অপর নাম হলো জীবন। কিন্তু এই পানি আবার জীবনহানির কারণও ঘটাতে পারে এ কথা মানুষ বিশ্বাস করে। প্লাবন যখন তীব্র গতিতে আসে, তখন বিশাল বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়, অসংখ্য ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদের ক্ষতি হয়, প্রাণহানী ঘটে। পানির মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা এমন গুণাবলী দান করেছেন, যা দ্বারা কল্যাণও লাভ করা যায়, আবার অকল্যাণও হতে পারে–পানির এই গুণাবলীর প্রতি মানুষ বিশ্বাসী। গোটা সৃষ্টিকে প্রতিপালন করার জন্য পানি একান্ত প্রয়োজনীয়। এই পানির

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এই পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ হলো পানি আর এক ভাগ হলো স্থল। পানির ভাগ বেশী করার কারণ হলো, পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখা। পানি ব্যতিত পৃথিবী টিকে থাকতে পারে না। এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা বিশাল আকারের জলাধার নির্মাণ করেছেন। সাগর মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। এসবের পানি প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বত্র পৌঁছতে সক্ষম হবে না বলে আল্লাহ ছুব্হানাহু তা'য়ালা খাল-বিল, নদী-নালা, হাওড় নির্মাণ করেছেন। মাটির প্রতিটি স্তরে তিনি পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

এত পানির ব্যবস্থা করার পরও চাহিদা পূরণ হবে না বলে মহান আল্লাহ বৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তাপ সৃষ্টি করেছেন। এই তাপের কারণে পৃথিবীর জলভাগের পানি বাষ্প আকারে ঊর্ধ্বে চলে যায়। তারপর তা মেঘমালায় পরিণত হয়। তারপর তা আল্লাহর আদেশে শীতল থেকে শীতলতর হতে থাকে। এক সময় তা প্রচন্ড ভারী হয়ে যায়। আল্লাহ আদেশ দান করেন, বৃষ্টির আকারে পানি পৃথিবীর বুকে ঝরতে থাকে। এ পৃথিবীর কোথায় কোন কোণে একটি শুষ্ক বালূ কণা অবস্থান করছে, আল্লাহ পাক সেটাকেও সিক্ত করার সুব্যবস্থা করেন।

এমনিভাবে মানুষ বিষের গুণাবলী, বিভিন্ন খাদ্যের গুণাবলী, মৃত্তিকার গুণাবলী তথা দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান যাবতীয় বস্তুর প্রতি মানুষ শুধু বিশ্বাস-ই করে না, এসব বস্তুর গুণাবলীর প্রতিও মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। আগুনের অস্তিত্বেই মানুষ শুধু বিশ্বাস করে না, আগুন যে একটি দাহ্য বস্তু, আগুনের দহন ক্ষমতা রয়েছে, এ কথা প্রতিটি মানুষই বিশ্বাস করে। সাপের অস্তিত্বে মানুষ যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি সাপের এ গুণাবলীর প্রতিও মানুষ বিশ্বাস করে, সাপ দংশন করলে তার বিষের ক্রিয়ায় প্রাণ হারাতে হবে। মানুষ বনের হিংস্র বাঘের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সেই সাথে এ কথাও মানুষ বিশ্বাস করে যে, বাঘের ভেতরে হিংস্রতা বিদ্যমান। বাঘের এই গুণাবলীসহ মানুষ বাঘের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে থাকে।

এই পৃথিবীতে মানুষ শুধুমাত্র বস্তুর প্রতিই বিশ্বাস করে না, বস্তুর গুণাবলীসহ বস্তুকে বিশ্বাস করে। ঠিক তেমনি, শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করলেই যথাযথ

www.pathagar.com

অর্থে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হওয়া যাবে না, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে না, জাহান্নাম থেকে মুক্তিও লাভ করা যাবে না। আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পূর্ণ ধারণা না থাকলে ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মীর পক্ষে ময়দানের প্রতিকুল পরিবেশে টিকে থাকাও যাবে না। এ জন্য মুমীন হতে হলে আল্লাহ তা'য়ালার অস্তিত্বে যেমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হতে হবে, সেই সাথে মহান আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিও গভীর আস্থাশীল হতে হবে। মহান আল্লাহ হলেন সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান এবং যা কিছু মানুষের দৃষ্টি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে বিদ্যমান, তারও স্রষ্টা হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি মাছির সামান্য একটা পাখা তৈরী করতে সক্ষম। তবে মানুষকে এ জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা বস্তুর রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম–কিন্তু স্বয়ং সে কোন বস্তুর স্রষ্টা নয়। বস্তুর স্রষ্টা হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

তিনি প্রতিপালক। অর্থাৎ তিনি শুধু স্রষ্টাই নন, সমস্ত কিছু সৃষ্টি তিনি তার সৃষ্টির প্রতিপালক হিসেবে অন্য কোন শক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করেননি। তিনি তার যাবতীয় সৃষ্টির লালন ও পালন কর্ত। কোথায় কোন সৃষ্টি অবস্থান করছে, কোন সৃষ্টির কখন কি প্রয়োজন, এ সম্পর্কে তিনি উদাসীন নন। সাগর-মহাসাগরের অতল তলদেশে শৈবালদামে আবৃত প্রস্তর খন্ডে বসবাসরত এমন ক্ষুদ্র একটি পোকা, যা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসের সাহায্য ব্যতিত দৃষ্টি গোচর হবে না, সে পোকাটিরও আহারের ব্যবস্থাসহ যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পূরণ করে থাকেন। মানুষের দৃষ্টি যেখানে পৌঁছে না এবং যেখানে অনুভূতিও ক্রিয়াশীল থাকে না, এমন কোন স্থানে কোন সৃষ্টি যদি বিপদগ্রস্থ হয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, সে আর্তনাদ তিনি শোনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনিই যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী।

তিনি স্রষ্টা, তিনিই প্রতিপালক এবং সমস্ত সৃষ্টির অনুপম সৌন্দর্য তিনিই দান করেছেন, পৃথিবীকে যেমনভাবে সৃষ্টি করলে অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে উঠবে, তিনি সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি জীবসমূহের যে অঙ্গ দেহের যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তিনি স্থাপন করেছেন। যে বস্তুর মধ্যে যে ধরনের গুণাবলী উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, সে বস্তুর ভেতরে তিনি সেই গুণাবলীই দান করেছেন। প্রতিটি

www.pathagar.com

খাদ্যবস্তুকে তিনি তার বান্দার আহারের জন্য আবৃত করে দিয়েছেন। যাবতীয় প্রশংসামূলক কর্ম এবং প্রশংসাযোগ্য কার্যাবলী তিনিই সম্পাদন করে থাকেন। এ জন্য যাবতীয় প্রশংসার একমাত্র যোগ্য সত্তা হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

তিনিই সর্বশক্তিমান; সমস্ত কিছুর ওপরে তিনিই একমাত্র শক্তিশালী এবং তাঁর শক্তি সমস্ত কিছুর ওপরে পরিব্যপ্ত। তাঁর শক্তির মোকাবেলায় তাঁরই সৃষ্টি অন্যান্য শক্তিসমূহ সম্পূর্ণভাবে অসহায়। তাঁর শক্তির সামনে দৃশ্যমান যাবতীয় শক্তি একেবারেই ভঙ্গুর। তিনি মুহূর্তেই সমস্ত কিছু ধ্বংস স্তুপে পরিণত করতে সক্ষম এবং প্রজ্জ্বলিত অনলকুন্ড পুষ্পকাননে পরিণত করতেও সক্ষম। মানুষ যাকে মহাশক্তিশালী হিসেবে জ্ঞান করে, আল্লাহর শক্তির তুলনায় এসব শক্তির সামান্যতম কোন মূল্য নেই। মানুষের কাছে অসম্ভব বলে যা বিবেচিত হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তা অত্যন্ত সহজ।

মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবি কাঠি একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তিনিই মানুষকে ধন-দৌলত দান করতে পারেন, আবার তিনিই মানুষকে অসহায় দরিদ্রে পরিণত করতে পারেন। তিনিই মানুষকে বিপদগ্রস্থ করতে পারেন, আবার তিনিই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। এ সমস্ত গুণ আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো ভেতরে উপস্থিত নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ–

আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কোন সত্তাকে ডেকো না যারা তোমার কোন কল্যাণ করার বা কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। যদি তোমরা এমন কাউকে ডাকো তাহলে তোমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা ইউনুছ-১০৬)

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তাহলে তা আল্লাহ ব্যতিত আর কেউ-ই দূর করতে পারে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান

www.pathagar.com

করতে ইচ্ছে পোষণ করেন, তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়। মানুষসহ যে কোন প্রাণীর আহার দাতা একমাত্র তিনিই। তিনি ব্যতিত খাদ্যের ব্যবস্থা আর কেউ করতে পারে না। কোথা থেকে কিভাবে তিনি মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীর আহারের ব্যবস্থা করবেন, এ দায়িত্ব একমাত্র তাঁরই। সমস্ত প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা তিনিই সম্পাদন করে থাকেন। তিনি যদি ইচ্ছে করেন, কাউকে তিনি অনাহারে রাখবেন, সেটাও তিনি পারেন আবার তিনি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কাউকে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত রিয্ক প্রদান করবেন, তাও তিনি পারেন। তাঁর সিদ্ধান্তে কেউ পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়, তাঁর কার্যাবলীতে কেউ হস্তক্ষেপ করতেও সক্ষম নয়। যা ইচ্ছা তিনি তাই করতে সক্ষম। সমস্ত সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কোন প্রয়োজনের জন্য তাঁকে কারো দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয় না।

বরং সমস্ত সৃষ্টিই নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার দিকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি মেলে থাকে। মাতৃগর্ভে যে সন্তান অবস্থান করছে, সে সন্তান কি আহার করে বৃদ্ধি লাভ করবে, এ চিন্তা সন্তানের জনক-জননীকে করতে হয় না। পৃথিবীর কোন কর্তৃত্ব পরায়ণ শক্তিও গর্ভস্থ সন্তানের আহারের চিন্তা করে না। আহার দাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, মাতৃগর্ভে ঐ সন্তানকে জীবিত রাখার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় তার আহারের ব্যবস্থা করেন।

মুরগীর ডিম দেয়া যখন শেষ হয়ে যায়, আল্লাহ তা'য়ালা ঐ মুরগীর শরীরের স্বল্প মেয়াদী এক ধরণের জ্বর সৃষ্টি করে দেন। ফলে মুরগীর শরীরে ঐ পরিমাণ উত্তাপের সৃষ্টি হয়, যে পরিমাণ উত্তাপ থাকলে ডিম ফুটে বাচ্চা নির্গত হবে। ডিম দেয়া শেষে মুরগীর শরীরের যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, এর ফলে মুরগীর ভেতরে জড়তা সৃষ্টি হয়। মুরগী এক স্থানে বসে থাকতে চায়। বাচ্চা ফোটানোর জন্য মুরগি ডিমগুলো পেটের নিচে নিয়ে শুধু নিরবে বসেই থাকে না। নিজের মুখের সাহায্যে ডিমগুলো সে দিনের মধ্যে কয়েক বার ওলট-পালট করে দেয়–যেন সবগুলো ডিম সমপরিমাণ তাপ লাভ করতে পারে।

www.pathagar.com

এরপর ডিমের মধ্যে যখন বাচ্চার অস্তিত্ব দেখা দিল, তখন তার আহারের প্রয়োজন হয়। ডিমের মধ্যে সাধারণত দুটো অংশ দেখা যায়। একটি হলো সাদা অংশ আরেকটি হলো কুসুম বা হলুদ অংশ। ঐ হলুদ অংশ থেকে বাচ্চা সৃষ্টি হলো। আর এই বাচ্চা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে তার চারপাশে অবস্থিত সাদা অংশগুলো, ফলে ডিমের খোসা ঘনত্ব হারিয়ে ফেলে। যেদিন খাবার শেষ হয়ে যায়, সেদিন বাচ্চা নিজের ঠোঁটের সাহায্যে ঠোকর দিয়ে ডিমের পাতলা খোসা ভেঙ্গে পৃথিবীর আলো-বাতাসে বেরিয়ে আসে। এই ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক পন্থায় যিনি সম্পাদন করেন, তাঁর নাম হলো রব।

পিঁপড়াকে ও মাছিকে দেয়া হয়েছে তীব্র ঘ্রাণশক্তি। দশতলায়, বারোতলায় কোন খাদ্য রাখা হলে এরা সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তিন থেকে সাড়ে তিন মাইল ঊর্ধ্বে চিল এবং শকুন উড়তে থাকে। সেখানে কোন খাদ্য ছড়ানো নেই। তাদের খাদ্য লাভের উৎস কি? আল্লাহ হলেন এমন রব্ব–তিনি এসব প্রাণীকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠে কোথায় কোন প্রাণীর মৃতদেহ পড়ে আছে, তারা সেখান থেকে তা দেখতে পায়। তারপর তীব্র বেগে নেমে এসে তা ভক্ষণ করে। এরই নাম হচ্ছে রবুবিয়াতে ইলাহি। যার যা প্রয়োজন তিনি তাকে তাই দান করেছেন।

শামুকের ওপরের আবরণ অত্যন্ত শক্ত। চিল এবং বাজ পাখির আরেকটি খাদ্য হলো এই শামুক। কিন্তু শক্ত আবরণ ঠোকর দিয়ে ভেঙে ওরা শামুকের গোস্ত খেতে পারে না। জন্তু-জানোয়ারের বড় হাড় ভেঙে ওরা মজ্জা খেতে পারে না। এ জন্য চিল-বাজ হাড় এবং শামুক মুখে নিয়ে অনেক ওপরে চলে যায়। তারপর সেখান থেকে তা কোন শক্ত পাথুরে স্থানে ফেলে দিয়ে ভেঙে খায়। উট পাখির ডিমও ওরা এভাবে খেয়ে থাকে। হায়েনা, সিংহ বা বাঘ, এরা বিশাল আকারের বন্য গরু এবং মোষকে একা ধরে খেতে পারে না। কারণ এদের শক্তি বেশী। এ জন্য এসব হিংস্র প্রাণী দলবদ্ধভাবে এসে তারপরে ধরে খায়।

চিতা বাঘ যখন শিকার ধরতে যায় তখন একা যায় না। চার পাঁচটি চিতা একত্রিত হয়ে প্রথমে শিকারকে টার্গেট করে। শিকারকে তাড়া করলে সে কোন কোন পথ

www.pathagar.com

দিয়ে দৌড়ে পালাতে পারে সেদিকগুলো এরা নির্দিষ্ট করে নেয়। শিকার সাম্ভাব্য যে পথ দিয়ে পালাতে পারে, সেসব পথের ঝোপ-ঝাড়ে কতকগুলো চিতা লুকিয়ে থাকে এবং একটি চিতা শিকারকে তাড়া করে। শিকার দৌড়ে পালানোর সময় ঝোপে লুকিয়ে থাকা চিতা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলে। প্রাণীজগতকে এ ধরনের কৌশল যিনি শিক্ষা দিয়েছেন তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে মানুষসহ সমগ্র সৃষ্টি কিভাবে আল্লাহর রহমতের কারণে টিকে আছে এবং আল্লাহর দেয়া নে'মাত ভোগ করছে, এ ব্যাপারে কয়েকটি দিক সম্পর্কে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তাফসীরে সাঈদী– সূরা ফাতিহার তাফসীরে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং মৃত্যুর পরে কিয়ামতের ময়দানে পুনরায় মানুষকে জীবিত করবেন। মাতৃ জঠরে মানুষের দেহ কাঠামো গঠন, এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন, বাসোপযোগী পৃথিবীর পরিবেশ ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শক্তি, করুণা ও সাহায্য মানুষের জন্য যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কবরে ও আখিরাতের ময়দানেও মানুষের জন্য মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও রহমত একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেবে। সুতরাং এই পৃথিবীতে শান্তি লাভ করতে হলেও মহান আল্লাহর বিধানের কোনো বিকল্প নেই বিধায় মানব জীবনের প্রত্যেক বিভাগ ও স্তরে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার বিধান অনুসরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

www.pathagar.com

আল্লাহর বিধান সার্বজনীন

আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবী এবং এর ভেতরে যা কিছু রয়েছে এসব কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষসহ অন্যান্য সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ ও অন্যান্য বস্তু নিচয় প্রতিপালন করা ও স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে যেখানে যা কিছু প্রয়োজন তাই দিয়ে তিনি পৃথিবীকে সচল রেখেছেন। এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো শ্রেণী গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। যার যেখানে যতটুকু প্রয়োজন তিনি ততটুকুই দিয়ে যাচ্ছেন। মানব গোষ্ঠীর দিকে দৃষ্টি দিলেও বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, তাঁর যে সকল বান্দাহ্ তাঁরই বিধান অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করছে, তাদের প্রতি তাঁর যেমন কোনো বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই, অনুরূপভাবে তাঁর যে সকল বান্দাহ্ তাঁর বিধানের বিপরীত বিধান অনুসরণ করছে এবং তাঁর বিধানের সাথে শত্রুতা করছে অথবা তাঁকে অস্বীকার করছে, তাদের প্রতিও তিনি পৃথিবীতে দান ও ভোগের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষপাতিত্ব করছেন না।

নীল আকাশের ঐ বিশাল সূর্যের কিরণ-উত্তাপ ব্যতীত পৃথিবীতে কোনো কিছুই টিকে থাকতে পারে না। ঊর্ধ্ব জগৎ থেকে বৃষ্টিপাত না ঘটলে অথবা সঠিক মাত্রায় বায়ূ প্রবাহিত না হলে পৃথিবীতে মানুষসহ অন্যান্য সৃষ্টি টিকে থাকতে পারতো না। এ ধরনের অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে সমভাবে ভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি শুধু মুসলমানদের স্রষ্টা বা প্রতিপালক নন–অর্থাৎ তিনি 'রাব্বুল মুসলিমীন' মুসলমানদেরই প্রতিপালক নন, তিনি 'রাব্বুল আলামীন' অর্থাৎ জগৎসমূহের প্রতিপালক। এমনটি কোথাও ঘটেনি যে, বৃষ্টিপাতের সময় শুধুমাত্র মুসলমানদের মালিকানাভুক্ত ফসলের ক্ষেতেই বৃষ্টিপাত হলো, আর অমুসলিমদের জমীনে জমীনে বৃষ্টিপাত হলো না। আল্লাহর সৃষ্টি সূর্য ও তার রশ্মি থেকে শুধুমাত্র মুসলমানরাই উপকৃত হচ্ছে আর অমুসলিমরা উপকৃত হচ্ছে না। সুতরাং মহান আল্লাহর সৃষ্টি যাবতীয় বস্তু থেকে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ উপকৃত হচ্ছে এবং মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকলকেই লালন-পালন করছেন। অতএব তিনি সমস্ত মানুষেরই স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং একমাত্র তাঁর বিধান অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সকল মানুষের জন্য শান্তি, স্বস্তি ও কল্যাণ।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের মানুষকে লক্ষ্য করে এ কথা বলেননি যে, 'কেবলমাত্র তোমাদেরই জন্যই আমি জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছি এবং এই বিধান অনুসরণ করলে শুধুমাত্র তোমরাই শান্তি লাভ করবে, অন্য কেউ নয়।' অথবা এমন কথাও কোথাও বলেননি যে, 'হে অমুক সম্প্রদায়ের লোকজন, তোমরা আমার দাসত্ব করো। এভাবে মানব জাতির মধ্যে থেকে বিশেষ কোনো বর্ণ, শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে তাঁর বিধান অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়নি। বরং এভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে যে–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ –

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রব-এর দাসত্ব স্বীকার করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা, এর মধ্যেই তোমাদের আত্মরক্ষা করার উপায় নিহিত রয়েছে। (সূরা বাকারা-২১)

উল্লেখিত আয়াতে পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী, শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, 'তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই দাসত্ব স্বীকার করো এবং তাঁরই বিধান অনুসরণ করো। কারণ তিনিই তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যে সকল মানব গোষ্ঠী পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে, সকলকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তোমাদের সকলের স্রষ্টা। সেই একমাত্র স্রষ্টার দাসত্ব যদি তোমরা সবাই করো, তাহলে পথভ্রষ্টতা, অনৈতিকতা, অশান্তি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে।' অর্থাৎ যাবতীয় অশান্তি থেকে মুক্ত থাকার একমাত্র উপায় হলো একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করা। মানুষ যখন শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে বা নিজের খেয়াল খুশী অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে থাকে, তখনই মানুষের সমাজ থেকে শান্তি, স্বস্তি ও কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে। সুতরাং শান্তি ও ঐক্যের একমাত্র পথই হলো মহান আল্লাহর গোলামী করা। সমস্ত মানুষ যখন একমাত্র আল্লাহর গোলামী করতে প্রস্তুত হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত মানুষের মধ্যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে উঠবে। পরস্পরের প্রতি মায়া-মমতা সৃষ্টি হবে। উত্তর

www.pathagar.com

মেরু আর দক্ষিণ মেরুর অধিবাসীর মধ্যে পার্থক্য থাকবে না, সবাই হয়ে যাবে এক আল্লাহর গোলাম। আল্লাহর বিধান অনুসরণের মাধ্যেই শান্তি নিহিত রয়েছে বলেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকেই তাঁর গোলামীর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ একমাত্র আল্লাহর গোলামী কেনো করবে? আমরা এ প্রশ্নেরও জবাব অনুসন্ধান করবো তাঁরই কাছে, যিনি সকল মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًاوَّ السَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًالَّكُمْ ج فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ–

সেই আল্লাহই তোমাদের জন্য মাটির শয্যা বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন, ঊর্ধ্বদেশ থেকে বৃষ্টিপাত করেছেন এবং তার সাহায্যে নানা ধরনের ফল উৎপন্ন করে তোমাদের জন্য রিয্কের ব্যবস্থা করেছেন। (সূরা বাকারা-২২)

সুতরাং সকল মানুষকে একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে এ জন্য যে, তিনিই সকল মানুষের স্রষ্টা এবং প্রতিপালক। পৃথিবীর জমীনকে শয্যা হিসাবে বিছিয়ে দিয়ে তিনি সকল মানুষের জন্য এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করে দিয়েছেন। মানুষের কল্যাণে এই কাজ অন্য কেউ করেনি এবং করার ক্ষমতাও কারো নেই। ঊর্ধ্বজগৎ থেকে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য যেসব ক্ষতিকর বস্তু কণা, গ্যাস ও আলোক রশ্মি তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে, তা থেকে পৃথিবীবাসীকে হেফাজত করার জন্য তিনি আকাশকে ছাদ হিসাবে প্রস্তুত করে ঊর্ধ্ব জগতে এমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করেছেন যে, ঐ সকল ক্ষতিকর বস্তু কণা, গ্যাস ও আলোক রশ্মি প্রতিরক্ষা বুহ্য ভেদ করে পৃথিবীর বায়ু মন্ডলে প্রবেশ করতে না পারে।

আল্লাহ তা'য়ালা ঊর্ধ্ব জগতে সূর্য সৃষ্টি করে তার ভেতরে তাপ প্রয়োগ করার ক্ষমতা দান করেছেন। সূর্য পৃথিবীতে নির্দিষ্ট পরিমাণে তাপ বিকিরণ করছে, সেই তাপে

www.pathagar.com

পৃথিবীর খাল-বিল, হাওড়, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর থেকে পানি বাষ্পাকারে ঊর্ধ্বাদেশে উত্থিত হয়ে মেঘমালায় পরিণত হচ্ছে। আল্লাহর আদেশে সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে, ফলে এই পৃথিবীর জমীনে নানা ধরনের রিয্ক উৎপন্ন হচ্ছে– যা মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী আহার করে জীবন ধারণ করছে। এই ব্যবস্থা তিনি শুধুমাত্র মানব গোষ্ঠীর বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য করেননি। সকল মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি এ ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা যে ব্যবস্থা করেছেন, সেই ব্যবস্থাধীনে যেমন সকল মানুষ কল্যাণ লাভে ধন্য হচ্ছে, অনুরূপভাবে সেই আল্লাহর বিধানের মধ্যে সকল মানুষের জন্য শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা যা করেছেন, তার সবকিছুই সকল সৃষ্টির কল্যাণের লক্ষ্যে করেছেন এবং তাঁর কোনো কাজে কেউ তাঁর অংশীদার ছিলো না এবং এ সকল কাজ করার মতো শক্তি একমাত্র মহান আল্লাহর ব্যতীত অন্য কারো নেই। এ জন্য একমাত্র তিনিই দাসত্ব লাভের উপযোগী এবং সকল মানুষকে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করতে হবে।

এই বিশ্ব জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা এ কথা অনুভব করি যে, কোনো একজন নিপুণ শিল্পী অপূর্ব সুন্দর করে যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি সেই নিপুণ শিল্পীর রয়েছে অসীম মায়া-মমতা। আর সমস্ত সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি হলো মানুষ এবং এই মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ প্রতি পলে পলে তাঁর প্রেমের বারি সিঞ্চন করে যাচ্ছেন। এই মানুষ যেনো কোনোক্রমেই অশান্তি, অকল্যাণ ও নিরাপত্তাহীনতায় নিপতিত না হয়, সে জন্যই তিনি মানুষের কল্যাণে মানুষের জীবন বিধান তাঁরই পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং একমাত্র তাঁরই দেয়া জীবন বিধান অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের কল্যাণ, শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা–এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

নবীদের মানবিক সত্তা ও নিষ্পাপ হবার তাৎপর্য

আমরা পবিত্র কোরআন থেকে জানতে পারি, নবুয়্যাত লাভ করার পূর্বে নবীগণ যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, সেই জ্ঞানের দ্বারাই তাঁরা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করতেন। ওহীর আগমন তাঁদের অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানকে বিশাল শক্তিতে পরিণত করতো। ওহী অবতীর্ণের পূর্বে তাঁদের মন-মস্তিষ্ক যেসব সত্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য দান করতো, আল্লাহর ওহী সেগুলোর সত্য হবার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করতো। পরম সত্যর সাথে নবীদেরকে চাক্ষুষ পরিচয় করে দেয়া হতো, নবীগণ সেসব বিষয়ে মানুষের কাছে সাক্ষ্য প্রদান করতেন।

পবিত্র কোরআন বারবার মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছে, 'তোমরা চিন্তা গবেষণা করো, দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, আমার নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করো।' নবী-রাসূলগণ নবুয়্যাত লাভ করার পূর্বে তাই করতেন। সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করলে স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা এভাবে চিন্তা-গবেষণা করেই পরম সত্তার সন্ধান লাভ করার চেষ্টা করতেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হবার কারণে তাঁরা প্রকৃত সত্যের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন এবং সাধারণ মানুষকে সেদিকেই আহ্বান করেছেন।

ওহী অবতীর্ণ হবার পরে তাঁদেরকে এমন জ্ঞান দান করা হয়েছিল, যে জ্ঞান শুধু তাঁদের জন্যই মহান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ নবী-রাসূলদেরকে অদৃশ্য জগতের জ্ঞান দান করেছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, অদৃশ্য জগতের যতটুকু জ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ তাঁর অদৃশ্য জগতের জ্ঞান নবীকে ততটুকুই দান করেছিলেন। কিন্তু কোরআনের বর্ণনার মোকাবেলায় তাদের এই কথা টিকে না।

কোরআন দাবী করছে, নবীদেরকে অদৃশ্য জগতের এমন জ্ঞান ভান্ডার দান করা হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে সে জ্ঞান লাভ করার কোনো উপায়ই নেই। পবিত্র কোরআনে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ইউসুফের ১১ নং আয়াত থেকে জানা যায়, তিনি তাঁর সন্তানদেরকে

www.pathagar.com

বলেছিলেন, 'মহান আল্লাহ আমাকে এমন সব বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, আমি এমন সব বিষয় সম্পর্কে অবগত আছি যে, তোমরা সেসব বিষয় সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখো না।'

অদৃশ্য জগতের অবস্থা সম্পর্কে নবী-রাসূলগণ যা জানেন এবং দেখেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে সে স্তর অতিক্রম করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বলেছিলেন, 'হে আমার উম্মত! আল্লাহর শপথ! আমি যা জেনেছি, তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং কাঁদতে সবচেয়ে বেশী। (বুখারী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে পেছনে ঠিক তেমনভাবেই দেখি যেমনভাবে সামনে দেখি। (বুখারী)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দুটো পবিত্র চোখ দান করেছিলেন। তিনি সে চোখ দিয়ে সামনের দিকে দেখতে পেতেন। কিন্তু তাঁর পেছনে কোনো চোখ না থাকলেও তিনি আল্লাহর দেয়া শক্তির কারণে পেছনেও দেখতে পেতেন। অর্থাৎ সামনে পেছনে তিনি একইভাবে দেখতেন। নবী-রাসূলগণ অদৃশ্য জগতের যতটুকু সংবাদ মানুষকে জানিয়ে গেছেন, এ কথা ধারণা করার কোন কারণ নেই যে, তাঁরা অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে ঐ পরিমাণ জ্ঞানই রাখতেন।

বরং এর চেয়ে শত সহস্রগুণ বেশী জ্ঞান তাদেরকে দান করা হয়েছিল অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে। অকারণে তাদেরকে এই জ্ঞান দান করা হয়নি। এসব জ্ঞান তাদেরকে দান করা হয়েছিল তাদের দায়িত্বের কারণে। তাঁরা যে দায়িত্ব পালন করতেন, সে দায়িত্ব পালন করতে গেলে অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে তাদের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ছিল। এই জ্ঞান তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহায়ক হতো। তাঁরা যা দেখতেন এবং বুঝতেন, তা সাধারণ মানুষের জানার বা বুঝার প্রয়োজন নেই। যতটুকু প্রয়োজন ছিল ততটুকু তাঁরা তাঁদের অনুসারীদেরকে জানিয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষ ঐ অদৃশ্য জ্ঞান সহ্য করতে পারবে না। এ কারণেই মানুষকে আল্লাহ ঐ জ্ঞান সম্পর্কে

www.pathagar.com

কিছুই অবগত করেননি। হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামই প্রথম দিকে সহ্য করতে পারেননি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও প্রথম দিকে ঐ জ্ঞানের জগৎ দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তাহলে সাধারণ মানুষের সামনে ঐ জ্ঞানের সামান্য বিন্দু প্রকাশিত হলে এই মানুষের অস্তিত্ব থাকতো কি ?

এই পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণ সবচেয়ে অধিক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী এবং তাঁরা মানব জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। একজন সাধারণ মানুষের জীবনে যে ঘটনা ঘটে তা হয়ত কোন গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু ঐ একই ঘটনা যদি কোনো নবীর জীবনে ঘটে, তাহলে তা গুরুত্ব বহন করে। সে ঘটনা তাঁর অনুসারীদের জন্য অবশ্য করণীয় হয়ে দাঁড়ায়। নবীর জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাও মানুষের জন্য আইনে পরিণত হয়। এ কারণে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। তাদের প্রত্যেক পদক্ষেপের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। কারণ নবী জীবনের সমস্ত কিছুই মানুষের জন্য অনুসরণীয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্রা স্ত্রীদেরকে বলতেন, 'আমি তোমাদের সাথে যা করি, তা মানুষদেরকে জানিয়ে দাও। আমি দিনে যা করি এবং রাতে যা করি, সমস্ত কিছুই মানুষদেরকে জানিয়ে দাও।'

কারণ তাঁর জীবনের সমস্ত কিছুই মানুষ অনুসরণ করবে। তাঁদের জীবনের কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজও মহান আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত হতে পারে না। কোনো নবী যদি কখনো কোনো কাজ করেও থাকেন, তাহলে সাথে সাথে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। কেননা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাবেই নয়, মহান নবীর জীবন আদর্শ হিসেবেও মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে, আর এই বিধানে আল্লাহর অপছন্দনীয় সামান্য কোনো অংশ থাকতে পারবে না।

পৃথিবীতে প্রেরিত সমস্ত নবী-রাসূল আল্লাহর কাছে একই মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁদের দায়িত্ব অনুযায়ী মহান আল্লাহ তাঁদেরকে মর্যাদা দান করেছেন। তাঁদের মর্যাদা অনুসারে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে অদৃশ্য জগতের জ্ঞান দান করেছিলেন। পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলী কিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরিচালনা করছেন, এটা

www.pathagar.com

তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছে। তিনি কিভাবে সৃষ্টি করেন এবং মৃত্যু ঘটান আবার মৃত থেকে জীবিত করেন তা প্রদর্শন করা হয়েছে। এই পৃথিবী ও অদৃশ্য জগতের মাঝে যে পর্দ্দা অন্তরায় হিসেবে রয়েছে, মহান আল্লাহ সে পর্দ্দা তাদের দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে এমন সব দৃশ্য দেখিয়েছেন, যে দৃশ্য অবলোকন করলে মানুষ জ্ঞান হারা হয়ে যেত।

এসব জিনিষের ওপরে মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করবে, নবীগণ মানুষকে এসব জিনিষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আহ্বান জানাবেন। এ কারণেই নবীদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা ঐসব জিনিষের সাথে চাক্ষুষ পরিচয় করে দিয়েছেন। অনেকে আবার নবীদের সাথে পৃথিবীর মানুষ দার্শনিকদের তুলনা করে থাকেন। দার্শনিকগণও তো এমন অনেক কথা বলেন, যা দেখা যায় না। অর্থাৎ নবী আর দার্শনিকদেরকে তারা এক কাতারে দাঁড় করাতে চান।

পৃথিবীর দার্শনিকগণ যা বলেন তা অনুমানের ভিত্তিতে বলেন। যেসব দার্শনিক মানুষ হিসেবে নিজের মর্যাদা-সম্মান ও অবস্থান এবং জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে অবগত আছেন, তারা কখনো নিজের মতামতকেই চরম সত্য বলে রায় দান করেন না। কিন্তু নবী-রাসূলগণ যা বলেন, তা নিজের চোখে দেখে এবং ওহীর জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেন। নবীগণ আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলেন না। কিন্তু দার্শনিকগণ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলেন। নবীদের চোখের সামনে গোপন জগতের পর্দ্দা উঠিয়ে যা দেখানো হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত হয়েই কথা বলেন।

পবিত্র কোরআনে সূরা ইউসুফে মহান আল্লাহ হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর সন্তান হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম ঘটনা ক্রমে পিতার কাছ থেকে কয়েক বছর যাবৎ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পিতা তাঁর সন্তানের কোনোই সন্ধান জানতেন না। তাঁর অন্যান্য সন্তানগণ ব্যবসা উপলক্ষে যখন মিসর গিয়েছিল তখন হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম মিসরের রাষ্ট্রপতি। তিনি জীবিত আছেন এর চিহ্ন স্বরূপ ভাইদের কাছে তাঁর শরীরের একটি জামা দিয়ে দিয়েছিলেন, যেন তাঁর পিতা সান্ত্বনা লাভ করেন।

www.pathagar.com

সেই জামা নিয়ে যখন তাঁর ভাইগণ আসছিল তখন কয়েক শত মাইল দূরে অবস্থান করে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের শরীরের গন্ধ অনুভব করছিলেন। এ ধরনের ক্ষমতা মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে দান করেছিলেন। কিন্তু এরপরেও বড় কথা হলো সমস্ত নবীই মানুষ ছিলেন। তাদের ভেতরে মানবিক সত্তা ছিল। তাঁরা আল্লাহর কোনো অভিনব সৃষ্টি ছিলেন না। একজন মানুষকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা এটা কোন অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না।

সাধারণ মানুষের এই পৃথিবীতে জীবন ধারনের জন্য যা প্রয়োজন হয়, নবী-রাসূলদেরও তাই হতো। তাঁরা ক্ষুধা অনুভব করতেন এবং তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন হতো। রক্ত মাংশে গঠিত ছিল তাদের শরীর। তাঁরাও বেদনা অনুভব করতেন, রোগাক্রান্ত হতেন, জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁরাও শ্রম দিতেন। বিয়ে করে তাঁরাও সন্তান জন্মদান করতেন। আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনে তাঁদেরকেও যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মানবিয় এই সত্তা পরিচালিত হতো মহান আল্লাহর ইশারায়। কেননা, তাঁদের জীবনের সবটুকুই তাঁর অনুসারীদের জন্য ছিল অনুসরণীয়।

মুমিনদের জন্য নির্ধারিত যে গুণাবলী এবং পূর্ণমান, সে মানে প্রতিটি মুহূর্ত অবস্থান করা এই পৃথিবীতে কোনো একজন মুমিনের জন্যও সম্ভব নয়। অর্থাৎ মুমিনের মান ওঠা নামা করে। যখন সে মহান আল্লাহর পজন্দনীয় কাজে লিপ্ত থাকে, তখন মুমিন হিসেবে সে পূর্ণমানে অবস্থান করতে থাকে। আর তাঁর দ্বারা যখন কোনো সামান্য ভুল হয়ে যায়, তখন সে ঐ পূর্ণমান থেকে সামান্য নীচে অবস্থান করেন। অর্থাৎ আকাংখিত মানে প্রতিটি মুহূর্ত অবস্থান করা মানুষ হিসেবে মুমিনদের জন্য সম্ভব হয়না।

প্রশ্ন হলো, নবী-রাসূলদেরও অবস্থা এমন হয় কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পবিত্র কোরআন ও হাদীসে অনুসন্ধান করবো। আমরা পবিত্র কোরআনে দেখতে পাই, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের যুবক সন্তান যখন তাঁরই চোখের সামনে পানিতে ডুবে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করছিল, তখন হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের ভেতরে

www.pathagar.com

মানবিয় দুর্বলতা ক্ষণিকের জন্য স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাঁর সে সন্তান ছিল ইসলামের তথা আল্লাহর বিধানের শত্রু। মুহূর্ত কয়েকের ভেতরে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় তিনি যুবক সন্তানের মমতা হৃদয়ে স্থান দেননি।

এ ধরনের নানা ঘটনা বিভিন্ন নবীর জীবনে সাময়িকের জন্য ঘটেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ মুহূর্তের ভেতরে নবীকে সংশোধন করেছেন। একজন নবীর নিষ্পাপ হবার অর্থ এই নয় যে, নবীর দ্বারা পাপ সংঘটিত হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। অথবা সব ধরনের পাপ করার ক্ষমতা, ভুল করার ক্ষমতা নবীর কাছে থেকে মহান আল্লাহ ছিনিয়ে নিয়েছেন। প্রকৃত বিষয় হলো, নবী ভুল করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু তাঁর মানবিক আবেগ-অনুভূতি, মানবিক গুণাবলী, ইচ্ছা ও আশা-নিরাশার অধিকারী হবার পরেও তিনি এতটা আল্লাহ ভীরু, সৎ, দৃঢ়চেতা ও মানসিক শক্তির অধিকারী হন যে, তিনি কখনো কোনো ভুল করেন না।

প্রতিটি মানুষের ভেতরে যে খারাপ প্রবৃত্তি অবস্থান করছে, মানুষ যত খারাপ কাজ করে ততই সেই খারাপ প্রবৃত্তির শক্তি বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। অর্থাৎ খারাপ কাজ বা পাপের কাজই হলো কুপ্রবৃত্তির খোবাক বা আহার। নবীর ভেতরে সেই শক্তি আহার না পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং নবীর ভেতরে পাপ করার কোনো আকাংখা সৃষ্টি হতে পারে না। তারপরেও তাঁর দ্বারা যদি কোনো সামান্যতম ভুল সংঘটিত হবার উপক্রম হয়, তাহলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সাথে সাথেই তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করেন। কারণ কোনো নবীর পদস্খলন শুধু তাঁর পদস্খলন নয়, গোটা উম্মতের পদস্খলন। নবী যদি মহাসত্য থেকে ভুলের দিকে বিন্দু পরিমাণ এগিয়ে যান, তাহলে গোটা পৃথিবী ভুলের দিকে কয়েক শত মাইল এগিয়ে যাবে।

নবী-রাসূলগণ যে নিষ্পাপ ছিলেন এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। গুনাহ-পাপ তথা নাফরমানীর কাজে জড়িয়ে পড়া, নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় কাজ করা থেকে নবী-রাসূলদেরকে মহান আল্লাহ রক্ষা করেছেন। এই সংরক্ষণ শুধুমাত্র নবী-রাসূলদের জন্যই নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই গুণ ও

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র নবী-রাসূলদেরকেই দান করেছেন। তাঁদেরকেই এই বিশেষ গুণ দান করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্মানিত করেছেন। সৃষ্টির সমস্ত মানুষ থেকে তাঁদেরকে বিশিষ্ট বানানো হয়েছে। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন মর্যাদা তাঁদেরকে দান করা হয়েছে।

পাপ ও অবাধ্যতা থেকে আল্লাহর বিশেষ সংরক্ষণ লাভের এই সম্মান ও মর্যাদা শুধুমাত্র নবী-রাসূলদেরই রয়েছে এবং নবী-রাসূলগণ ব্যতীত এই গুণ-বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব সৃষ্টি জগতে আর কোনো মানুষের নেই এবং কোনো মানুষের তা প্রাপ্য নয়। নবী-রাসূলগণ এই সংরক্ষণ লাভ করেন শুধুমাত্র বড় বড় পাপ থেকেই নয়, ছোট ছোট পাপ থেকেও তাঁরা এই সংরক্ষণ লাভ করেন। এ কারণে তাঁদের দ্বারা কোনো পাপ বা আল্লাহর সাথে সামান্যতম অবাধ্যতা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ-মাসুম, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা মানবীয় প্রকৃতিই হারিয়ে ফেলেছেন। মানুষ স্বভাবতঃই ভুল ভ্রান্তির প্রকৃতিসম্পন্ন। মানুষের ইচ্ছা শক্তি ও উদ্যম-উদ্যোগ কোনো কোনো সময় দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এ যেমন সত্য, তেমনি সাময়িক ক্রোধ বা অভিমানে ভারাক্রান্ত হয়েও নবী রাসূলগণ এমন কোন কাজ হঠাৎ করে বসতে পারেন, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যিনি তাদেরকে নবী-রাসূল মনোনীত করেছেন, তিনি অপছন্দ করতে পারেন। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ তাদেরকে সংশোধন করে দেন। সে ভুলকে স্থায়ী হতে দেন না। সে ভুলের প্রতিক্রিয়া বা পরিণতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এসব ক্ষুদ্র ভুলের ওপরে নবীগণ স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন না। এমন হতে পারে যে, নবীকে আল্লাহ ভুল করার সুযোগ দিয়ে এ কথা প্রমাণ করেন যে, নবীগণ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়। কিন্তু এ কারণে নবীগণ যেমন পাপী হন না বা তাদের সম্মান মর্যাদাও ক্ষুন্ন হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলগণকে অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকার যোগ্যতা দান করেছেন। অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকার এই যোগ্যতা বা শক্তিকে শরীআতের পরিভাষায় 'ইসমাত' বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আম্বিয়ায়ে কেরামের ভুলের সংশোধন করেছেন। কিন্তু ভুলের কারণে নবী-রাসূলগণের ইসমাত নষ্ট হয় না বা তাঁদের ভুল ইসমাতের পরিপন্থী নয়। এ কারণেই তাঁরা নিষ্পাপ বা মাসুম।

www.pathagar.com

সাময়িকের জন্য নবীগণ যে ভুল করতে পারেন বা মহান আল্লাহর বলে দেয়া কথা ভুলে যেতে পারেন, তার বড় প্রমাণ হলো হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম। তিনি ভুল করেছেন, এ উপলব্ধি বোধ তাঁর ভেতরে সৃষ্টি হবার সাথে সাথে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন, মহান আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে নবুয়্যাত দান করেছেন। নবীগণ যাদু প্রভাবিত হতে পারেন। হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামের সামনে যখন ফিরাউনের যাদুকররা যাদু নিক্ষেপ করেছিল, সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা ত্বাহায় বর্ণনা করা হয়েছে–

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى–

সহসা তাদের নিক্ষিপ্ত রশি ও লাঠিগুলো তাদের যাদুর প্রভাবে দৌড়াচ্ছে বলে মুসার মনে হলো। ফলে মুসা নিজ মনে ভয় পেল। (সূরা ত্বাহা-৬৬-৬৭)

এ অবস্থায় মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে অভয় দান করে বলেছিলেন–

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى–وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى–

কোন ভয় নেই। তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো। তা এখনই তাদের মিথ্যা জিনিষগুলো গিলে ফেলবে। ওরা যা কিছু বানিয়ে এনেছে, তা যাদুকরের প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর যাদুকর কখনই সফলকাম হতে পারে না, তা ওরা যতই শক্তি দেখাক না কেন। (সূরা ত্বাহা-৬৮-৬৯)

সে সময়ে সাধারণ মানুষ যেমন যাদুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কোরআন বলছে, তিনি ভয় পেয়েছিলেন। এই ভয় পাওয়া ছিল তাঁর মানবীয় দুর্বলতা। কিন্তু তিনি এই ভয়ের ওপর স্থায়ী ছিলেন না। ক্ষণিকের ভেতরেই তিনি নিজেকে ভয় মুক্ত করেছিলেন। পক্ষান্তরে যাদু কোনো নবীকে বিভ্রান্ত করতে বা তাঁর নবুয়্যাতের প্রতি বিরূপ কোনো

www.pathagar.com

ক্রিয়া করতে পারে না। স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর ক্রিয়া ঘটেছিল। এ কারণে তিনি তাঁর জীবনে বেশ কষ্ট অনুভব করেছেন।

হযরত ইউনুস আলায়হিস্ সালাম তাঁর জাতিকে আল্লাহর বিধান গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। তারা অস্বীকার করেছিল। তিনি তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখালেন। বললেন, তিনদিনের ভেতরে আযাব আসবে। লোকজন আল্লাহর কাছে কাতর প্রর্থনা করেছিল। মহান আল্লাহ শাস্তি মওকুফ করে দিলেন। হযরত ইউনুস আলায়হিস্ সালাম চিন্তা করলেন, তিন দিনের ভেতরে যখন আযাব এলো না, তখন এবার তাঁকে লোকজন মিথ্যাবাদী ধারণা করবে এবং তাঁকে হত্যা করবে।

তিনি আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা না করে দেশ ত্যাগ করলেন। আল্লাহর আদেশ ব্যতীত কোনো নবীর জন্য তাঁর স্থান ত্যাগ করা নবুয়্যাতের পরিপন্থী। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁকে গ্রেফতার করলেন। তিনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। তাঁকে বিশাল এক মাছ গ্রাস করেছিল। আল্লাহর কাছে তিনি ক্ষমা চাইলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। এ ধরনের অনেক কাহিনী থেকে প্রমাণ হয়, নবীগণ সাময়িক ভুল করলেও মহান আল্লাহ তা সংশোধন করে দিতেন। কিন্তু তাদের সে ভুল কোন মারাত্মক কিছু ছিল না। তা ছিল একেবারেই ক্ষুদ্র পর্যায়ের।

প্রত্যেক নবী-রাসূলের চরিত্রের সনদ পত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং দান করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষনা করেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَاللّٰهَ كَثِيْرًا–

নিঃসন্দেহে রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য অতীব উত্তম আদর্শ রয়েছে, তাদের জন্য যারাই আল্লাহ ও পরকালীন মুক্তির ব্যাপরে আশাবাদী এবং যারা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। (সূরা আহ্যাব-২১)

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ–

নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।' সূরা ইয়াসিনের প্রথম আয়াতেই বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ করে আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন–

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ–عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ–

নিশ্চয়ই আপনি সবচেয়ে সহজ সরল এবং নির্ভুল পথের ওপরে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রেরিত নেতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা।' হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামও আল্লাহর কাছে অতীব মর্যাদাবান নবী এবং মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন–

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ–

নিঃসন্দেহে ইবরাহীম এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য অতীব উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। (সূরা মুমতাহিনাহ-৪)

সূরা মরিয়মে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا–

তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ একজন মর্যাদাবান নবী।

একই সূরায় হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম, হযরত ইদরিস আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর প্রশংসা করেছেন। নবী-রাসূলগণ মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শবান ব্যক্তি ছিলেন। এ কারণে মহান আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে বলেন–

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ–

এই নবী-রাসূলগণই হচ্ছেন সেই সব লোক, আল্লাহ স্বয়ং যাদেরকে হেদায়েত করেছেন। অতএব তোমরা এই লোকদের হেদায়েত পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে চলো। (সূরা আনয়াম-৯০)

www.pathagar.com

প্রত্যেক নবীই ছিলেন মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাঁরা মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন। বদরের প্রান্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সিজদায় অবনত হয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। তিনি এ দাবী করেননি যে, আমি একাই যথেষ্ট, আমার সামনে যে কাফের আসবে সে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। হযরত আইয়ুব আলায়হিস্ সালাম রোগে আক্রান্ত হয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। তিনি স্বয়ং এ দাবী করেননি যে, আমি রোগ মুক্ত করতে সক্ষম।

হযরত ইউনুস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিপদ গ্রস্থ হয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন, তিনি নিজে এ দাবী করেননি যে, আমি বিপদ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম। পবিত্র কোরআনে তাঁদের এসব কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, মহান নবী-রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহর সর্ব শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান বান্দাহ। তাঁরাই যখন রোগে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়েছেন, বিপদগ্রস্থ হয়ে তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করেছেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষও যেন তাই করে। কোনো কবরের কাছে গিয়ে, মাজারের কাছে গিয়ে সিজদা না দেয় এবং সাহায্য কামনা না করে। কোনো মৃত মানুষের কাছে বা পৃথিবীর কোনো শক্তির কাছে যেন সাহায্যের জন্য আবেদন না করে।

www.pathagar.com

বিশ্বনবীর আনুগত্য বনাম শান্তি ও মুক্তির প্রত্যাশা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সম্পর্কে যাদের সামান্য ধারণা রয়েছে, তারাও এ কথা অবগত রয়েছে যে, তিনি কোন্ সমাজে এবং কি বিভৎস-বিভিষীকাময় পরিবেশে আগমন করেছিলেন। সে সমাজের লোকদের জান্-মাল, ইয্যত-আব্রু, সহায়-সম্পদ কোনো কিছুর নিরাপত্তা ছিলো না। খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-চিকিৎসা ও নিরাপত্তার কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছিলো না। জোর যার মুল্লুক তার–এটাই ছিলো সেই সমাজের রীতি। যেখানে নিয়ম পরিণত হয়েছিলো অনিয়মে আর অনিয়ম পরিণত হয়েছিলো নিয়মে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ শান্তির আশায় হাহাকার করছিলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই অবস্থায় বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত মানব মুক্তির মহানায়ক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি আদিষ্ট হয়ে মানুষকে তাঁর আনুগত্য করার আহ্বান জানালেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পরে যারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করলো এবং তাঁর নেতৃত্বে একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো।

যে সমাজ থেকে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার শেষ রেশটুকু বিদায় গ্রহণ করেছিলো, ইতিহাস সাক্ষী– সেই সমাজ ভেঙে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতে নতুন করে যে সমাজ গড়া হলো, সেই সমাজে নেমে এলো শান্তির ঝর্ণাধারা। অনৈক্যই যে সমাজে ছিলো সাধারণ নিয়ম, সে নিয়ম পরিবর্তন হয়ে সেখানে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে উঠলো। একমাত্র নিজের স্বার্থ ব্যতীত পরের উপকার শব্দটি ছিলো যাদের কাছে অপরিচিত, তারাই পরের উপকারের জন্য নিজের সঞ্চিত ধনরাশি উন্মুক্ত অবারিত হস্তে বিতরণ করে দিলো। যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ কণ্ঠনালীর কাছে চলে এসেছে, সমুদ্রসম তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, সেই কঠিন মুহূর্তেও তাঁরা পানির পেয়ালা সামনে পেয়েও পানি পান না করে আরেকজনের দিকে পেয়ালা এগিয়ে দিয়েছেন। যারা ছিলো নারীর ইয্যতের যম– তারাই হয়ে গেলো নারীর সতীত্বের হেফাজতকারী। মিথ্যা ছিলো যাদের জীবনে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, তারাই হয়ে গেলো মহাসত্যের নিশানবরদার।

www.pathagar.com

রাসূলের আনুগত্য ভিত্তিক সমাজে মানুষ লাভ করলো জান্-মাল, ইয্যত-আব্রু, সহায়-সম্পদের নিরাপত্তা। মানুষ বুঝে পেলো তাদের মৌলিক অধিকারসমূহ। এটা কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়– রাসূলের আনুগত্য ভিত্তিক সমাজের চিত্র সোনালী অক্ষরে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, মানবতার মুক্তি, শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা অর্জনের জন্য আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের বিকল্প নেই। এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনেও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করার অর্থই হলো মহান আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰه–

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো, সে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শান্তি, কল্যাণ ও ঐক্য। আর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অশান্তি, অনৈক্য ও অকল্যাণ। যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র রাসূলকেই নেতা হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর আনুগত্য করলো, প্রকৃতপক্ষে তারা মহান আল্লাহরই আনুগত্য করলো। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভবে আল্লাহর বিধান অস্বীকার করলো বা অমান্য করলে যেমন অশান্তি, অনৈক্য, অকল্যাণ ও গযব নেমে আসে, অনুরূপভাবে রাসূলের আদেশ-নিষেধ অমান্য করলেও অশান্তি, অনৈক্য, অকল্যাণ ও গযব নেমে আসবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ ব্যপারে মানব জাতিকে সতর্ক দিয়ে বলেন–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ–

যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে এ বিষয়ে তাদের সতর্ক থাকা একান্ত কর্তব্য যে, তারা মহাবিপদগ্রস্ত হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদেরকে গ্রেফতার করবে। রাসূলের আনুগত্য পরিত্যাগ করে শান্তি, মুক্তি, ঐক্য ও কল্যাণের প্রত্যাশা করা বোকামী বৈ আর কিছুই নয়। অতএব দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে, নির্জনে-একাকী, গোপনে-প্রকাশ্যে তথা সর্বাবস্থায় রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

www.pathagar.com

তাহলেই কাঙ্খিত শান্তি-মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করা যাবে। রাসূলের আনুগত্য করাকেই পবিত্র কোরআনে ইত্তেবায়ে রাসূল বলা হয়েছে। ই'ত্তেবা আরবী শব্দ। এ শব্দের অর্থ হলো অনুসরণ করা, আনুগত্য করা, তাঁবেদারী করা, কারো পদাঙ্ক অনুসরণ করা, কারো পিছে পিছে চলা। রাসূলের ইত্তেবা করার অর্থ হলো, রাসূলকে অনুসরণ করা। রাসূলকে অনুসরণ সম্পর্কিত যে আয়াতসমূহ পবিত্র কোরআনে এসেছে, সেসব আয়াতেও 'ইত্তেবা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

হে রাসূল! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকেও ভালোবাসবেন; তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ ক্ষমাকারী, করুণাময়। (সূরা ইমরাণ-৩১)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'ইত্তেবা' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করার কথা বান্দাদের জানিয়ে দিলেন এবং এ কথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, মানুষ যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে ইচ্ছুক হয়, শান্তি, স্বস্তি, ঐক্য ও কল্যাণের প্রত্যাশা করে– তাহলে তাকে অবশ্য অবশ্যই তাঁর প্রেরিত রাসূলকে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার, শান্তি ও কল্যাণ লাভ করার– এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূলকে যারা অনুসরণ করবে, তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভালোবাসবেন অর্থাৎ তাদের ওপরে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, তারা অবশ্যই শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

www.pathagar.com

রাসূলের সুন্নাতই ইসলামী শরীয়াত

সুন্নাহ্-ও আরবী শব্দ। এই সুন্নাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ করা হয়েছে, তরীকা, পথ-রাস্তা, রীতি-নীতি। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনেও সুন্নাহ্ শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তিনি তাঁর নিয়মকে সুন্নাহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَاقَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلاً–

তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি এ হলো তাদের ব্যাপারে সুন্নাত এবং তুমি কখনও আল্লাহর সুন্নাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাবে না। (সূরা বনি ইসরাইল) সূরা 'ফাতাহ্'–এ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً–

আল্লাহর সুন্নাত, যা পূর্ব থেকেই কার্যকর রয়েছে, আর কখনও আল্লাহর এ সুন্নাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন দেখবে না। (সূরা ফাতাহ্) সূরা ফাতির–এ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন–

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً–

তুমি আল্লাহর সুন্নাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন হতে, কোনো প্রকারের ব্যতিক্রম হতে দেখতে পাবে না। (সূরা ফাতির)

পবিত্র কোরআনের এসব আয়াতে যে সুন্নাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, মুফাস্সীরগণ ও আরবী ভাষাবীদগণ এর অর্থ করেছেন, 'পথ, পন্থা, পদ্ধতি, আল্লাহর কর্মকুশলতার বাস্তব পদ্ধতি, আল্লাহর নিয়ম।'

সুতরাং বুঝা গেল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে পদ্ধতি ও নিয়মের অধীনে তাঁর সৃষ্টিসমূহ পরিচালিত করছেন, তা হলো আল্লাহর সুন্নাত এবং তাঁর সুন্নাতে কখনও কোনো পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে দৃষ্টি দান করেছেন দর্শন করার জন্য। শ্রবণ শক্তি দান করেছেন শোনার জন্য। মস্তিষ্ক দান করেছেন চিন্তা-গবেষণা করার জন্য। মাথা দিয়ে যেমন চোখের কাজ চলে না, হাত দিয়ে যেমন কানের

www.pathagar.com

কাজ চলে না, পা দিয়ে মুখের কাজ চলে না। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ যে কাজের জন্য নির্ধারণ করেছেন, তাই আল্লাহর সুন্নাত এবং আল্লাহর এ সুন্নাতে কোনো ব্যতিক্রম নেই।

সুন্নাতে নববী এবং ইত্তেবা–ই সুন্নাত হলো রাসূলের নিয়ম এবং তাঁর অনুসরণ করা। হাদীস গবেষকগণ অনেক ক্ষেত্রেই সুন্নাতের অর্থ করেছেন, 'শরীয়াত।' এই অর্থে ইত্তেবা-ই সুন্নাতের অর্থ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান লাভ করেছেন তা অনুসরণ করা।

এই অর্থে সুন্নাত হলো সেই মৌলিক আদর্শ, যে আদর্শ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গোটা পৃথিবীবাসীর অনুসরণ-অনুকরণের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। যে আদর্শ আল্লাহর রাসূল স্বয়ং তাঁর বাস্তব জীবনে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের বিশাল বিস্তীর্ণ অঙ্গনে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছেন এবং মানব জাতিকে অনুসরণ করার আহ্বান করেছেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করেছেন আল্লাহর দেয়া নিয়ম-নীতি। তিনি বলেছেন–

اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوْحٰى اِلَىَّ–

আমি কারো কোনো আদর্শই অনুসরণ করি না, আমি তাই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়।

ইসলামে সুন্নাত বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণের ভাষায়, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌখিক বক্তব্য, তাঁর ক্রিয়া-কর্ম, আর অন্য কারো কথায় বা কাজে তাঁর সমর্থন। তিনি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন অথবা অন্য কারো কাজে বা কথায় যেসব বিষয়ে তিনি সমর্থন দান করেছেন, এগুলোর সমষ্টিই হলো ইসলামী শরীআত। এ অর্থে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করার অর্থই হলো ইসলামী শরীয়াতের আনুগত্য করা।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

www.pathagar.com

مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِى فَقَدْ اَحَبَّنِى وَمَنْ اَحَبَّنِى كَانَ مَعِىَ فِى الْجَنَّةِ-

যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সে প্রকৃত অর্থে আমাকেই ভালোবাসলো। আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।

এখানেও সুন্নাতকে শরীয়াত বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ জীবনাদর্শকেই বুঝতে হবে। এক কথায় ইসলামী শরীয়াতই সুন্নাতে রাসূলের পরিপূর্ণ রূপ তথা ইসলামের গোটা অবয়ব। এদিক থেকে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জুমুআ, ঈদ ও কোরবানী ইত্যাদি ইবাদাত পর্যায়ের বিষয়াদি–আর শরীয়াত মোতাবিক বিয়ে-শাদী, লেন-দেন, বিচার কার্য পরিচালনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি মুআমালাত পর্যায়ের বিষয়াবলী সব কিছুই সুন্নাতে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী আইন বিশারদগণ তথা ফোকাহায়ে কেরাম কর্তৃক কোরআন ও হাদীস থেকে নির্গত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইত্যাদী পর্যায়ভুক্ত যে কোন প্রকারের বিষয়াদি মূল সুন্নাতে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত।

এদিক থেকে ইসলামী শরীয়াত ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই জীবনাদর্শের দুটো নাম। সুন্নাতে রাসূলকে এ ধরনের ব্যাপক অর্থের ধারক হিসেবে গ্রহণ করা হলে, তখন এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণই হেদায়াতের বাস্তবরূপ, আর সুন্নাতে রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করাই হলো পথভ্রষ্টতা তথা দালালাত বা গোমরাহী। আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করেছেন–

لَوْتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ-

তোমরা যদি তোমাদের নবীর সুন্নাতকে (জীবনাদর্শকে) প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

সিরাতুল মুস্তাকিম বা হেদায়াতের পথে চলা শুধুমাত্র কোরআনের ওপরে নির্ভর করে না। এ পথে চলতে হলে অবশ্যই রাসূলের সুন্নাতকেও অনুসরণ করতে হবে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

www.pathagar.com

اِنِّىْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا اَبَدًا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّتِىْ وَلَنْ يَّفْتَرِقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ-

আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, এ দুটো জিনিসের অনুসরণ করতে থাকলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটো জিনিসের একটি হলো আল্লাহর কিতাব আর অপরটি হলো আমার সুন্নাত এবং কিয়ামতের দিন হাউজে কাওসারে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এ দুটো জিনিস কখনও একটির সাথে থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন হবে না। (মুস্তাদরাকে হাকেম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৩)

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ দান কালেও আল্লাহর রাসূল তাঁর সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তা অনুসরণের জন্য মানব জাতিকে তাগিদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন-

يٰاَيُّهَاالنَّاسُ قَدْتَرَكْتُ فِيْكُمْ مَااِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهٖ فَلَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا اَمْرًا بَيِّنًا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهٖ-

হে মানব গোষ্ঠী ! আমি তোমাদের কাছে এমন এক অমূল্য সম্পদ রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি সে সম্পদকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তাহলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। সে সম্পদ হলো আল্লাহর কোরআন ও তাঁর নবীর সুন্নাত। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনুল কারীমেও তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে অনুসরণ করার জন্য বারবার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা বলেন-

وَمَااٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ-وَمَانَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا-

রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ ও ধারণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। (সূরাহাশর-৭)

রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ ও সত্য-সঠিক পথ। তাঁর সুন্নাত ব্যতীত সহজ-সরল পথ লাভ করা কল্পনার অতীত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

www.pathagar.com

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا-

তোমরা রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করলেই সত্য সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে। (সূরা নূর-৫৪)

রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করার অর্থই হলো আল্লাহর আদেশ পালন করা। সূরা নিছার ৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ-

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে, সে-ই যথার্থ অর্থে আল্লাহর আনুগত্য করলো।

রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ না করলে তথা তাঁর আদেশ-নিষেধ না মানলে, তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা করলে আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

যারা রাসুলের আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের ওপর যে কোন বিপদ-মুসিবত আসতে পারে অথবা কোন কঠিন আযাব তাদেরকে পরিবেষ্টন করতে পারে। (সূরা নূর-৬৩)

রাসূলের সুন্নাতের সাথে সামান্যতম দ্বি-মত পোষণ করা, তাঁর সুন্নাতের ব্যাপারে কোন সংশয়-সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার কারো কোনো অধিকার নেই। প্রশ্নাতীতভাবে তাঁর ইত্তেবা করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا-

কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ আসার পর তা অনুসরণ করা না করার ব্যাপারে মুমিন পুরুষ ও নারীদের কোনো অধিকারই থাকতে পারে না। যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে সে পথভ্রষ্ট হয়ে ইসলাম থেকে অনেক দূরে চলে যায়। (সূরা আহযাব–৩৬)

আল্লাহর রাসূলকে কোন মুসলমান অনুসরণ করতে অনিচ্ছুক হলে সে কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ-فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ-

হে নবী আপনি বলে দিন, আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে চলো, যদি তা না করো তবে জেনে রেখো, আল্লাহ কাফিরদের ভালোবাসেন না। (সূরা ইমরাণ-৩২)

www.pathagar.com

সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য

মহান আল্লাহ যেমন আদেশ-নিষেধ দান করার ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষী নন–সম্পূর্ণ স্বাধীন, আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলও তেমনি স্বাধীন। আদেশ-নিষেধ দানের ক্ষেত্রে তিনি কোনো মানুষের মুখাপেক্ষী নন। মুসলিম পরিচয় দানকারী ব্যক্তি রাসূলের আদেশ-নিষেধ তথা তাঁর সুন্নাত অনুসরণে বাধ্য। আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের সাথে দ্বি-মত পোষণ করলে মানুষ যেমন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, কাফির হিসেবে চিহ্নিত হয়, রাসূলের আদেশ-নিষেধের সাথে দ্বি-মত পোষণ করলেও মানুষ পথভ্রষ্ট ও কাফির হয়ে যাবে।

আরেকটি ব্যাখ্যানুসারে সুন্নাত হলো, নেক কর্মসমূহের একটি বিশেষ স্তর। ইসলামী শরীয়াতের বিধি-নিষেধ পালনের সুবিধার্থে, ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী মুজতাহিদ ইমামগণ কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রামাণ্য করণীয় বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও মোস্তাহ্সান ইত্যাদি স্তরসমূহের বিভক্তি দেখিয়েছেন। অপরদিকে বর্জনীয় বিষয়াদিকে হারাম, মাকরুহে তাহ্রিমী ও সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি ইত্যাদি স্তরে বিভক্ত করে উপস্থাপিত করেছেন। আবার শরীয়াত কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়নি এমন ধরনের বিষয়াদিকে মুবাহ বা হালালের স্তরে রেখেছেন।

শরীয়াতের এ ধরনের স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনবীদগণ তথা ফকীহ্গণ ফরজ ও ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের করণীয় বহু বিষয়াদিকে সুন্নাত নামে আখ্যায়িত করেছেন। সুন্নাত মুস্তাহাব পর্যায়ের করণীয় নেক কাজগুলো ফরজ ও ওয়াজিবের ক্ষতি পূরণের পক্ষে সহায়ক। ফকীহ্গণ ফরজ ও ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের কাজগুলোকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রথমত ঃ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ অর্থাৎ এমন ধরনের সুন্নাত কাজ যা পালন করার জন্য জোর তাগিদ করা হয়েছে।

জামায়াতের সাথে ফরজ নামায আদায় করা, মুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি রাখা, গোঁফ খাটো করা, পুরুষের খাত্না করা, যথা সময়ে হাত-পায়ের নখ কাটা, পুরুষের নাভীর

www.pathagar.com

নীচের পশম পরিষ্কার করা, বোগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা ; নারীর উভয় ক্ষেত্রে উপড়ানো, মুসলমানের দাওয়াত গ্রহণ করা, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতে একের প্রতি অন্যের সালাম আদান-প্রদান করা, মোসাফাহ্ করা, মাথায় টুপি রাখা ইত্যাদি কাজগুলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ পর্যায়ের। রোযা পূর্ণ করে সুর্যাস্তের পর ইফ্তার করা, আর রোযা রাখার জন্য সেহ্রী খাওয়াও সুন্নাত। তবে সোবহে সাদেক হয়ে গেলে কিছুই খাওয়া বা পান করা যাবে না। বরং তখন কিছু খেলে বা পান করলে রোযা হবে না।

এক মুষ্ঠিরও কম পরিমাণ দাড়ি কেটে ছোট করা মাকরুহে তাহরীমী। দাড়ি শুধু নীচের দিকে বৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে মুখের দু'পাশ থেকে কেটে ছোট করাও মাকরুহে তাহরীমী। দাড়িকে বৃদ্ধি লাভ করতে দেয়া আর গোঁফ খাটো করা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى–

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের গোঁফ খুব ছোট করবে আর দাড়ি লম্বা করবে। (মুসলিম শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১২৯)

দাড়ি সম্পর্কে আরো একটি হাদীসে বলা হয়েছে–

عن ابى هريرة رضى الله تعلى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا للحى خالفوا المجوس–

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের গোঁফগুলো খুব খাটো করবে, আর দাড়িগুলো লম্বা করে রাখবে। (এ ব্যাপারে) অগ্নি পূজকদের বিপরীত করবে। (মুসলিম শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১২৯)

www.pathagar.com

অর্থাৎ যারা আগুনের পূজা করে তারা গোঁফ বড় করে রাখে এবং দাড়ি ছোট করে অথবা দাড়ি একেবারেই কেটে ফেলে। এ জন্য হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা তাদের বিপরীত করবে।

আবার অন্য হাদীসে মুখের দু'দিকের ও নীচের দিকের দাড়ি কেটে ছোট করে রাখার কথা রয়েছে। দাড়ি লম্বা করে রাখা এবং কেটে ছোট করে রাখা– উভয় পর্যায়ের হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আমল সম্পর্কীত হাদীসটি সনদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রদ্দুল মোহতার কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ৩৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'দাড়ি সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বিশুদ্ধ সুত্রে বর্ণনা এসেছে যে, তিনি এক মুষ্ঠি থেকে অতিরিক্ত দাড়ি ছেটে নিতেন। তবে এ ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী এক শ্রেণীর ভোগবাদী লোক ষ্টাইল হিসেবে যেমন ছোট ছোট দাড়ি রাখে, তাদেরকে অনুসরণ করা ইসলামী আইন বিশারদগণের কেউ বৈধ বলে মনে করেননি। এক মুষ্ঠি দাড়ির অতিরিক্ত দাড়ি ছেটে নেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যামূলক কিতাব বাজলুল মাজহুদের প্রথম খন্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আর তা এভাবে করতে হবে যে, পুরুষ লোক তার নিজ দাড়ি হাতের মুঠোয় ধরবে, তারপর মুঠোর বাইরের অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলবে। এমন ধরনের পদ্ধতির বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ), ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) থেকে কিতাবুল আসারে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করা ও গায়ে লম্বা জামা পরিধান করা সুন্নাতে যায়েদাহ্ বা মুস্তাহাব পর্যায়ের কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ী ও লম্বা জামা পরিধান করেছেন বলে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। সুতরাং লম্বা জামা ও পাগড়ী ব্যবহার করতে পারলে উত্তম। কিন্তু নিজে লম্বা জামা ও পাগড়ী ব্যবহারও করবে না এবং যারা ব্যবহার করবে তাদেরকে বিদ্রুপ করবে, এটা বৈধ হবে না। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রাসূল এসব ব্যবহার করেছেন, সতরাং এ ধরনের বিদ্রুপ করা থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করতে হবে। আল্লাহর রাসূলের

www.pathagar.com

যে কোনো সুন্নাত–তা হতে পারে বাহ্যিক দৃষ্টি কোণ থেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পর্যায়ের, তার প্রতি সামান্যতম অবহেলা-অবজ্ঞা প্রদর্শন করা যাবে না। এ ব্যাপারে তেমনি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেমনভাবে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ–وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا–

আমার রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন তা তোমরা পূর্ণভাবে গ্রহণ ও ধারণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। (সূরাহাশর-৭)

কোরআনের উল্লেখিত আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, রাসূলের নির্দেশের মধ্যে ফরজ আর ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয়গুলোই অনুসরণ করতে হবে আর সুন্নাতগুলো অনুসরণ না করলেও চলবে। বরং আল্লাহর এ নির্দেশের মধ্যে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং রাসূলের সুন্নাতকে অবহেলা করার অর্থই হবে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা।

শরহে ফিকহে আকবর নামক কিতাবের ২২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হানাফী ফকীহ্গণ ঐ ব্যক্তির প্রতি কুফরী ফতোয়া আরোপ করেছেন, যে ব্যক্তি রাসূলের কোনো সুন্নাতকে অবজ্ঞা করে সব সময় পরিহার করে থাকে। তবে যারা সুন্নাতকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করে না, বরং সুন্নাতকে পালনীয় সওয়াবের কাজ বলে গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে স্বীকার করে, কিন্তু অলসতা বশতঃ অথবা অন্য কোনো কারণে সুন্নাত পালন করে না, অথবা সুন্নাত ছুটে যায় এবং এ কারণে অন্তরে অনুশোচনা করে, এমন লোকদের ওপর উল্লেখিত কঠোর ফতোয়া নিপতিত হবে না। কেননা, সুন্নাতের বিরোধী হওয়া এক ব্যাপার আর মাঝে মধ্যে কোনো কারণে ছুটে যাওয়া ভিন্ন ব্যাপার।

সুন্নাত পরিহার সংক্রান্ত বিষয়ে মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যামূলক কিতাব মিরকাতুল মাফাতীহ–প্রথম খন্ডের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, অলসতা বশতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রমাণ্য সুন্নাত পরিহার করা হলে সুন্নাত পরিহারকারী ব্যক্তি গুনাহের অভিযোগে তিরস্কৃত হবে। আর অবজ্ঞা বশতঃ সুন্নাত

www.pathagar.com

পরিহার করা হলে সুন্নাত পরিহারকারী ব্যক্তি গুনাহের অভিযোগে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সুন্নাতকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে ফকীহ্ ইমামগণের উল্লেখিত মতামত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াতের যথাযথ আনুগত্যের প্রশ্নে অত্যন্ত গভীর ও ফলপ্রসু ব্যবস্থা–এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। পরিপূর্ণ আমলেই পরিপূর্ণ শান্তির আশা করা যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসগণ সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ক্রিয়া-কর্মকেও সুন্নাত ও হাদীস নামে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃত অর্থে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ক্রিয়া কর্মের মানদন্ড ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথাযথ অনুসরণ ও অনুকরণ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

মিশকাতুল মাসাবীহের শরাহ মিরকাতুল মাফাতীহ–অষ্টম খন্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠা–(১) কিতাবুল ওয়াফা (২) ইবনে মাজাহ্ (৩) জামেয়ে সগীর (৪) ও, মুস্তাদরিকে হাকেম ইত্যাদি হাদীসের কিতাবাদি থেকে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টাখ্নুর ওপর পর্যন্ত লম্বা কামিস পরিধান করতেন। সাহাবায়ে কেরাম নবীর কাছ থেকে যা শুনতেন, নবীকে করতে দেখতেন, এসব বিষয় তাঁরা অন্যকে অবগত করা এবং পর্যালোচনা করেই ক্ষান্ত হতেন না, তাঁরা তা নিজেদের জীবনে বাস্তবে রূপদান করতেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো আকীদা ও নিছক তত্ত্বমূলক কথা বলেছেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম তা নিজেদের স্মৃতিতে বদ্ধমূল করে নিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী নিজেদের আকীদা বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো আদেশ-নিষেধমূলক কথা বলেছেন, কোনো আইন জারী (Bring a law into force) করেছেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম সাথে সাথে তা কাজে পরিণত করেছেন। রাসূলের আদেশ-নিষেধ ও জারী করা আইনকে যতক্ষণ প্রতিদিনের জীবনে নৈমিত্তিক

www.pathagar.com

অভ্যাসে পরিণত না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা তা চর্চা ও অভ্যাস করার ব্যাপারে সামান্য অবহেলা প্রদর্শন করেননি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমাদের মধ্যে যখন কেউ দশটি আয়াত শিখতো, তখন তার অর্থ অত্যন্ত ভালোভাবে অনুধাবন করা এবং সে অনুসারে কাজ করার পূর্বে সে আর দ্বিতীয় কিছু শেখার জন্য চেষ্টা করতো না। (জামেউল বায়ান)

অর্থাৎ যা শেখা হলো, তার মমার্থ অনুধাবন না করে এবং তা বাস্তব জীবনে কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত না করে সাহাবাগণ আরো কিছু শেখার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন না। শেখা হলো অনেক কিছু কিন্তু আমল করা হলো না–সাহাবাদের জীবন এমন ছিল না। ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহ (Fundamental law of Islam) সাহাবাদের জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহর রাসূল বিশেষভাবে যত্ন নিতেন। মুসলিম জনগোষ্ঠী তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করছে কিনা, সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি ইসলামের ব্যবহারিক নিয়ম পদ্ধতির অনুসরণের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। ইসলামের মৌলনীতিসমূহ যেন মুসলমানদের প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়, এ জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের বলতেন–

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ–

তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখো, ঠিক অনুরূপভাবে নামায আদায় করবে। (বোখারী)

একই ভাবে হজ্জের ব্যাপারে তিনি বলেছেন–

خُذُوْا عَنِّىْ مَنَا سِكَكُمْ–

আমার কাছ থেকে তোমরা হজ্জ পালন করার নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করো। (মুসলিম)

পবিত্র কোরআনে নামায আদায়-রোযা রাখা ও যাকাত আদায়ের আদেশসহ অন্যান্য বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব আদেশের বিস্তারিত দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। সুতরাং আল্লাহর আদেশের বিস্তারিত দিক জানতে ও

www.pathagar.com

অনুসরণ করতে হলে তা আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকেই জানতে হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে অনুসরণ করেছেন, সেভাবেই করতে হবে। কারণ রাসূল ছিলেন গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য শিক্ষক। প্রত্যেকটি কাজের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সে কাজ বাস্তবে করে মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সাহাবাগণ সে নিয়মেই সে কাজ সম্পাদন করেছেন।

ইসলামী বিধানের নিয়ম-পদ্ধতি সাহাবাগণ কিভাবে পালন করছেন, রাসূল সেদিকে লক্ষ্য করতেন। কারো কোনো ভুল হলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মসজিদে নববীতে একদিন লক্ষ্য করলেন, একজন সাহাবীর নামায আদায় পদ্ধতি যথাযথভাবে সম্পাদিত হলো না। নামায সমাপ্ত করে সাহাবী যখন তাঁর কাছে এলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন, তোমার নামায যথাযথভাবে আদায় করা হয়নি, যাও নামায যথাযথ নিয়মে আদায় করো।

সাহাবী সাথে সাথে চলে গেলেন নামায আদায় করার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, এবারও তোমার নামায আদায় পদ্ধতি ঠিক হলো না। সাহাবী পুনরায় নামায আদায় করলেন। এভাবে চারবার করার পরেও যখন সাহাবীর নামায আদায়ের নিয়ম ঠিক হলো না, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নামাযে দাঁড়িয়ে উক্ত সাহাবীকে নামায আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে ইসলামের আদর্শিক, নীতিগত ও বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবার সাথে সাথে তা শুনতেন এবং মুখস্থ করে নিতেন এবং সে আয়াতের মর্ম তাঁরা রাসূলের কাছ থেকেই জেনে নিতেন।

শুধু তাই নয়, সাহাবায়ে কেরামও আল্লাহর রাসূলের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি স্পন্দনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। বোখারী ও আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, কয়েকজন ব্যক্তি হযরত খাব্বাব ইবনুল আরিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের

www.pathagar.com

নামায আদায় করার সময় কি কোরআন তিলাওয়াত করতেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'কোরআন তিলাওয়াত করতেন।' তাঁরা জানতে চাইলেন, 'আপনারা তো পিছনে থাকতেন, বুঝতেন কিভাবে যে তিনি কোরআন তিলওয়াত করছেন ?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমরা আল্লাহর নবীর শ্মশ্রুর কম্পন দেখেই অনুভব করতে পারতাম।'

মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা বলেন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর ও আসরের নামাযে দাঁড়িয়ে কতটুকু সময় ব্যয় করতেন, তা আমরা অনুমান করে দেখতাম। আমরা দেখতাম, তিনি প্রথম দুই রাকা'আতে তিন আয়াত কোরআন তিলাওয়াতের সমান সময় এবং শেষ দুই রাকাআতে তার অর্ধেক পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন।

মুসনাদে আহ্‌মাদে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন লোক হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রশ্ন করলেন, 'আমরা কোরআনে শুধু ভয়কালীন নামায ও নিজের বাড়িতে থাকাকালীন নামায সম্পর্কে উল্লেখ দেখতে পাই। কিন্তু ভ্রমণকালে কিভাবে নামায আদায় করতে হবে, তা দেখতে পাই না। কেনো দেখতে পাই না ?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমরা দ্বীন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এ অবস্থায় আল্লাহ অনুগ্রহ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের জন্য রাসূল হিসাবে পাঠালেন। সুতরাং এখন আমরা তাঁকে যেভাবে দ্বীনের কর্মসমূহ সম্পাদন করতে দেখি, অনুরূপভাবে তাই করতে থাকি।'

সাহাবায়ে কেরাম এমন অনেক কাজেও রাসূলের করা কাজের হু-বহু অনুসরণ-অনুকরণ করতেন, যে কাজ অনুসরণ করা শরীয়াত অনুসারে অপরিহার্য নয়। তবুও সাহাবাগণ তা আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কেরামের এমন অনুসরণের মাধ্যমেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র দিকও সংরক্ষিত হয়েছে, বর্তমান যুগের মানুষ তা জানতে পারছে। সুতরাং আল্লাহর নবীর সুন্নাত হিসেবে আমাদের সামনে যা রয়েছে, তা অনুসরণ করা আমাদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। আহার করে আমাদের যখন জীবন

www.pathagar.com

ধারণ করতেই হয়, তাহলে সে আহারের পদ্ধতিটা নবীর কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। দাড়ি যখন রেখেছি. তখন তা রাসূলের অনুসরণেই রাখা উচিত। এভাবে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণে সচেতনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করতে হবে।

যে নবী ও রাসূলদেরকে অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এত তাগিদ দিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমাদেরকে এ কথা জানতে হবে যে, কেনো এই রিসালাত ও নবুয়্যতের প্রয়োজনীতা। কেনো মানুষের জন্য নবুয়্যত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ নবী ও রাসূল ব্যতীত মানুষ কোনোক্রমেই শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ এবং সত্য ও সঠিক পথ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম নয়।

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরামদের অনুসরণ

রাসূলের যুগে যেসব ব্যক্তিবর্গ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ লাভ করেছেন, তাঁর আনুগত্য করেছেন এবং ঈমানদার অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন সেসব সম্মানীত ও মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গই আল্লাহর রাসূলের সাহাবী হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে দ্বীন গ্রহণ করেছেন। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল তাঁদেরকে দ্বীনের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। কুরআনুল কারীমের রুহানী খোরাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ভেতরে সরবরাহ করে ঈমানের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আল্লাহর নবী তাঁদের দৈহিক পবিত্রতা ও হৃদয়ের ভয়-ভক্তি মিশ্রিত বিনয় শিখিয়েছেন এবং এসবের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সমুন্নতি, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিলো। সুতরাং তাঁদের ঈমান ও আমল পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের তুলনায় নিখুঁত ও উন্নত হবে এবং অনুসরণীয় হবে এটাই স্বাভাবিক।

সাহাবায়ে কেরামদের সমষ্টিগত দলের ঈমান ও আমল কোরআন ও সুন্নাহর মানদন্ডে যাচাই করা বিশুদ্ধ ও সঠিক বলে ঘোষিত হয়েছে আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাব মহাগ্রন্থ আল কোরআনে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ–

যেসব মুহাজির ও আনসার সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলো এবং যারা পরে নিতান্ত সততার সাথে তাদের পিছনে পিছনে এসেছিলো, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি রাযী ও সন্তুষ্ট হলেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি রাযী ও সন্তুষ্ট হলো। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যান রচনা করে রেখেছেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সতত প্রবাহমান। আর তারা চিরদিন সেখানে থাকবে, বস্তুত এটাই বিরাট সাফল্য। (সূরা তওবা-১০০)

www.pathagar.com

কোরআন ও সুন্নাহর যথাযথ আনুগত্যকারী মুসলিম মিল্লাতের প্রথম স্তরের অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ যারা মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজিরগণ ও মদীনার ঐ সব লোকজন, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলো, সেসব আনসারগণ এবং পরবর্তীতে যারা অকপট চিত্তে ঈমান ও আমলে মুহাজির ও আনসারগণের অনুসরণ করলো, তারা সকলেই এমন নেক লোক, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তাঁরাও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাঁদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যেসব জান্নাতের তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহমান থাকবে। তাঁরা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আর এটাই হলো সফলতার সর্বোচ্চ স্তর।

সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহিম আজমাঈন সকলেই কোরআন ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন সত্যবাদী। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা সকলেই ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণীয়। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনো কোনো সাহাবী মিথ্যা রাওয়ায়েত করেননি। হাদীস রাওয়ায়েতের ক্ষেত্রে কোনো সাহাবীর অসত্য বক্তব্য বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি এবং সাহাবীদের জীবন চরিত গবেষণা করে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে সময়ে কতিপয় সাহাবা দুঃখজনকভাবে পারস্পরিক বিরোধ ও আত্মকলহে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের জীবন চরিতও গবেষণা করে এ কথা প্রমাণীত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলেননি, এমন কোনো কথাকে আল্লাহর রাসূলের উক্তি বলার ব্যাপারে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্তকতা অবলম্বন করেছেন। নিজেদের কোনো কথাকে আল্লাহর রাসূলের নামে চালিয়ে দেয়াকে তাঁরা সীমাহীন ধৃষ্টতা ও সাংঘাতিক গুনাহ্ হিসাবে বিবেচনা করতেন।

প্রকৃতপক্ষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলেননি এবং যার কোনো ভিত্তি নেই সেসব কথা সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিহার করে চলতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

الصحابة كلهم عدول– সাহাবীগণের সকলেই সত্যবাদী।

www.pathagar.com

হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদ মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বর্ণনাকারীদের সত্যবাদিতার বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে দেখেছেন। সার্বিকভাবে যাচাইয়ের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সকল সাহাবীগণকে সম্পূর্ণ সত্যবাদী পেয়েছেন। সুতরাং আহ্‌লে সুন্নাতের আকীদা হলো, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবাগণের সকলেই আদেল বা ন্যায়বান। ১৩২১ হিজরী সনে আল আমীরা প্রেস-মিসর থেকে প্রকাশিত 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ্' নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ২২৯ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) বলেছেন–

الصحاة ثقاة صادقون فيما يخبرون به عن نبى صلى الله عليه وسلم واصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والله الحمد من اصدق الناس حديثا عنه لايعرف منهم من تعمد عليه كذبا مع انه كان يقع من احدهم من الهنات مايقعونهم ذنوب وليسوا معصومين ومع هذا فقد جرب اصحاب النقر والامتحان احاديثهم واعتبروها بما تعتبر الاحاديث فلم يوجد عن احد منهم تعمد كذبة–

সকল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন নির্ভরযোগ্য রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ তাঁরা যা কিছু বর্ণনা করেন, সে ব্যাপারে তাঁরা সকলেই ছিলেন সত্যবাদী– আল হামদুলিল্লাহ্! আল্লাহর রাসূল থেকে হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম সকলের চেয়ে অধিক সত্যবাদী। আল্লাহর রাসূলের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করেছেন– অনুসন্ধানে এমন একজন সাহাবীরও খোঁজ পাওয়া অসম্ভব। অথচ সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য থেকে ব্যক্তি বিশেষের কোনো দুর্বলতা যে প্রকাশ পায়নি এমনটি নয়। কারণ তাঁরা নিষ্পাপ–মাসুম ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের কারো মধ্যে থেকে ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা গুনাহ্

www.pathagar.com

সংঘটিত হয়ে যাওয়া বিচিত্র অথবা অসম্ভব কিছু নয়। সর্বোপরি হাদীস যাচাই-বাছাই-এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ সাহাবায়ে কেরামদের বর্ণিত হাদীস সুক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অসত্য হাদীস বর্ণনা করার মতো একজন সাহাবীরও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এ জন্য বিজ্ঞ হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, 'সাহাবায়ে কেরাম কোনো গুনাহর কাজে জড়িত হন বা না হন তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহ গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। কোনো সাহাবী ইচ্ছা করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্বার সাথে মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত করতে পারেন না।

উপরে আলোচিত ইসলাম গ্রহণ ও বিশুদ্ধ ঈমান ও আমলের অধিকারী হওয়া সম্পর্কে মুহাজির ও আনসারগণের প্রথম ও অগ্রগামী হওয়া সম্পর্কীয় সূরা তওবার ১০০ নম্বর যে আয়াত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা বলেছেন, তা সর্বযুগের, সর্বকালের ও পৃথিবীর সকল স্থানে অবস্থানরত মুসলিম উম্মাহর জন্য আদর্শিক দিক নির্দেশনামূলক একটি অতি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট বক্তব্য। এই বক্তব্যে দুই শ্রেণীর উচ্চ সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের সফলতা ও কৃতকার্যতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন।

ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী এই দুই শ্রেণীর সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণের সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা সূরা হাদীদে আলোচনা করেছেন। হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা আল্লাহর নবীর সাহাবী হওয়ার মহান সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, আর যারা হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, সম্মানীত সাহাবায়ে কেরামদের এই দুই দলের মধ্যে প্রথম দলটি সম্মান ও মর্যাদাগত দিক থেকে দ্বিতীয় দলটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। অবশ্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাহাবায়ে কেরামদের উভয় দলের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করে তাঁদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ م بَعْدُ وَقَتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى-

তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পর অর্থ ব্যয় ও জিহাদ করবে, তারা কখনও সেই লোকদের সমান হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে অর্থ ব্যয় ও জিহাদ করেছে। তাদের মর্যাদা পরে অর্থ ব্যয় ও জিহাদকারীর তুলনায় অনেক বেশী ও বিরাট, যদিও আল্লাহ তা'য়ালা উভয়ের কাছেই উত্তম প্রতিশ্রুতি করেছেন। (সূরা হাদীদ-১০)

অর্থাৎ বিপুল শুভফল, কল্যাণ ও সওয়াবের অধিকারী এই উভয় শ্রেণীর লোকই। কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রেণীর সম্মান ও মর্যাদা অন্য সকল শ্রেণীর লোকদের তুলনায় সর্বাধিক। কারণ, তাঁরা অধিকতর কঠিন অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্য এমন সব বিপদ, মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন যা অন্য সকল শ্রেণীর লোকদের ভোগ করতে হয়নি। তাঁরা এমন কঠিন অবস্থায় নিজের সহায়-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ব্যয় করেছেন যখন দেশের পর দেশ, এলাকার পর এলাকা বিজয়ের ফলে এই ব্যয়ের প্রতিবিধান করার কোনো দূরতম সম্ভাবনাও দৃষ্টি গোচর ছিলো না। তাঁরা এমন কঠিন ও সঙ্কটময় পরিবেশে ইসলামের দুশমনদের সাথে সংগ্রাম-আন্দোলন, যুদ্ধ-জিহাদ করেছেন যখন দুশমনরা বিজয়ী হয়ে ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী লোকদের সম্পূর্ণ উৎখাত করে ফেলবে বলে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছিলো। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা আল আসরের তাফসীরের 'হক-এর প্রতি দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী' শিরোণাম পড়ুন)।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় আমাদেরকে বলেছিলেন, 'খুব শীঘ্রই তোমরা এমন সব লোকজন আসবে যাদের আমল দেখে তোমরা তোমাদের আমলকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, নগণ্য ও সামান্য ধারণা করবে। কিন্তু সেসব লোকদের মধ্যে কারো কাছে যদি পর্বত সমতুল্যও স্বর্ণ থাকে এবং সে তার সমস্তই আল্লাহর পথে

www.pathagar.com

ব্যয় করে দেয়, তাহলে তোমাদের দুই রতল (আমাদের দেশে প্রচলিত ওজনের প্রায় ৫০০ গ্রামের সমান হলো এক রতল) এমনকি এক রতল ব্যয় করারও সমান হতে পারবে না। (ইবনে জরীর)

সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ কৃতকার্যতা ও সফলতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ হয়ে জান্নাত লাভ করবেন, এ কথারই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে সূরা হাদীদের ১০ নম্বর আয়াতে। হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী মুহাজির ও আনসারগণ প্রথম দিকের অর্থাৎ সাবিকুনাল আওয়ালীন– অগ্রগামী মুসলমান হওয়ার সম্মান ও মর্যাদার বিষয় উল্লেখিত আয়াতে ব্যক্ত করার পরেই বলা হয়েছে, 'যারা সাবিকুনাল আওয়ালীন অর্থাৎ প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অনুসরণকারী বলে প্রমাণীত হবে, তারা সে সকল মর্যাদাবান লোকদের দলভুক্ত হবে, যাদের প্রতি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রাথমিক যুগের মুসলমান অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণের একনিষ্ঠ অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ও তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদের ব্যাপকতায় সেসব লোকও অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা কিয়ামতের পূর্ববর্তী যুগেও মুহাজির ও আনসারদের অনুরূপ ঈমান-আকীদা ও আমল দ্বারা নিজেদেরকে তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারী বলে প্রমাণ দিতে সক্ষম হবে। উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা অনুধাবন করা গেলো যে, সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই নাজাতপ্রাপ্ত এবং তাঁরা জান্নাতী। আর তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণও নাজাতের পথের পথিক। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামদের জীবনী ভিত্তিক বা তাঁদেরকে কেন্দ্র করে ঐসব ইতিহাসমূলক গ্রন্থ কিছুতেই প্রামাণ্য গ্রন্থ হতে পারে না, যেসব গ্রন্থ তাঁদের দোষ-ত্রুটিকেই প্রাধান্য দিয়ে রচনা করা হয়েছে। সেই গবেষণা, পর্যালোচনা, সমালোচনা ও মন্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে, যা সাহাবা সম্পর্কিত আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীসের মানদন্ডে উত্তীর্ণ।

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরামদের ইতিহাস অস্বচ্ছ হবার কারণ

একটি কথা সকলকেই স্মরণে রেখে সাহাবায়ে কেরাম বা অন্যান্য যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবনী পাঠ করতে হবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে নিয়ম-নীতি, পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা পৃথিবীর অন্য কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়নি। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো জীবন চরিত রচনার ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য আড়াল হওয়া, কোনো ঘটনা উল্লেখ না হওয়া অথবা কোনো ঘটনা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বর্ণনা, বিদ্বেষ প্রসূত বর্ণনা বা অতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রঞ্জিত বর্ণনা, বর্ণনাকারীর দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, মানসিকতা কর্তৃক প্রভাবিত বর্ণনা দোষাশ্রিত হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ)-এর জীবনী গ্রন্থগুলোয় এমন সব ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, যা পাঠ করলে মনে হবে যে, তাঁর সামর্থ, সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর রাসূলের থেকেও অনেক অনেক বেশী ছিলো (নাউযুবিল্লাহ)। আসলে অতিভক্তির কারণেই এ ধরনের অতিরঞ্জিত ঘটনাবলীর জন্ম দেয়া হয়েছে।

১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহী বিপ্লবের ইতিহাস, তারও পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, বালাকোটের ইতিহাস, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং নিকট অতীতে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ জন্ম নেয়ার ইতিহাস সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি-আদর্শ ও চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন, তিনি সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই ইতিহাস রচনা করেছেন। কোথাও প্রকৃত সত্যকে আড়াল করা হয়েছে, কোথাও ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে আবার কোথাও মন-মস্তিষ্ক প্রসূত কাহিনী সংযোজন করা হয়েছে। অধিকাংশ ইতিহাস পক্ষপাত দোষাশ্রিত এবং বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। সুতরাং দুই ধরনের বর্ণনা সম্বলিত রচিত ইতিহাস পাঠ করে কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করা বড়ই কঠিন। এ জন্য সমগ্র ইতিহাস পাঠ করে প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে হবে এবং মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যে সত্য আড়াল করা হয়েছে, তা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করতে হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ শুধু মুসলিম উম্মাহরই নয়– গোটা মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে–

مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَانَّ الْحَىَّ لاَ تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ أُولئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا اَفْضَلَ هذِهِ الاُمَّةِ اَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَاَعْمَقَهَا عِلْمًا وَ اَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اِخْتَارَ هُمُ اللّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلاِقَامَةِ دِيْنِهِ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْا هُمْ عَلَى اثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلاَقِهِمْ وَسِيَرِ هِمْ فَانَّهُمْ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ–

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হতে আগ্রহী, তার উচিত এমন ব্যক্তির সুন্নাত ধারণ করা যিনি ইন্তেকাল করেছেন। কারণ যে ব্যক্তি জীবিত সে যে ভবিষ্যতে ফিত্নায় নিপতিত হবে না, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর সেই ইন্তেকাল করা লোকগুলো হচ্ছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরা ছিলেন এই উম্মতের সর্বোত্তম চরিত্রবান লোক। তাঁদের হৃদয় ছিলো সমধিক পূণ্যময়-আলোক উজ্জ্বল এবং গভীরতম জ্ঞান সম্পন্ন। তাঁদের মধ্যে কেনো কৃত্রিমতা ছিলো না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে বাছাই করেছিলেন তাঁর নবীর সাহাবী হিসেবে এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। অতএব তোমরা তাঁদের সঠিক মর্যাদা অনুধাবন করো, স্বীকার করো, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো এবং তাঁদের চরিত্র ও স্বভাবের যতদূর সম্ভব তোমরা গ্রহণ করো। কারণ তাঁর ছিলেন সঠিক ও সুদৃঢ় হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (মিশকাতুল মাসাবীহ)

তাঁদেরকে অনুসরণ করে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব মন্ডলী কৃতকার্যতা ও সফলতার পথে এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা যেমন তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন,

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে তাঁদেরকে যারা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে এই পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করবে, তাদের প্রতিও আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ ছিলেন সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ –

আল্লাহ তো ভালোবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেনো তারা ইস্পাত নির্মিত প্রাচীর। (সূরা সফ-৪)

আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ ছিলেন কোরআনের এই আয়াতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আকীদা-বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে পূর্ণ ঐকমত্য ছিলো। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক নিষ্ঠা, আস্থা ও ঐকান্তিকতা পূর্ণমাত্রায় ছিলো। নৈতিক চরিত্রের সর্বোন্নত মান তাঁদের সকলের মধ্যে সক্রিয় ছিলো এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি তাঁদের সকলের ঐকান্তিক অনুরাগ ছিলো। এভাবে তাঁরা ছিলেন সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ, ফলে তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে একটি যুগান্তকারী পৃথিবী কাঁপানো ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটানো। তাঁদের ঈমান-আকীদা, ঐক্য ও শক্তির সম্মুখে তাঁদের শত্রুরা প্রত্যক্ষ মোকাবিলায় নাস্তানাবুদ হতে বাধ্য হয়েছিলো। তাঁরা সংখ্যায় মাত্র তিন হাজার হয়েও এক লক্ষ রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। একের পর এক এলাকা বিজয় করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করে মজলুম জনতার মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। শক্তিধর স্বৈরাচারীর তখ্‌তে তাউস ভেঙে খান্ খান্ করে দিয়েছেন। তদানীন্তন দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের শাসকদের গগন চুম্বী অহঙ্কার ভেঙে ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূলের পবিত্র হাতে গড়া মুসলমানদের এই অগ্রযাত্রার কারণে মানবতার দুশমন ইয়াহুদী-নাসারা ও মুশরিকদের নিভু নিভু প্রদীপের শেষ আলোটুকুও নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো এবং তাদের পায়ের নীচের মাটি সরে

www.pathagar.com

গিয়েছিলো। মুসলমানদের অগ্রযাত্রার মধ্যে তারা নিজের মৃত্যুদূত দেখতে পেয়ে অন্ধকার কুঠুরীতে বসে তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিলো। মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর ঘৃণ্য দায়িত্ব অর্পিত হলো আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক জনৈক ইয়াহুদীর প্রতি। এই কুচক্রী লোকটি তার সঙ্গী-সাথীসহ ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের প্রহসন করলো এবং মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সূচনা করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি– এই লোকটি সেসব কথা আল্লাহর রাসূলের নামে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা শুরু করলো। জাল হাদীস রচনা করার মূল হোতাই এই আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক অভিশপ্ত লোকটি।

এরপরের ইতিহাস অত্যন্ত বেদনাদায়ক– মুসলমানদের কলিজায় রক্তক্ষরণের ইতিহাস। জাল হাদীসের সুত্র ধরে মুসলমানদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি হলো। ষড়যন্ত্রকারীরা ইরাকের বসরা, কুফা ও মিসরে ঘাঁটি গেড়ে মুসলিম জাহানের সকল স্থানে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিলো। তাদের ষড়যন্ত্রের কালোহাত ক্রমশ পবিত্র ভূমি মদীনার দিকে অগ্রসর হলো। মক্কা বিজয়ের পরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সান্নিধ্য ও প্রশিক্ষণ দ্বারা তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই উপকৃত হওয়ার সুযোগ খুব কম হয়েছে। এরপরও ছিলো তোলাকা বংশের লোকজন, যারা শেষ পর্যন্ত আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলো। মক্কা বিজয়ের পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো বটে, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে ঈমানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ তাদের ভাগ্যে হয়নি।

রাসূলের ইন্তেকালের পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খিলাফতের সময় মক্কা বিজয়ের পরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং পরবর্তীতে ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। অপরদিকে মুসায়লামাহ্ নামক এক অভিশপ্ত লোক

www.pathagar.com

নিজেকে নবী হিসাবে দাবি করলো। এসব মুরতাদদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হলো এবং মুসায়লামাহ্ কাজ্জাবসহ তার দলের অনেকেই মুসলমানদের হাতে নিহত হলো। অপরদিকে ইয়াহুদীদের আদি আবাস ভূমি ছিলো মদীনা। আল্লাহর রাসূলের সাথে বার বার বিশ্বাঘতকতা করার কারণে মদীনা থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত হতে হয়। এই ইয়াহুদী গোষ্ঠী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাকে গোপনে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিলো। এ ধরনের নানাবিধ বিষে মুসলিম সমাজ আক্রান্ত হয়েছিলো ফলে গোটা মুসলিম জাহান এক তরিৎ গতিতে বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণকারী রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকরা আঁতাত করে মুসলিম সাম্রাজ্যে এক ঘোলাটে পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিলো। অবশেষে সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বিক্ষোরিত হলো হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাহাদাতবরণের মাধ্যমে। বিশ্বাসঘাতকরা এভাবেই মুসলমানদেরকে ধ্বংস গহ্বরের দিকে এগিয়ে নিলো। তৃতীয় খলীফার হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে বিশ্বাসঘাতকরা ষড়যন্ত্র নামক বিষবৃক্ষের গোড়ায় পানি সিঞ্চন করতে থাকলো। পরিণতিতে মুসলমানদের আত্মকলহের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটলো জামাল ও সিফ্ফিন যুদ্ধের মাধ্যমে। ভাই কর্তৃক আরেক ভাইয়ের হাত রক্তে রঞ্জিত করে ছাড়লো ষড়যন্ত্রকারীর দল। মুসলিম জাহানে বিভেদ রেখা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো। ষড়যন্ত্রের আগুনে জ্বলতে থাকলো মুসলিম জাহান। এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও শাহাদাতবরণ করলেন। মুসলমানদের পতনের যে সূচনা ঘটেছিলো, কারবালার লোমহর্ষক– করুণ ঘটনার মধ্য দিয়ে তা যেনো পূর্ণতা লাভ করলো।

এরপর ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের দল ইসলামের দরদী সেজে মুসলমানদের মধ্যে কয়েকটি দল ও উপদলের সূচনা করলো, কোনো কোনো দল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর,

www.pathagar.com

হযরত উসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈনসহ অপরাপর বহু সাহাবায়ে কেরামদের ব্যাপারে মিথ্যাশ্রিত তথ্য ও তত্ত্বের অবতারণা ঘটিয়ে তাঁদেরকে ঐতিহাসিকভাবে কলঙ্কিত করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলো।

এবার সামনে এলো ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস রচনার পালা। কারবালার নিষ্ঠুর নিদারুণ ঘটনার মধ্য দিয়েই ষড়যন্ত্রের যবনিকাপাত ঘটলো না। ষড়যন্ত্রকারীরা আল্লাহর রাসূলের পবিত্র সাহাবায়ে কেরামদের ইতিহাস এমন সুচতুরভাবে কালিমা লিপ্ত করার অপপ্রয়াস গ্রহণ করলো যে, কিয়ামত পর্যন্ত যেনো মুসলিম মিল্লাত সাহাবায়ে কেরামদের ইতিহাস নিয়ে আত্মকলহে লিপ্ত থাকে। মুসলিম মিল্লাত যেসব সম্মানীত ও মর্যাদাবান বুযুর্গ ব্যক্তিদের অনুসরণ করে মহাসত্যের পথে তথা কৃতকার্যতা ও সাফল্যের পথে অগ্রসর হবে, সেসব বুযুর্গ ব্যক্তিদেরকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা করলো।

যারা বদর, ওহুদ, খন্দক, ইয়ারমুক, হুনাইন ইত্যাদী রণক্ষেত্রে পরস্পরে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধিদের সাথে নিজের প্রাণবাজি রেখে একদিন যুদ্ধ করেছিলো, কালের আবর্তনে ষড়যন্ত্রকারীদের কূটকৌশলে তাঁরাই পরস্পরের রক্ত পিপাসু হয়ে উঠলো। যাদের ষড়যন্ত্রে সাহাবায়ে কেরামদের ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ফাটল ধরলো, এক ভাইয়ের হাত অন্য ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হলো, তারাই আবার সাধু সেজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস রচনায় কোমর বেঁধে নেমে পড়লো। ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে মহাসত্যের ধারক-বাহক, মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সিপাহ্সালার, আমানতদার ও বিশ্বস্ত সাহাবায়ে কেরামদের সূর্য-উজ্জ্বল পৃষ্ঠদেশে মসীলিপ্ত করলো। সত্যাশ্রয়ীকে বানালো মিথ্যাশ্রয়ী, আমানতদারকে বানালো খেয়ানতকারী, অহিংসকে বানালো হিংসুক, দয়ালুকে বানালো নিষ্ঠুর, পরস্বার্থ রক্ষাকারীকে বানালো পরস্বার্থ হরণকারী, জাগতিক সহায়-সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতি মোহমুক্ত নির্লোভীকে বানালো ক্ষমতালোভী, সহজ-সরল ও স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারীকে বানালো কূটকৌশলের

www.pathagar.com

অধিকারী ও সোজা পথের পথিককে বানালো বক্র পথের যাত্রী। এভাবে ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতকরা এমন ইতিহাস রচনা করলো, যেনো পৃথিবীর অনাগত মানব মন্ডলী সাহাবায়ে কেরামদের যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে।

আরেক শ্রেণীর ঐতিহাসিক, নবী পরিবারের প্রতি অতিমাত্রায় আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে এমন ইতিহাস রচনা করলো যে, যা হয়ে পড়লো সম্পূর্ণ একপেশে। কেউ আবার আবেগ নির্ভর শব্দ সংযোজন করে ইতিহাস রচনা করে সম্পূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থটিই আবেগ নির্ভর করে তুললো। এভাবে কোনো সাহাবীর প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি, কোনো সাহাবীর প্রতি মনের কোণে বিদ্বেষ লালিত করে এমনভাবে ইতিহাস রচনা করা হলো যে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া পরবর্তী লোকদের জন্য চরম কঠিন হয়ে পড়লো।

বর্তমানে একবিশং শতাব্দীর কয়েকটি ঘটনার দিকে নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ হবে। আমেরিকা আফগানিস্থান ও ইরাকে মুসলমানদের রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে দেশ দুটো দখল করলো। এই দেশ দুটো দখল করার পূর্বে তারা একটি হাস্যকর প্রেক্ষাপট রচনা করে দেশ দুটোর উপরে হামলে পড়লো। কালের আবর্তনে একদিন আফগানিস্থান ও ইরাকের ইতিহাস রচিত হবে। এই দেশ দুটো দখল করার ব্যাপারে আগ্রাসী আমেরিকার সমর্থক যারা– তারা লিখবে, 'এই দেশ দুটোর শাসক গোষ্ঠী ছিলো সন্ত্রাসের সমর্থক। আল কায়েদা নামক সন্ত্রাসী দলকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে আমেরিকার টুইনটাওয়ার ধ্বংস করিয়েছে, বিশেষ করে ইরাকের শাসক ছিলো মানবতা ও গনতন্ত্রের দুশমন। ইরাকের শাসক গোষ্ঠী মানবতা বিধ্বংসী অস্ত্র আবিষ্কার করে পৃথিবীকে বিপন্ন করে তুলেছিলো। এ কারণে মানবতার বন্ধু আমেরিকা তার সমর্থকদের সহযোগিতায় দেশ দুটোয় আক্রমণ করে সন্ত্রাসী দলকে ধ্বংস করে পৃথিবীকে বিপদ মুক্ত করেছে।'

অপরদিকে আমেরিকা-বৃটেন ও ইসরাঈলের ঘৃণ্য কর্মকান্ডের বিরোধিদের মধ্যে যারা আফগানিস্থান ও ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন সম্পর্কে ইতিহাস রচনা করবে– তারা

www.pathagar.com

লিখবে, 'একবিংশ শতাব্দীর জঘণ্যতম স্বৈরাচার, মানবতার দুশমন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ– যে লোকটিই সর্বপ্রথম আমেরিকার ইতিহাসে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে, তিনি অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করে তাদের তেল সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে নিজেরাই আমেরিকার টুইনটাওয়ার ধ্বংস করে মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে স্বাধীন দুটো মুসলিম দেশ আফগানিস্থান ও ইরাকে যুদ্ধের নামে ধ্বংস যজ্ঞ চালিয়ে দেশ দুটো দখল করে পরাধীনতার জিঞ্জির পরিয়ে দিয়েছে।'

উল্লেখিত এই দুই ধরনের ইতিহাস রচনা ব্যতীতও নানাজনে নানা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস রচনা করবে এবং আগামী কয়েক শতাব্দী পরের লোকজন যখন এসব ইতিহাস পড়বে, তখন তাদের পক্ষে প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। এটাই যদি হয় বাস্তবতা এবং প্রকৃত সত্য, তাহলে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের কূটকৌশলের কারণে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিলো এবং পরবর্তীতে ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতকরাসহ নানাজনে এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস রচনা করলো, সেসব ইতিহাস পাঠ করে কি করে একজন সাহাবী সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করা যেতে পারে?

সাহাবায়ে কেরামদের জীবনী রচনা ও তাঁদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যদিও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তারপরেও হাদীস গবেষক ও বিশারদ মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনার সনদমূলক ইতিহাস যাচাই করতে গিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন যে, আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য ও স্পষ্ট যে, পরম সম্মানিত ও মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরাম নবী-রাসূলদের পর সর্বোত্তম সৃষ্ট মাখলুখ ছিলেন– নবী-রাসূলদের পরেই তাঁরা ছিলেন মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। পক্ষান্তরে তাঁরা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উর্ধ্বেও ছিলেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম সাহচর্য, আদর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ার পরও তাঁদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা ও

www.pathagar.com

কৌশলের এ বিষয়ের স্বাভাবিক দাবী ছিলো এবং আল্লাহর রাসূলেরও একান্ত আকাংখা ছিলো যে, তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের জীবন চরিত্র থেকে অন্ততঃ একটি ভুলের চির অবসান হওয়া উচিত, সেই ভুলটি হলো– তাঁর কোনো সাহাবী যেনো ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর ব্যাপারে কোনো মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত না করেন। অন্য কোনো ভুল-ভ্রান্তির প্রভাব তো এক ব্যক্তি অথবা কতিপয় ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।

কিন্তু সাহাবীদের ভুল হাদীস বর্ণনার কারণে ইসলামের গোটা ইমারতই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিলো। এই আশঙ্কা রোধ করা ও অবসানের লক্ষ্যে আল্লাহর রাসূল সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেছেন–

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار –

যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বকভাবে আমার প্রতি মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত করবে; সে যেনো তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (বুখারী-কিতাবুল ইল্‌ম)

দুই শতেরও অধিক সাহাবী আল্লাহর রাসূলের উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এমনকি মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন যে, অন্য কোনো হাদীস এই হাদীসটির বর্ণনার ধারাবাহিকতার সীমায় পৌঁছতে পারেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস বর্ণনা করার সময় অধিকাংশ সাহাবী এই হাদীসটি শুনাতেন এবং সে সময় আল্লাহর ভয়ে তাঁদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো ও দেহ রোমাঞ্চিত হতো। কি জানি, হঠাৎ করে মুখ থেকে যদি কোনো ভুল কথা বের হয়ে যায়, এই ভয়ে অনেক সাহাবী অধিক হাদীস বর্ণনা করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতেন। মুহাদ্দিসগণও এই হাদীসটি অধিক বর্ণনা করতেন এবং অনেকে এই হাদীসটি দিয়েই তাঁদের বর্ণনাধারার সূচনা করতেন। এরপর অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে হাদীস বর্ণনা করার পর বলতেন–

او كما قال النبى صلى الله عليه وسلم–

www.pathagar.com

অথবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছেন।' যেনো অজ্ঞতার কারণে জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হতে না হয়।

এ ব্যাপারে শুধুমাত্র একটি হাদীস নয়- বরং অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বোখারীর কিতুবুল জানায়েয এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থাবলীতে হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

ان كذبًا على ليس ككذب على احد-من كذب على فليتبوأ مقعده من النار-

আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা অন্য কারো সম্পর্কে মিথ্যা বলা সমপর্যায়ের নয়। যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করলো সে যেনো জাহান্নামকেই তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لاتكذبوا على من كذب على فليلج النار-

আমার প্রতি মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত করো না, যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মিথ্যা রটনার আশ্রয় গ্রহণ করবে, তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া অধারিত। (বোখারী-কিতাবুল ইল্‌ম)

কুরাইশে ওয়াসেলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ان من اعظم الفرى ان يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل-

সবথেকে বড় মিথ্যা ও জঘণ্যতম রটনা হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি সে কথা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা। (বোখারী-কিতাবুল মানাকেব)

www.pathagar.com

হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমাদের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ ওসিয়ত ছিলো, যারা আমার হাদীস ভালোবাসবে তাদের সাথে খুব শীঘ্রই তোমাদের পরিচয় ঘটবে। আমি বলিনি এমন কথা যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পৃক্ত করে প্রচার করবে আমার দিকে সম্বোধন করে বলবে তার ঠিকানা অবশ্যই জাহান্নামে।' প্রায় হাদীস গ্রন্থসমূহেই এই বিষয়ের ওপরে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূলের এই ধরনের অসামান্য সতর্কতা ও কঠোর শাস্তিমূলক সতর্কবাণীর কারণে সাহাবায়ে কেরামদের হৃদয় থেকে আল্লাহর রাসূলের বলা কথার সাথে মাত্র একটি অক্ষরও নিজেদের পক্ষ থেকে সম্পৃক্ত করার প্রবণতা এমনভাবে দূরীভূত হয়েছিলো যে, সমগ্র সাহাবীগণের মধ্যে একজন সাহাবীও আল্লাহর নবীর কথার সাথে নিজের পক্ষ থেকে এটি মাত্র কথাও সম্পৃক্ত করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূলের প্রতি মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত করা অপেক্ষা আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আমার জন্য অধিকতর সহজ বিষয়।' (বোখারী)

হযরত ওয়াকী সাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে হযরত আমাশের একটি কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'সাহাবায়ে কেরামদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন ছিলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় ওয়া, আলিফ বা দাল ধরনের একটি অক্ষরও নিজেদের পক্ষ থেকে সংযুক্ত করে দেয়ার থেকে আকাশ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যাওয়াকে তাঁরা প্রাধান্য দিতেন।' যে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা সম্পর্কে ইতিহাসে নানা ধরনের আপত্তিকর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে উল্লেখ করেছেন, 'আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনার মিম্বারে দাঁড়িয়ে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সে হাদীসও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হতো এবং বলা হতো, হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে তাঁকে সামান্যতম অভিযুক্তও করা যায় না।'

www.pathagar.com

এ জন্য মুহাদ্দিসগণ সাহাবায়ে কেরামদের পরবর্তী বর্ণনাকারীদের বর্ণনা যখন বিশ্বস্ত সূত্রে সাহাবায়ে কেরামদের বর্ণনা বলে যথার্থ প্রমাণ পেয়েছেন, তখন সাহাবায়ে কেরামদের বর্ণনা গ্রহণ করতে তাঁরা কোনো সন্দেহে জড়িয়ে পড়েননি। কারণ, গবেষক ও মুহাদ্দিসগণের মতে সাহাবায়ে কেরাম সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। সুতরাং প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মতবিরোধপূর্ণ সকল ইতিহাসের আলোকে সার্বিক বিবেচনায় এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমদের অথবা অন্য কোনো সাহাবীদের ব্যাপারে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয় এবং সে সকল বর্ণনা ত্রুটিমুক্ত নয়। এ ধরনের ইতিহাস কোনোক্রমেই যেমন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং এসব ইতিহাসের ওপর নির্ভর করে সে সকল সম্মানিত সাহাবীদের সম্পর্কে সামান্যতম আপত্তিকর মন্তব্যও করা যেতে পারে না।

কারণ ইতিহাসে দেখা যায়, একই ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে জড়তা, স্থবিরতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের অবতারণা ঘটেছে। আর এ কারণেই ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অসতর্কতা বশতঃ কোনো কোনো উচ্চস্তরের জ্ঞানী-গুণী গবেষক, সমালোচক তথা পন্ডিত ব্যক্তিবর্গও ঐতিহাসিক ভুলের শিকার হয়েছেন। সুতরাং এ কথা স্বীকার করতে মোটেও দ্বিধা করার কারণ থাকতে পারে না যে, এ ধরনের ভুল যারাই করেছেন, তাঁদের ভুলকে শ্রদ্ধার সাথে ভুল বলেই স্বীকার করতে হবে। এ ধরনের ভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ ইতিহাস যখন কোনো পন্ডিত ব্যক্তিদের লেখনী যন্ত্রে ফুটে ওঠে, তখন অন্যান্যদেরকে এ কথা অনুধাবন করতে হবে যে, উক্ত পন্ডিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ লেখনী বা বর্ণনার ক্ষেত্রে তদানীন্তন কালের ঘটনাবলীর ইতিহাসকে সঠিক ইতিহাস বলে বুঝতে গিয়ে ঐতিহাসিক ভুলের স্বীকার হয়েছেন– বিষয়টি এমনও হতে পারে।

পক্ষান্তরে এই ধরনের ঐতিহাসিক ভুল বুঝাবুঝি অথবা ঐতিহাসিক ভুলের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি ঈমানদার হিসাবে হৃদয়ের স্বাভাবিক অদম্য আকর্ষণ জনিত

www.pathagar.com

স্পর্শকাতর প্রশ্নটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সিফ্‌ফিন যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খিলাফত বিভক্ত হওয়া, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক তাঁর সন্তান ইয়াযীদের ক্ষমতারোহণ, কারবালার মর্মস্পর্শী লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হওয়া, ইয়াযীদ কর্তৃক হার্‌রা-এর মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং তার প্রেরিত চার হাজার সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পবিত্র মদীনার অধিবাসীদের ওপর নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা অধিকাংশ মুসলমানদের হৃদয়ের কোমল কোণে স্পর্শ করে হৃদয় জগতকে আলোড়িত করাই স্বাভাবিক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি হৃদয়ের স্বাভাবিক ভালোবাসার প্রশ্নে ইতিহাসের এই স্পর্শকাতর কালো অধ্যায়টিতে উপনীত হয়ে বহু উচ্চস্তরের গবেষক, আলোচক-সমালোচক ও পন্ডিত ব্যক্তিবর্গও তাঁদের আলোচনা-সমালোচনা ও লেখনীতে ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হননি।

আল্লাহর রাসূলের অবর্তমানে ইতিহাসের এই অধ্যায়ে উপনীত হয়ে কোনো একক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাছাড়া এই স্পর্শকাতর ঐতিহাসিক অধ্যায়ে যে সকল উচ্চস্তরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ঐতিহাসিক ভুলের শিকার হয়েছেন– তাঁরা যদিও ভুলের শিকার হয়েছেন, তবুও তাঁদের এই ভুল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসার মতো প্রশংসনীয় ঈমানী বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নবী পরিবারের প্রতিপক্ষের ব্যাপারে আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা ও সমালোচনার ব্যাপারে যতটুকু ভুলের শিকার হয়েছেন, তাঁদের এই ভুলকে কোনো কোনো সাহাবীর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ বা শত্রুতা হিসাবে গণ্য করলে তাঁদের প্রতি মোটেও সুবিচার করা হবে না। বরং তাঁদের ভুলকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নবী পরিবারের সদস্যদের প্রতি ঈমানী ভালোবাসার কারণে 'ভারসাম্যহীনতা' বলে আখ্যায়িত করাই সর্বাধিক বিবেচনার বিষয় বলে পরিগণিত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

আমার উল্লেখিত এই কথাকে কেউ যদি ভুলকে বিশুদ্ধ করার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে ওকালতী হিসাবে গণ্য করেন, তাহলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ এটা হলো মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার ফতোয়াগত একটি সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতির ব্যাপার।

পক্ষান্তরে উল্লেখিত এই মূলনীতিটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রযোজ্য হবে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে– যে ক্ষেত্রে অভক্তি, বিদ্রোহ তথা ইলহাদের অনুপস্থিতির কারণে উল্লেখিত মূলনীতি অবলম্বন করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে মূল বিষয়টিতে যেহেতু উভয়পক্ষে সম্মানিত ও মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরাম যুক্ত রয়েছেন, সুতরাং তাঁদের আলোচনা-সমালোচনা ও পর্যালোচনায় ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করা শুধু নিরাপদই নয়– বরং এটাই হবে ইনসাফপূর্ণ নীতি।

অতএব আল্লাহর রাসূলের সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামদের ব্যাপারে রচিত বিদ্বেষপূর্ণ ও সন্দেহযুক্ত জীবনী ও ইতিহাসকে প্রত্যাখ্যাত বলেই সকলের বিবেচনা করা সর্বাধিক উত্তম এবং এর মধ্যেই মুসলমানদের ঈমানী নিরাপত্তা নিহিত– এর মধ্যেই কোরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততা সুরক্ষিত। আর এই নীতি অবলম্বন করেই আমরা দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করতে সক্ষম হচ্ছি যে, 'আমরা পৃথিবীর জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও কল্যাণকর জীবন বিধান ইসলামী শরীয়াত ও মৃত্যুর পরবর্তী জগতে নাজাতের ব্যবস্থাপত্র নির্ভরশীল ও বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি। এই পথ অবলম্বন করে জীবিত থাকা ও মৃত্যুবরণ করা– উভয়টির মধ্যেই রয়েছে কৃতকার্যতা ও সার্থকতা। এই ধরনের সন্দেহাতীত দৃঢ় বিশ্বাসই আমাদের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং আমাদের ভেতরে আত্মতৃপ্তি যোগায়।'

আমি একটি বিষয় দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করতে চাই যে, কোনো বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামদের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হলে বিশেষ কোনো সাহাবীর প্রতি কটুক্তি, অভক্তি, অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা অথবা উপহাস না করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত মতামতকে গ্রহণ করলেই যে কোনো দলাদলি, মতানৈক্য ও

www.pathagar.com

মতদ্বৈততার অবসান ঘটতে পারে। এ পথ অবলম্বন না করে কোনো বিরোধপূর্ণ কোনো বিষয়কে সামনে অগ্রসর করানোর পন্থা অবলম্বন করার অর্থই হলো, ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের মারাত্মক ক্ষতিকর পন্থাই অবলম্বন করা। মুসলিম মিল্লাতের সলফে-সালেহীন, ওলামা-মাশায়েখ তথা আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআত সাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে এই ধরনের পবিত্র আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারাই পোষণ করতেন। আল ফিক্‌হুল আকবর কিতাবের ১০১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেছেন–

لانذكر احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بخير–

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য থেকে আমরা যাঁর আলোচনাই করবো তাতে উত্তম ও প্রশংসনীয় পন্থাই অবলম্বন করবো।

ইমাম তাহাবী (রাহঃ)-এর আকীদাতুত্তাহাবী নামক কিতাবের ১৩৭ থেকে ১৪০ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে–

ونحن باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولانتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم ونفاق وطغيان–

(সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আমাদের আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পন্থা হলো) আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে ভালোবাসি। তবে তাঁদের মধ্য থেকে কোনো একজন সাহাবীর প্রতি অধিক ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে অন্য কোনো সাহাবী সম্পর্কে শত্রুতা পোষণ করি না। যারা সাহাবীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং তাঁদের ব্যাপারে অশোভন উক্তি করে আমরা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি। আমরা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে উত্তম ও প্রশংসনীয়

www.pathagar.com

আলোচনা করি। (আমরা বিশ্বাস করি) তাঁদেরকে ভালোবাসা দ্বীন, ঈমান ও কল্যাণের পাথেয়। পক্ষান্তরে তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা কুফর, মুনাফেকী ও শরীয়াতের সীমা লংঘনের নামান্তর।

তবে একটি বিষয় সম্পর্কে সকলেরই স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে, বিশেষ কোনো সাহাবীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করা আর কোনো কোনো সাহাবীর ব্যাপারে ঐতিহাসিক ভুলের শিকার হওয়া সমপর্যায়ের বিষয় নয়। যদি কাউকে অভিযুক্ত করতেই হয়, তাহলে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেই অভিযুক্ত করা উচিত। নতুবা এ ব্যাপারে কারো প্রতি অভিযোগ আরোপ করা হলে তার প্রতি অবিচারই করা হবে।

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম–ওলামা-মাশায়েখদের দায়িত্ব

বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বে যারা অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং হচ্ছেন, তারা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্যের জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়া ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শিক প্রভাবে প্রভাবিত। ফলে তারা নামে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিলেও কেউ প্রকাশ্যে আবার কেউ সতর্কতার সাথে ইসলাম বিরোধী মতবাদ-মতাদর্শের অনুসরণ করে যাচ্ছেন। দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থাও অনুরূপ। কেউ ভোগবাদী পূজিবাদী ব্যবস্থা, কেউ বা নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অথবা কেউ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা আবার কেউ পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তাদের অনুসৃত নীতি আদর্শই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ওপরে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

দেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, গবেষক, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সর্বোপরি শাসক গোষ্ঠী ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা কর্তৃক প্রভাবিত হওয়ার কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে কোরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী নীতি-আদর্শ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আইন-কানুন প্রনয়ণে, কল-কারখানা শিল্পাঙ্গনে, শিক্ষাঙ্গনে, কবিতা-সাহিত্যে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, বক্তৃতা ও লেখনীতে প্রায় সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ পূজারী মাত্র গুটি কয়েক লোকজন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে থাকার কারণে ইসলামের বিপরীত পথেই অগ্রসর হতে বাধ্য করছে। এভাবে মুসলমানদের সমাজ ও মুসলিম মানস থেকে তাঁদের প্রাণপ্রিয় আদর্শ ইসলামকে সুকৌশলে অথবা কোথাও আইন প্রয়োগ করে বিদায় করছে, এই অবস্থায় পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর ধারক-বাহক ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামপন্থী লোকজন নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করবে, কেউ খান্‌কায় বসে পীর-মুরিদী কাজে ব্যস্ত থাকবে,

www.pathagar.com

কেউ বা মসজিদ-মাদ্‌রাসার চার দেয়ালের মধ্যে নিজের কর্মকান্ডকে সীমাবদ্ধ রাখবে, আবার কেউ ওয়াজের ময়দানে ওয়াজ করেই নিজের ইতিকর্তব্যের সমাপ্তি ঘটাবে, এটা ইসলাম সমর্থন করে না।

অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহের শাসক গোষ্ঠী ও দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ পাশ্চত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারী। এসব নামধারী মুসলিম নেতৃবৃন্দ মৃত্তিকা-পাথরে নির্মিত মূর্তির পূজা বাহ্যিকভাবে পরিহার করলেও এরা এদের হৃদয়ের কোণে স্বযত্নে এমন এক মূর্তির পূজা করে, যে মূর্তি কোথাও গণতন্ত্রের কোথাও বা রাজতন্ত্রের আবরণে আবৃত। মৃত্তিকা-পাথরে নির্মিত মূর্তি জড়পদার্থ, তাদের কোনো অনুভূতিই নেই। তাদের দেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজিত থাকলেও সেগুলো তারা ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের যে মূর্তি, তা অধিকাংশ মানুষের রায় তথা মতামতকে গ্রহণ করে, অনুসরণ করে এবং আইন হিসাবে দেশের বুকে প্রয়োগ করে। ভোগবাদী গণতন্ত্রের এই মূর্তি সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, সাধুকে চোর, চোরকে সাধু, বৈধকে অবৈধ, অবৈধকে বৈধ বানানোর ক্ষমতাও সংরক্ষণ করে।

পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নামক এই মূর্তির অন্ধ পূজারীদের কাছে স্থায়ী কোনো মূল্যমান নেই– এদের কাছে সত্য আর মিথ্যা, ন্যায় আর অন্যায়ের চিরন্তন কোনো মানদন্ড নেই। এদের মানদন্ড হলো দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের রায় বা মতামত। আবার সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের রায়ের যথাযথ প্রতিফলনের ব্যবস্থাও পাশ্চাত্যের তথাকথিত গণতন্ত্রে যেমন অনুপস্থিত– তেমনি সুক্ষ্ম কারচুপি, অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার আশ্রয় গ্রহণ করে প্রকৃত জনরায়কে ভিন্ন পথে পরিচালিত করার সুযোগ রয়েছে।

দেশের জনসমষ্টির মধ্যে যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ সত্যকে মিথ্যা বলে রায় দেয়, তাহলে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র সত্যকে মিথ্যা বলেই গ্রহণ করতে বাধ্য। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠের রায় বা মতামতের মোকাবেলায় আল্লাহর নাযিল করা কোরআনও বড় সত্য নয়। সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী যে রায় বা মতামত দিলো, সেই

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, নীতি-আদর্শ, রুচিবোধ, মননশীলতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান, ন্যায়-নীতির বিচারবোধ, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার যোগ্যতা কোনোটিই ধর্তব্য নয়। অশিক্ষিত, বিবেক-বুদ্ধি, বিচারবোধ শূন্য, দেশ-সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম জ্ঞান নেই, এমন ধরনের ভোঁতা ও জড় বুদ্ধির অধিকারী সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী একদিকে রায় বা মতামত দিলো, অপরদিকে ইসলামী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ, উন্নত বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাধারা, মননশীলতা, রুচিবোধ, সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি সচেতন দেশ ও সমাজের সংখ্যা লঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আরেকদিকে রায় বা মতামত পেশ করলো, পাশ্চাত্যের এই ভোগবাদী গণতন্ত্র নামক মূর্তি সংখ্যা লঘিষ্ঠের সুচিন্তিত রায়কে পদদলিত করে অবিবেচনা প্রসূত অজ্ঞ জড়বুদ্ধির অধিকারী সংখ্যা গরিষ্ঠের রায়কেই সমাদরে গ্রহণ করলো।

শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা ক্ষেত্র বিশেষে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের মতামতেরও মূল্য দেয় না। সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর বিধান অনুসরণের লক্ষ্যে নির্বাচনে ইসলামপন্থী দলের পক্ষে যদি রায় দেয়, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের সে রায়কে পদদলিত করতে সামান্যতম দ্বিধা করে না। এর প্রমাণ আলজেরিয়া ও তুরস্ক। ১৯৯২ সনে আলজেরিয়ার সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসরণ করার লক্ষ্যে ইসলামপন্থী দলকে নির্বাচনে বিজয়ী করলো। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা অস্ত্রের জোরে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের রায়কে পদদলিত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলো। তুরস্ক ও মিসরের দিকে দৃষ্টি দিলেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হবে। তুরস্কের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ ইসলামপন্থী দলকে নির্বাচনে বিজয়ী করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পাঠায়, কিন্তু পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা নির্বাচনে বিজয়ী দলকে– দলের আদর্শ ইসলামের বিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ দেয় না। এমনকি ইসলামপন্থী দল ও ব্যক্তিত্ব যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে, এ জন্য আইনের মোড়কে

www.pathagar.com

বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে মিসর ও তুরস্কে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা তাদের ভোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারে, এ ধরনের কোনো ব্যবস্থাকে সহ্য করে না।

পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নামক এই মূর্তির কাছে মানুষের মেধা, যোগ্যতা, মননশীলতা, রুচিবোধ, উন্নত চিন্তাধারা, বিচার-বিবেচনাবোধ কোনো কিছুই বিবেচিত বিষয় নয়। বিবেচিত বিষয় শুধু সংখ্যাধিক্য। দেশ ও জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত ব্যক্তির মতামত আর তারই গৃহের অশিক্ষিত বিবেক-বুদ্ধি ও বিচারবোধহীন পরিচারিকার মতামতের একই মূল্য পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নামক মূর্তির কাছে। অর্থাৎ উভয়ের মতামতের একই মূল্য। এই গণতন্ত্র শতকরা ৫১ জন মানুষের মতামত বা রায়ের ভিত্তিতে কোরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করার ক্ষমতা রাখে। পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে এরা চিরন্তন মূলবোধ ও সত্যকে মুহূর্তে কবরস্থ করতে পারে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী এই গণতন্ত্র নামক মূর্তির পূজারীদের কাছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল শক্তির উৎস নয়– দেশের জনগণই সকল ক্ষমতা ও শক্তির উৎস। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

(হে নবী) আপনি যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের অনুসরণ করেন তাহলে আপনি আল্লাহর পথ থেকে (সত্য পথ থেকে) পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন। (সূরা আনআ'ম-১১৬)

মুসলিম উম্মাহ্, দেশ ও জাতির এই অবস্থায় ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামপন্থী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই, বরং তাদের প্রতি রাজনৈতিক ময়দানে উপস্থিত হয়ে ইসলাম বিরোধী বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে হক-এর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার আওয়াজ উত্থাপন করা ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজে যারা নেতৃত্বের আসনে আসীন হবে, তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোরআন-সুন্নাহর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করবে, এটা মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ। এটাই খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত প্রতিষ্ঠিত নীতি। বর্তমানে মুসলিম দেশ ও সমাজে

www.pathagar.com

ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনার অনুসারী লোকদেরই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব নেতৃত্বের আনুগত্য করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَاتُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ–اَلَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ–

আল্লাহর বিধানের প্রতি যারা আনুগত্য করে না) যেসব লাগামহীন লোক পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোনো সংস্কার সাধন করে না, তাদের আনুগত্য করো না। (সূরা শু'আরা-১৫১-১৫২)

মহান আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ, মুসলিম দেশ ও সমাজে ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা ও নীতি-আদর্শের অনুসারী লোকদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নেয়া যাবে না, বরং দেশ ও সমাজে তাদের যাবতীয় কর্তৃত্ব হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অপরদিকে কোরআন-সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী লোকদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, তাদের আনুগত্যের অপরিহার্যতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ–

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং সেসব লোকদেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। (সূরা নিসা-৫৯)

মুসলিম জনগোষ্ঠী কোন্ শ্রেণীর লোকদের আনুগত্য করবে, তাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য কি, এ ব্যাপারে মুসলমানরা যেনো তাদের যোগ্য নেতা নির্বাচনে ভুল না করে, এ

www.pathagar.com

জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের যোগ্য নেতার পরিচয়ও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ–

এরা এমন সব লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে এরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। (সূরা হাজ্জ-৪১)

অর্থাৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর যোগ্য নেতা তারাই, কেবলমাত্র তারাই নেতৃত্বের আসন অলঙ্কৃত করতে পারবে, যারা নেতৃত্বের আসনে আসীন হলে ব্যক্তিগত জীবনে ফাসেকী, দুষ্কৃতি, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার শিকার হওয়ার পরিবর্তে নামাজ কায়েম করবে। দেশের মুসলিম জনতাকে নামাজের দিকে অগ্রসর করাবে। তাদের ধন-সম্পদ বিলাসিতা ও প্রবৃত্তি পূজার পরিবর্তে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যয় করবে। দেশের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে অভাবীদের মধ্যে বন্টন করবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যন্ত্রকে তারা সৎকাজ বিকশিত ও সম্প্রসারিত করার কাজে লাগাবে। আইনের মাধ্যমে তারা অসৎ কাজকে দেশ থেকে বিদূরিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা-সংগ্রাম করবে। মুসলিম জনতার নেতৃবৃন্দ ইসলাম বিরোধী কর্মসমূহের মূলোৎপাটন করার কাজে আত্মনিয়োগ করবে আর ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রসার ঘটাবে।

অথচ বর্তমান বিশ্বের মুসলিম নেতৃত্ব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণার প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত পথেই অগ্রসর হচ্ছে। ইসলাম বিরোধী, অপরাধ প্রবণ, নীতি-নৈতিকতাহীন, পাশ্চাত্যের ক্রীড়নক, পরাশক্তির গোলাম ও দুনিয়া পূজারী নেতৃত্বই মুসলমানদের নেতৃত্বের আসনসমূহ দখল করে রয়েছে। এর অনিবার্য পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। এই ধরনের অপরাধ প্রবণ ও অযোগ্য নেতৃত্বের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সাবধান করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

www.pathagar.com

اذاضيعت الامانة فانتظر الساعة قال كيف اضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة-

যখন আমানতসমূহ বিনষ্ট করা হবে তখন তুমি কিয়ামতের গযব নাযিলের অপেক্ষা করবে। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলো, আমানতসমূহ বিনষ্ট করা হয় কিভাবে? উত্তরে তিনি বললেন, অযোগ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আমানত অর্পন করা আমানত বিনষ্ট করার নামান্তর। সুতরাং যখন অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব অর্পিত হবে, তখন তুমি কিয়ামতের মহাবিপদের অপেক্ষা করো। (বোখারী)

এবার মুসলিম দেশসমূহে বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের মূর্তির পূজা করা হচ্ছে। এই গণতন্ত্রের নামে এমন এক নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে যে, যেখানে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ লোকের মতামতের মূল্যমান সমান। অজ্ঞ ও বিজ্ঞ লোকের মতামতের মূল্যমান সমান হেতু এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে সমাজের অসৎ, অপরাধ প্রবণ ও পরস্বার্থ হরণকারী হিংস্র প্রকৃতির দুষ্কৃতিকারী লোকজন। তারা দেশ ও সমাজ সম্পর্কে অসচেতন, অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বোধহীন অভাবী লোকদের মধ্যে অর্থ বিলি-বন্টন করে নিজেদের পক্ষে রায় ক্রয় করছে। এ পথে নেতৃত্বের আসন লাভ করার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে নানা ধরনের কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করছে। নেতৃত্বের আসন লাভ করার যাবতীয় কূট-কৌশল ব্যর্থ হলে তখন পেশী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে সন্ত্রাসের মাধ্যমে নেতৃত্বের আসন দখল করছে।

এর অনিবার্য বিষময় ফল দেশ ও সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রতিভাত হচ্ছে। অপরাধ প্রবণ, অসৎ ও প্রকৃতির দুষ্কৃতিকারী লোকজন দেশ ও সমাজের নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা, নোংরামী, অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার, খুন-রাহাজানী, হত্যা-ধর্ষন, শোষণ-নির্যাতন, শঠতা-প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও জুলুমের

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি জ্বালা মুখ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সর্বপ্লাবী বন্যার বেগে মুসলিম সমাজে নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ড ছড়িয়ে পড়েছে। কোরআন-সুন্নাহর মূল্যবোধ বিদায় করে দেয়া হয়েছে। নানা কৌশলে কোরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহক ওলামা-মাশায়েখদের প্রতি মুসলিম জন-মানসে অভক্তি আর অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

অপরাধ প্রবণ জালিম নেতৃত্বের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের কারণে মুসলিম জনগোষ্ঠী ঈমানী দুর্বলতার শিকার হয়েছে। ঠিক এই সুযোগে সিংহসম সাহসের অধিকারী মুসলমানদের ঘাড়ের ওপর ইয়াহুদী-নাসারা ও মুশরিক নামক চির ভীরু শৃগালের গোষ্ঠী উদ্বাহু নৃত্য শুরু করেছে। মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা দেখে বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেছেন–

শের কি সার পে বিল্লি খেল রাহি, ক্যায়সা হ্যায় মুসলমাঁ কা বদ নসীব,
শাহাদাত্ কি তামান্না ভুল গ্যায়ি, তাছ্বি কি দাঁনু মেঁ, জান্নাত ঢুঁড্ রাহী।

সিংহের মাথার ওপর আজ বিড়াল খেলা করছে। বড়ই দুর্ভাগ্য মুসলমানদের, তারা শাহাদাতের আকাংখা ভুলে গিয়ে তছ্বিহ্ দানার মধ্যে জান্নাত অনুসন্ধান করছে।

অপরাধ প্রবণ ভোগ-বিলাসে মত্ত নামধারী মুসলিম নেতৃত্ব ও মুসলিম জনতার ঈমানী দুর্বলতার সুযোগে মানবতার দুশমন, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গনতন্ত্রের অনুসারীগণ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের সহাযোগিরা দস্যু-তস্কর এবং নরখাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসন চালিয়ে মুসলমানদের রক্তস্রোত বইয়ে তাদের যাবতীয় সম্পদ লুট করে নিজেদের ভান্ডার পরিপূর্ণ করছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিগতভাবে মানুষকে যে মৌলিক অধিকারসমূহ প্রদান করেছেন, গুটি কয়েক শক্তিমান ও প্রভাবশালী মানুষ তা হরণ করেছে। অধিকারহারা বঞ্চিত মানুষ সর্বত্র শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। ইনসাফ নামক শব্দটিকে কফিন আবৃত করে পেরেক ঠুকে দেয়া হয়েছে। কোথাও ন্যায় বিচার নেই, সর্বত্র মজলুম মানুষের হাহাকার। বঞ্চিত জনতার করুণ আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস বেদনা বিধূর হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচনের মানদন্ড নিরুপণ করতে হবে। একদিকে যেমন নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে হবে, অপরদিকে নেতৃত্বের যোগ্য কোন্ শ্রেণীর মানুষ, সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার ভিত্তিতে নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্তমানে নেতা নির্বাচিত করার বা নির্বাচনে নমিনেশন দেয়ার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, এই পদ্ধতি ইসলাম অনুমোদন করে না। কারণ এই পদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর।

নির্বাচন কালে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলসমূহ যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিকে নমিনেশন প্রদান করে, এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আল্লাহভীরু সৎ মানুষের পক্ষে নির্বাচিত হয়ে নেতৃত্বের পদে আসীন হওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ, যখন নমিনেশন দেয়া হয় তখন প্রার্থী– নির্বাচনে সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম কিনা অথবা যে কোনো প্রকারে বিজয়ী হতে সক্ষম কিনা, সেদিকটিই দলের নীতি-নির্ধারকদের কাছে মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। কারণ, দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার লক্ষ্যে। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক সদস্যকে বিজয়ী করে আনার প্রতিই দলের লক্ষ্য থাকে নিবদ্ধ।

সুতরাং প্রার্থী আল্লাহভীরু-সৎ, চরিত্রবান কিনা, তার অর্থ-সম্পদ বৈধ পথে অর্জিত কিনা, তিনি প্রকৃত অর্থেই জনগণের সেবা করবেন, না নেতৃত্বের পদ দখল করে যে কোনো উপায়ে অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করবেন, অথবা নিজের নাম-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন কিনা, প্রার্থী নিজের এলাকায় সর্বাধিক সৎ ও ভদ্র কিনা, প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধা, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, নীতি-আদর্শ, রুচিবোধ, মননশীলতা ইত্যাদি কোন্ পর্যায়ের, ক্ষমতা লিপ্সু রাজনৈতিক দল এসব দিকে দৃষ্টি দেয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। ফলে অসৎ উপায়ে যারা ধন-সম্পদ অর্জন করেছে এবং পেশীশক্তি প্রয়োগ করে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে, এই শ্রেণীর অসৎ লোকগুলোর জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের আসন দখল করার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

সুতরাং এই পদ্ধতি পরিহার করে রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐসব লোককেই স্ব-স্ব এলাকায় নমিনেশন দিতে হবে, যে লোক আল্লাহভীরু, সৎ-চরিত্রবান। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের আসন দখল করার অর্থই হলো, তিনি জনগণের সেবা করতে চান। জনগণের সেবা করা সর্বাধিক দায়িত্বপূর্ণ, কষ্ট, ত্যাগ ও পরিশ্রমের কাজ। তদুপরি এই কঠিন কাজের পেছনে অর্থাৎ জনগণের সেবা করার পেছনে নগদ স্বার্থ জড়িত থাকবে না, এই কাজ হতে হবে নিঃস্বার্থ। আর সাধারণত মানুষের স্বভাব হলো, যে কাজ অত্যন্ত কঠিন, দায়িত্বপূর্ণ, কষ্টের-পরিশ্রমের ও ত্যাগের এবং যে কাজে নগদ প্রাপ্তি নেই, সে কাজ থেকে নিজেকে স্বযত্নে দূরে রেখে অন্যের ওপরে তা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত রাখতে চায়।

তাহলে যারা জনগণের সেবা করার নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের আসন দখল করার উদ্দেশ্যে দলের পক্ষ থেকে নমিনেশন লাভের জন্য রীতি মতো প্রতিযোগিতা করে, নমিনেশন লাভের পথ কন্টক মুক্ত করার জন্য প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হলে হত্যা করাতেও দ্বিধা করে না, দলের পক্ষ থেকে নমিনেশন লাভে ব্যর্থ হলে দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, অঢেল অর্থ ব্যয় করা সহ যে কোনো উপায়ে নেতৃত্বের আসন দখলে মরিয়া হয়ে ওঠে। জনগণের সেবা করা ও নেতৃত্ব দেয়ার এই চরম কঠিন, দায়িত্বপূর্ণ, কষ্টের, ত্যাগের ও পরিশ্রমের কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেয়ার পেছনে তাদের নিশ্চয়ই সৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না– এ বিষয়টি অনুধাবন করা কঠিন কিছু নয়।

ঠিক এ কারণেই নেতৃত্বের পদ চেয়ে নেয়া বা এই পদের ব্যাপারে অভিলাষ পোষন করার ক্ষেত্রে ইসলাম অনুমতি দেয়নি। হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, দুই জন লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলো এবং তাঁদের একজন আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ আপনাকে যে বিরাট দায়িত্ব-ক্ষমতা দান করেছেন তার কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে আমাকে নিযুক্ত করুন। অন্যজনও অনুরূপ প্রার্থনা জানালো। তাঁদের কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট

www.pathagar.com

জানিয়ে দিলেন– আল্লাহর শপথ, আমি এই কাজে এমন কাউকেও নিযুক্ত করবো না, যে এর জন্য প্রার্থনা করে এবং তা পাবার জন্য লোভ পোষন করে। (মুসলিম)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– নেতৃত্বের পদ লাভের জন্য আগ্রহ পোষণ করো না। কারণ এই পদ যদি তুমি প্রার্থনা করে লাভ করো, তাহলে তোমাকে এই পদের কাছে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর নেতৃত্বের পদ যদি প্রার্থনা ব্যতীতই পাওয়া যায়, তাহলে (সেখানে দায়িত্ব পালনের জন্য অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে) তোমাকে সাহায্য করা হবে। (বোখারী, মুসলিম)

সুতরাং নেতৃত্বের পদ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ, এটা এমন কঠিন দায়িত্ব যে– কোনো বুদ্ধিমান মানুষই এই পদের জন্য আগ্রহী হতে পারে না বা তা লাভ করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে পারে না। এরপরও যদি কোনো ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে নেতৃত্বের পদ লাভ করতে আগ্রহী হয়, তাহলে বুঝতে হবে, সে নেতৃত্বের পদের গুরুত্ব, তীব্রতা ও কঠোরতা অনুধাবন করতে পারেনি– অথবা সব কিছু জেনে বুঝে নিছক স্বার্থ ও ক্ষমতার লোভ-লালসার কারণেই সে নেতৃত্বের পদ লাভের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এই ধরনের কোন ব্যক্তি নেতৃত্বের পদ পাওয়ার যোগ্য নয় এবং যে ব্যক্তি নেতৃত্বের পদ লাভের জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে, তাকে এমন সুযোগ দেয়াও ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

পক্ষান্তরে নেতৃত্বের পদ লাভের আগ্রহ, চেষ্টা-সাধনা ব্যতীতই যার ওপরে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পণ করা হয়েছে, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে রহমত ও সাহায্য নাযিল হবে। কারণ এই নেতৃত্বের পদ সে নিজে প্রার্থনা বা চেষ্টা করে লাভ করেনি, এ জন্য তার আগ্রহও ছিলো না। আগ্রহ, চেষ্টা-সাধনা ও প্রার্থনা ব্যতীতই আল্লাহর মঞ্জুরীক্রমে জনগণের পক্ষ থেকে তার ওপর অর্পিত হয়েছে। এ জন্য এই দায়িত্ব পালনে সে আল্লাহর রহমত ও জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করতে পারবে।

www.pathagar.com

এ জন্য নির্বাচনে নমিনেশন দেয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহকে আল্লাহভীরু সৎ লোক বাছাই করে নমিনেশন দিতে হবে। রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রত্যেক এলাকায় অনুসন্ধান করে দেখবেন, সে এলাকায় কোন্ ব্যক্তি সবথেকে বেশী আল্লাহকে ভয় করেন, সৎ-চরিত্রবান, উত্তম জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী, মেধাবী, নিঃস্বার্থ, ত্যাগী, দক্ষ-যোগ্য, জনপ্রিয় ইত্যাদি গুণ-বৈশিষ্টের অধিকারী, তাকেই নির্বাচনে নমিনেশন দিতে হবে। অপরদিকে জনগণের মধ্যেও এই অনুভূতি শানিত করতে হবে যে, ভোট একটি আমানত। এই আমানত সম্পর্কে আদালতে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ জন্য এই আমানতের খেয়ানত তথা অপব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ এমন কোনো ব্যক্তিকে ভোট দেয়া যাবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে না, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, অসৎ-অযোগ্য। হতে পারে সে ব্যক্তি নিজের পিতা, ভাই বা কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সে ব্যক্তি যদি আল্লাহর বিধান অনুসরণে নিষ্ঠাবান না হয়, অসৎ-অযোগ্য হয় তাহলে তাকে ভোট দেয়া যাবে না– এ ব্যাপারে জনগণকে সজাগ করতে হবে। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে আল্লাহভীরু, সৎ-চরিত্রবান, দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব লাভ করার সুযোগ জাতি লাভ করবে এবং সমাজ ও দেশ থেকে যাবতীয় অনাচার দূরিভূত হবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমানত বিনষ্ট করা সম্পর্কে যে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা বর্তমানে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁরা রাসূলের বিধান এবং সাহাবায়ে কেরামদের অনুসৃত নীতি-আদর্শ প্রত্যেক পদে লংঘন ও অপমানিত করার এক নিষ্ঠুর রীতি মুসলিম সমাজের উচ্চপর্যায় থেকে চালু করা হয়েছে। ফলে সমাজে অশান্তি, অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। এই অবস্থায় মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্ব ও স্বকীয় আদর্শ রক্ষার স্বার্থেই মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজকে ইসলাম বিরোধী নীতি-পদ্ধতি ও আদর্শ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং এই দায়িত্ব পালন করতে হবে তাদেরকেই, যারা কোরআনের ধারক ও বাহক তথা আলিম-ওলামা, মাশায়েখ এবং ইসলামী চিন্তবিদদেরকে। অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এটাই

www.pathagar.com

হলো আল্লাহর রাসূল ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত নীতি-আদর্শ। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدين–

তোমরা আমার আদর্শ ও হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে অনুসরণ করে চলবে।' ইসলামী নেতৃত্ব তথা আল্লাহভীরু নেতৃত্ব ব্যতীত রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধান সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। ঠিক এই কারণেই কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

ان اكرمكم عند الله اتقا كم –

তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে ব্যক্তি আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে।

কোরআনে ঘোষিত এই মূলনীতি অনুসারে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে রাজনীতির ময়দানে তৎপর হওয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর 'ফিক্‌হে আকবর' নামক কিতাবে– আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রাহঃ) হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, আহ্‌লে হাদীসসহ বিশ্বের মুসলমানদের সর্বশ্রেণীর জ্ঞানী-গুণী, আলোচক-গবেষক ও চিন্তাবিদদের ঐকমত্যে গৃহিত সিদ্ধান্তটি উল্লেখপূর্বক লিখেছেন–রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সমাজে বসবাসকারী লোকদের ওপর ওয়াজিব।

কোরআন ও সুন্নাহর উল্লেখিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে এই বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম সমাজে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী শরীআতের আইন-কানুন চালু করার উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে রাজীনিত করা ওয়াজিব। কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক এই রাজনীতির প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা প্রদর্শন করা, ইচ্ছাকৃতভাবে এর প্রতি অমনোযোগী থাকা বা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা অথবা এই রাজনীতির প্রতি বিরোধিতা করা কোরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতেই জঘন্য অপরাধ।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা প্রশংসিত যোগ্যতার অধিকারী কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে দুর্বল বা এই ময়দানে সক্রিয় হবার যোগ্যতা রাখেন না অথবা অন্য কোনো প্রকারের গ্রহণযোগ্য অপরগতার কারণে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় হতে পারেন না কিন্তু ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার রাজনীতির বিরোধিতাও করেন না– বরং মনে-প্রাণে এই রাজনীতিকে সমর্থন করেন এবং সাম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেন, ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে তারা অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবেন না।

কিন্তু অগ্রহণযোগ্য তথা ঠুনকো অজুহাতে কেউ যদি কোরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার রাজনীতি থেকে নিষ্ক্রিয় থাকেন, এই ময়দান থেকে সরে দাঁড়ান অথবা জাগতিক কোনো স্বার্থ, ভয়-ভীতি বা ক্ষতির কারণে সক্রিয় না হন, তাহলে মুসলিম মিল্লাতই বিপর্যয়ের সম্মুখিন হতে বাধ্য। এ জন্য শরীআতের আইন-কানুন প্রতিষ্ঠার অসীম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে জ্ঞানী-গুণী আলিম-ওলামা মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে নিজেদের সমর্থক এবং কর্মীদেরকে সাথে নিয়ে সুচিন্তিত ফলপ্রসূ কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃহত্তর ইসলামী রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় তৎপরতা পরিচালিত করতেই হবে। তাদের এই মহান কাজে দেশের সাধারণ মুসলিম জনগণ ইসলামী নেতৃত্বকে সার্বিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবেন আর এটাই মুসলমানদের কাছে কোরআন ও সুন্নাহর দাবি।

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, নেতৃত্বের পরিবর্তন, সৎ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর বিধান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোরআন-সুন্নাহ্ নির্দেশিত নিয়মতান্ত্রিক পথেই অগ্রসর হতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো ধরনের অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা, অস্বচ্ছ কার্যক্রম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনভাবে বা কোনো প্রকারে সন্ত্রাসের আশ্রয়ও গ্রহণ করা যাবে না। এমন কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করা যাবে না, যে কারণে বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে। মানুষকে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান জানাতে হবে, তাদের ভেতরে কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসরণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে এবং এই অনুভূতি তাদের ভেতরে শানিত

www.pathagar.com

করতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত না করলে এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশ ও সমাজে কাংখিত শান্তি লাভ করা যাবে না।

এই অনুভূতি সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করে ত্রুটি মুক্ত স্বচ্ছ নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলে অবশ্য অবশ্যই দেশ ও সমাজে কোরআন-সুন্নাহর বিধান কায়েম করা যাবে এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহভীরু নেতৃত্বও প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যেই আলিম-ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনে অবহেলার পরিচয় দিলে আদালতে আখিরাতে গ্রেফতার হয়ে আযাবের সম্মুখিন হতে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

আমি কিভাবে জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আকৃষ্ট হলাম

শৈশবে আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা এবং চাচা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমার শিক্ষা জীবনের সূচনা হলো। এরপর সারসিনা দারুস্ সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসা ও খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করলাম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, আধুনিক বিশ্বের ধর্মহীন পূজিবাদী অর্থনীতি, নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও বস্তুবাদী জীবন দর্শন ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মোকাবেলায় কোরআন-সুন্নাহ্ কোন্ নীতিমালা পেশ করেছে, তা জানার সুযোগ পেলাম না। শুধু তাই নয়– ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের রূপরেখা সম্পর্কেও জানার সুযোগ হলো না। সেই সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসও জানতে পারলাম না। ভারতের দেওবন্দসহ উপমহাদেশে যতগুলো দরসে নেজামী মাদ্‌রাসা রয়েছে, এসব মাদ্‌রাসার পাঠ্য তালিকায় ইসলামের ইতিহাস নেই। তবে কোনো কোনো মাদ্‌রাসায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পাঠ্য তালিকাভুক্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে উক্ত জীবনী গ্রন্থ পাঠ করে ইসলাম একটি বিপ্লবী মতাদর্শ এবং রাসূল ছিলেন সেই বিপ্লবী মতদর্শ ভিত্তিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, তা অনুভব করা যায় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল প্রেরণ ও পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করার যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন তা হচ্ছে–

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ-وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-

তিনিই (মহান আল্লাহ) যিনি (তোমাদের কাছে) সুস্পষ্ট হেদায়াত ও সঠিক জীবন বিধান সহকারে তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন, যেন সে এই জীবন ব্যবস্থাকে (দুনিয়ার) সব কয়টি বিধানের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারে। মুশরিকদের কাছে (এই বিজয়) যতো দুঃসহই হোক না কেন! (সূরা আত্ তওবা-৩৩)

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ-وَلَوْكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا-

www.pathagar.com

তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্ত্বা, যিনি তার রাসূলকে (যথার্থ) পথ-নির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে আল্লাহর রাসূল (দুনিয়ার) অন্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করে দিতে পারে, (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। (সূরা আল ফাতাহ্-২৮)

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ-وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-

তিনি তাঁর রাসূলকে একটি স্পষ্ট পথ নির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন সে (রাসূল) একে দুনিয়ায় (প্রচলিত) সব কয়টি মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারে, তা মুশরিকদের কাছে যতোই অপছন্দনীয় হোক না কেন! (সূরা আস্ সফ-৯)

উক্ত জীবনী গ্রন্থ পাঠ করে মহান আল্লাহর ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক অবস্থানে উপনীত হওয়া যায় না। পরবর্তীতে ১৯৬২ সনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দীর্ঘ কয়েক বছর ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, মনোবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন মতবাদ-মতাদর্শ ও ভাষা সম্পর্কে লেখাপড়া করার সুযোগ করে দিলেন– আল হাম্দু লিল্লাহ। মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত বিখ্যাত মণীষীদের লেখা গ্রন্থাবলী পাঠ করার পর ইসলামের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে যেমন জানার সুযোগ হলো, তেমনি মুসলিম হিসেবে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করলাম। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জান্-মাল দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা-সাধনা করা মুসলমানদের প্রধান দায়িত্ব এবং এই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক নীতিমালার ভিত্তিতে।

কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেসব দল ও সংগঠন তৎপর রয়েছে এবং যেসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব অবস্থানে থেকে এই মহান কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের সকলের প্রতিই আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি এবং তাঁদের কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করি। পক্ষান্তরে নবী করীম

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রক্রিয়ায় মানুষের মন-মস্তিষ্কে তথা চিন্তার রাজ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করে ব্যক্তি গঠনের মাধ্যমে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তি সাধন করেছিলেন, সেই প্রক্রিয়া-পদ্ধতি পরিপূর্ণরূপে প্রয়োগ করে এদেশে তৎপর রয়েছে, এমন সংগঠনের অস্তিত্ব একমাত্র 'জামায়াতে ইসলামী' ব্যতীত দ্বিতীয় আরেকটি রয়েছে বলে আমার জানা নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই হলেন মানব জাতির একমাত্র রব ও আদেশদাতা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আদর্শ নেতা। কোরআন-সুন্নাহই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সাহাবায়ে কেরামই নবীর আনুগত্যের একমাত্র আদর্শ নমুনা। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করাই মুসলিম জীবনের একমাত্র পরম উদ্দেশ্য এবং এ পথই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র পথ। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আখিরাতের মুক্তিই একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য।

উল্লেখিত বিষয়সমূহ জামায়াতে ইসলামীর বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাস এবং এ বিষয়সমূহ শুধুমাত্র দলীয় গঠনতন্ত্রে ও মেনিফেষ্টোতেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। এই আকীদা-বিশ্বাস বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করা হচ্ছে এবং বাস্তব ভিত্তিক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ময়দানে যতটুকু সক্রিয়তা প্রদর্শন প্রয়োজন, ততটুকুই করা হচ্ছে এবং এ কারণেই অনেকে জামায়াতে ইসলামীকে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দল নয়। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধুমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসরণ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মানব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁকে একমাত্র আদর্শ হিসেবে অনুসরণ না করা মুনাফেকীর পরিচায়ক এবং এই অধিকার ইসলাম দেয়নি। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে একমাত্র আদেশদাতা মানতে হবে, অনুরূপভাবে তাঁর রাসূলকেও

www.pathagar.com

জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আদর্শ নেতা হিসেবে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম যে মহান আদর্শ স্থাপন করেছেন, সেটাই জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ।

জামায়াতে ইসলামী প্রচলিত অর্থে শুধুমাত্র কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দল নয়। অথবা কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও নয়। কোরআন-সুন্নাহর বিধান তথা ইসলাম যেমন মানুষের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত, অনুরূপভাবে জামায়াতে ইসলামীও ব্যাপক। কোরআন-সুন্নাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিধানে ধর্মীয় জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় এটা একটি ধর্মীয় দল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَيَزِعُ بِالسُّلْطٰنِ مَالاَ يَزِعُ بِالْقُرْاٰنِ–

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে এমন অনেক কাজই সম্পন্ন করেন, যা কোরআন দ্বারা তিনি করান না।

অর্থাৎ মহান আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার জন্যে কোরআনের সাথে সাথে রাষ্টশক্তি অপরিহার্য। কোরআনকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে প্রয়োগ না করলে কোরআন আপন শক্তির বলে মানব সমাজে কার্যকর হতে পারবে না। রাসূলকে প্রেরণ করার ও কোরআন অবতীর্ণ করার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা সূরা তওবার ৩৩ নং আয়াত, সূরা ফাতাহ্-এর ২৮ নং আয়াত ও সূরা সফ্-এর ৯ নং আয়াতের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করতে গেলে আল্লাহ বিরোধী শক্তি জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করবে, এ কথাও আমরা উক্ত আয়াতসমূহ অধ্যয়নে জানতে পেরেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবতীয় বাতিল আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা চূর্ণ করে আল্লাহর বিধানকে কায়েম করার ও এই বিধানের ভিত্তিতে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রাম করেছেন, আর এই বিষয়টি ছিল আল্লাহ বিরোধী বাতল শক্তির কাছে অসহনীয়। দ্বীন কায়েমের আহ্বান ও সংগ্রাম তাদের পক্ষে সহ্য করা এ জন্য অসহনীয় ছিল যে, এর ফলে মানুষের জীবন থেকে আরেক মানুষের

www.pathagar.com

দাসত্ব বা গোলামী তথা শির্কের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে যাবে। আর এই শির্ক নামক জঞ্জালের অস্তিত্বই যদি না থাকে তাহলে যারা প্রভুত্বের দাবি করে, তাদের অস্তিত্বও নিঃশেষ হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দ্বীনকে শুধুমাত্র প্রচার করার নির্দেশ কোরআনে দেননি, কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর দ্বীন কায়েমের অর্থ হলো, মানুষের মন, জীবন, আকীদা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পলিসি ও ব্যবস্থাকে দ্বীনের ভিত্তিতে গড়ে তোলা এবং আল্লাহর বিধানকে বাস্তবভাবে জারী ও প্রয়োগ করা. তারই ভিত্তিতে শাসন, বিচার, শিক্ষা-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পূর্ণমাত্রায় রূপায়িত করা। এই দায়িত্ব জামায়াতে ইসলামী পালন করছে বলেই এই সংগঠন রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত হয়েছে বা এই অর্থে এটা একটি রাজনৈতিক দল। ইসলাম সমাজ সেবা ও সামাজিক সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে এবং জামায়াত এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বিধায় এটা একটি সমাজ সংস্কারক দল। যতগুলো ক্ষেত্রে মানব জীবন বিস্তৃত তার সকল ক্ষেত্রেই অনুসরণ করার লক্ষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পথনির্দেশনা দান করেছেন এবং এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী তৎপর রয়েছে বিধায় এই সংগঠন একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন।

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, মহান ইসলাম পৃথিবীর অন্য কোনো মতবাদ-মতাদর্শ বা আইন-কানুন ও বিধানের অধীনে কোনো প্রকারে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে আসেনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে যত মতবাদ-মতাদর্শ, আইন-কানুন ও বিধান রয়েছে, এসব কিছুর ওপরে ইসলাম বিজয়ী হবার জন্যই এসেছে। অন্যান্য মতবাদ-মতাদর্শের বিধি-ব্যবস্থা যতটুকু ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল কেবলমাত্র ততটুকুই টিকে থাকবে। বর্তমান বিশ্বে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। মানব রচিত মতবাদ-মতাদর্শ ইসলামের যে সকল বিধি-বিধান সচল রাখার অনুমতি দিয়েছে, ততটুকুই সচল রয়েছে– অবশিষ্ট ব্যাপক বিধি-বিধান মসজিদ-মাদ্‌রাসার চার দেয়ালে বন্দী রয়েছে। এই অবস্থায় যারা সন্তুষ্ট রয়েছেন, তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে

www.pathagar.com

সঠিক ধারণা পোষণ করেন না অথবা পার্থিব স্বার্থের কারণে নীরবতা পালন করে যাচ্ছেন। বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইসলাম বাস্তবে ততটুকুই টিকে রয়েছে, যতটুকু সরকারী কর্তৃপক্ষ ও সমাজ ব্যবস্থা অনুমতি প্রদান করেছে। ইসলাম তার প্রকৃত রূপ নিয়ে পৃথিবীর কোনো একটি দেশেও বাস্তবে চালু নেই– যেটুকু চালু রয়েছে তা পূর্ণরূপের খন্ডিত অংশ মাত্র।

দ্বীনি খেদমত ও দ্বীনি আন্দোলন

সৃষ্টির সূচনা থেকেই মানব সমাজ বিধি-বিধান শূন্য ছিল না। কোনো না কোনো বিধি-বিধান মানব সমাজে চালু ছিল। প্রত্যেক নবী-রাসূল যখন যে সমাজে আগমন করেছেন, তখন যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব ও নবী-রাসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুনভাবে গঠনের লক্ষ্যে যে আহ্বান জানানো হয়েছে, কায়েমী স্বার্থ স্বাভাবিকভাবেই তা সহ্য করেনি। সমাজে যে বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা যাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে, তারা প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন চায় না। যাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্তনের আহ্বান জানায় বা চেষ্টা-সাধনা করে, তাদের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত সোলাইমান (আঃ)– এই তিনজন ব্যতীত অন্যান্য নবী-রাসূল যখনই সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন, তখনই কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী প্রবলভাবে বাধার সৃষ্টি করেছে। কোথাও নবী-রাসূলদের হত্যা করা হয়েছে, কোথাও তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, কোথাও তাঁদেরকে বন্দী করা হয়েছে অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। উক্ত তিনজন নবী-রাসূল উল্লেখ যোগ্য বিরোধিতার সম্মুখিন হননি।

কারণ হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে বিরোধিতা করার মতো মানুষ সে সময় ছিল না। হযরত নূহ (আঃ)-এর সাথেও বিরোধিতা করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে

www.pathagar.com

ভয়ঙ্কর বন্যায় সমস্ত কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আর হযরত সোলাইমান (আঃ) যেহেতু তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করেছিলেন বিধায় কোনো ধরনের বাধার সম্মুখিন হননি।

নবী-রাসূলগণ যদি শুধুমাত্র দ্বীনি খেদমতের কথা তথা নামায-রোযা পালন ও সত্য কথা বলার উপদেশ দিতেন, চুরি-ডাকাতি, জিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি গর্হিত কর্মকান্ড না করার উপদেশ দিতেন তাহলে তাঁদের সাথে কখনই কারো সম্পর্কের অবনতি ঘটতো না। কিন্তু তাঁরা যখন মহান আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে সমাজকে নতুনভাবে গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহর বিধান সমাজ ও দেশে জারী করার লক্ষ্যে দ্বীনি আন্দোলন করেছেন তখনই তাঁদের সাথে সংঘর্ষের সূচনা হয়েছে। আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যে ইসলামী আন্দোলন চলছে, কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী তা সহ্য করছে না। অর্থাৎ দ্বীনি আন্দোলনকে তারা নিজেদের জন্য বিপজ্জনক মনে করছে এবং এ কারণেই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

পক্ষান্তরে আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খান্‌কাহ্, তাবলিগ ও ওয়াজ ও তাফসীর মাহফিলের মাধ্যমে দ্বীনের যথেষ্ট খেদমত হচ্ছে। দেশে ইসলামী সরকার নেই, অথচ এসব খেদমতে বাধা দেয়া হচ্ছে না। এমনকি অমুসলিম দেশেও এসব খেদমতে বাধার সৃষ্টি করা হয় না বরং ক্ষেত্র বিশেষে সহযোগিতা করা হয়। এর কারণ হলো, দ্বীনের এসব খেদমতের কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থে তেমন কোনো আঘাত লাগে না। এসব খেদমতের কারণে দ্বীনের যত বড় খেদমতই হোক না কেনো, এই খেদমতে ইসলাম বিরোধী শক্তি আতঙ্কিত হয় না। কেননা, এই খেদমতের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

বর্তমানে দ্বীনদার ও পরহেজগার লোকদের মধ্যে আমল শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। নামাজ আদায় শেষে কিছু অযিফা, যিকর ও তাস্‌বীহ তিলাওয়াতকে আমল নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আরবী আমল শব্দের অর্থ হলো কাজ। আর ইসলামী পরিভাষায় আমল বলতে বুঝায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন করা এবং নিষেধ থেকে দূরে

www.pathagar.com

অবস্থান করা। অথচ এই আমল শব্দটিকে শুধুমাত্র অযিফা-তাস্‌বীহ তিলাওয়াত ও নফল নামাজ আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর দাসত্ব করার লক্ষ্যে এবং তাদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহর যমীনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করবে, আর এটাই হলো সবথেকে বড় আমল। এই মহাদায়িত্বপূর্ণ কাজটিকে আমল হিসেবে পরিত্যাগ করে এমন ক্ষুদ্র কতিপয় বিষয়কে আমল হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কোরআন-সুন্নাহ্‌য় যার উল্লেখ যোগ্য গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

একটি কারখানায় সব ধরনের পণ্য উৎপাদন হয় না। যে কারখানা যে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে, সেই কারখানায় তাই উৎপাদন হবে। সাবানের কারখানায় স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত হবে না আবার পাটজাত দ্রব্যের কারখানায় স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত হবে না। প্রচলিত মাদ্‌রাসা সিলেবাস, খানকার তালকীন ও তাবলীগ জামায়াতের চিল্লায় নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে অনেক ভালো গুণের সমাহার ঘটে। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ও দ্বীনি আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় ঈমানী শক্তি, জ্ঞানের যোগ্যতা এবং আমলের দৃঢ়তা সৃষ্টি হয় না। কারণ এ ধরনের যোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কোনো পরিকল্পনা সেখানে অনুপস্থিত। ঠিক এই কারণেই ইসলাম বিরোধী শক্তি প্রচলিত মাদ্‌রাসা, খান্‌কাহ ও তাবলিগ জামায়াতকে তাদের জন্য হুমকি মনে করে না। জামায়াতে ইসলামী দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে ময়দানে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই বাতিল শক্তি জামায়াতের নাম শুনলে আতঙ্কিত হয়।

দ্বীনি খেদমতের লক্ষ্যে কোনো স্থানে যদি লক্ষ লক্ষ মানুষও সমাবেশ করে, সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তি সে সমাবেশে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু সমাজ ও দেশে আল্লাহর বিধান জারী করার লক্ষ্যে দ্বীনি আন্দোলনে নিয়োজিত কিছু লোকও যদি সমাবেশ করে এবং আল্লাহর বিধান জানা ও জারী করার লক্ষ্যে যদি কোরআনের মাহফিলের আয়োজন করা হয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী তা সহ্য করে না। কারণ এই দ্বীনি আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা

www.pathagar.com

পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী দ্বীনি খেদমত ও দ্বীনি আন্দোলনকে কখনো একদৃষ্টিতে দেখেনি এবং এটা দেখা তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। কোনো একজন নবী-রাসূলও শুধুমাত্র দ্বীনের খেদমতেই নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেননি। দ্বীনি খেদমতের পাশাপাশি তাঁরা নতুন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে দ্বীনি আন্দোলন করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নবী আগমনের ধারা শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে দ্বীনি আন্দোলনের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলমানদের ওপরে। জামায়াতে ইসলামী মুসলমানদের একতাবদ্ধ করে ঐ দায়িত্বই আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিধানের যে বাস্তব নমুনা প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন, জামায়াতে ইসলামীও সেই আদর্শের ভিত্তিতেই সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে তৎপর রয়েছে। এই সংগঠন অভিনব নতুন কোনো দাওয়াত দিচ্ছে না, প্রত্যেক নবী-রাসূল যে কালেমায়ে তাইয়্যেবার দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, জামায়াতে ইসলামীও সেই একই কালেমার দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। কালেমায়ে তাইয়্যেবার সহজ-সরল অর্থ হলো, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো ইলাহ বা আদেশদাতা নেই এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর রাসূল বা তাঁর পক্ষ থেকে বাণীবাহক।'

এই কালেমার প্রতি যখন কোনো একজন মানুষ ঈমান আনে, তখন এই কালেমা দাবি করে যে, অন্য যে কোনো প্রকার দাসত্ব ত্যাগ করে একমাত্র মহান আল্লাহকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে মনিব হিসেবে মানতে হবে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মহান আল্লাহর দাসত্ব করার নমুনা দেখিয়ে গিয়েছেন, অনুরূপভাবে দাসত্ব করতে হবে। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে মহান আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করেছেন, সেই একই পদ্ধতিতে আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য করতে হবে। কালেমায়ে তাইয়্যেবার এই কথাগুলো জামায়াতে ইসলামী তিনটি দফার মাধ্যমে এভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে–

www.pathagar.com

(ক) দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালাকে একমাত্র ইলাহ্ (আদেশদাতা) ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে নিন।

(খ) আপনি সত্যিই মুসলিম হবার দাবিদার হলে আপনার বাস্তব জীবন থেকে ইসলামের বিপরীত চিন্তা, কাজ ও অভ্যাস দূর করুন এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কারো আনুগত্য না করার সিদ্ধান্ত নিন।

(গ) এ দুটো নীতি অনুযায়ী খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবন-যাপন করতে চাইলে জামায়াতবদ্ধ হয়ে অসৎ ও আল্লাহ বিমুখ লোকদের নেতৃত্ব খতম করুন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে ঈমানদার, আল্লাহভীরু ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব কায়েম করুন।

জামায়াতে ইসলামী মানুষকে কালেমায়ে তাইয়্যেবার এই দাওয়াত দিয়ে থাকে এবং যারা এ দাওয়াত কবুল করে, তাদেরকে সংগঠনের পতাকা তলে সমবেত করে আল্লাহর বিধান অনুসরণের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। দ্বীনি আন্দোলনের মহান দায়িত্ব একাকী পালন করা কোনো একজন নবী-রাসূলের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তাঁদের আহ্বানে যেসব মহান ব্যক্তি সাড়া দিয়েছেন, নবী-রাসূলগণ তাঁদেরকে সংঘবদ্ধ করেছেন এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে দ্বীনি আন্দোলন জারী রেখেছেন। যে সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে একাকী আল্লাহর গোলাম তথা মুসলিম হিসেবে জীবন-যাপন করা এক অসম্ভব ব্যাপার। আর আল্লাহর বিধানকে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করা তথা কোরআনকে বিজয়ী করার কাজ ঐক্যবদ্ধভাবে ছাড়া কারো একার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয় এবং কোনো একজন নবী-রাসূলও এভাবে করেননি। এ জন্য সংগঠিত হতে হবে এবং সংগঠিত শক্তি প্রয়োগ করে দ্বীনি আন্দোলনের মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে হবে।

জামায়াতে ইসলামী এ দেশকে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে গড়তে চায় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান তথা কোরআন-সুন্নাহ্কে বিজয়ী করতে চায়। এ লক্ষ্যেই জামায়াত লোকদের সংগঠিত করে দ্বীনকে বিজয়ী করার যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করে যাচ্ছে। ইসলামের সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে যাদের স্পষ্ট জ্ঞান নেই,

www.pathagar.com

যে ভাসা ভাসা জ্ঞান রয়েছে বাস্তব জীবনে সেটুকুও পালন করে না, এসব লোক ইসলামের ব্যাপারে যত কথাই বলুক না কেনো, তাদের পক্ষে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র মুসলিম মিল্লাতকে উপহার দেয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আমার এ কথার বাস্তব প্রমাণ হলো পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে সংগঠিত করা হলো। অগণিত মুসলিম নারী-পুরুষ অকাতরে বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করলো কিন্তু ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো না। কারণ, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো এই আদর্শের ভিত্তিতে উপযোগী লোক গঠন করা। এই শর্ত পূরণ হয়নি এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে বা পরে এই শর্ত পূরণ করার কোনো কর্মসূচীও রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়নি বিধায় পাকিস্তানের জনগণ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র লাভ করতে পারেনি। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং তাঁদের মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান জারী করতে হবে। জামায়াতে ইসলামী এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে– মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সকল স্তরে যে সুবিচারমূলক, পক্ষপাতহীন ও ভারসাম্যপূর্ণ আইন-কানুন, বিধি-বিধানের প্রয়োজন, তা পৃথিবীর কোনা চিন্তাবিদ, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ তথা কোনো মানুষের পক্ষেই রচনা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জীবন-যাপনের লক্ষ্যে যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন, সেই মহাগ্রন্থ আল কোরআনকেই মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণকর জীবন বিধান তথা মুক্তির একমাত্র সনদ বলে বিশ্বাস করে। বর্তমান বিজ্ঞানের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীতে মানব রচিত মতবাদের শোচনীয় ব্যর্থতা জামায়াতের এই বিশ্বাসকে অধিক দৃঢ়তায় উপনীত করেছে।

এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, নিঃস্বার্থ, সৎ-চরিত্রবান ও মানব দরদী লোকদের নেতৃত্ব ব্যতীত কোনো ভালো বিধি-বিধান ও আইন-কানুনও সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করতে যেমন সক্ষম নয়, অনুরূপভাবে জাতির ভাগ্যেরও কোনো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দল যেমন রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে দলের নেতৃত্ব করার সুযোগ করে দেয়, কিন্তু ব্যক্তি সৎ-চরিত্রবান

www.pathagar.com

কিনা সেদিকে দৃষ্টি দেয় না। জামায়াতে ইসলামী এই ধরনের কোনো সুযোগ কাউকে দেয় না। যেসব ব্যক্তি সৎ-চরিত্রবান হতে ইচ্ছুক এবং আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে নিজের ব্যক্তি জীবন সংশোধন করে আখিরাতে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক, তাদেরকে সংগঠনে শামিল করে ইসলামী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযোগী বলে প্রমাণিত হলে সংগঠনের সদস্য পদ প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন আল্লাহভীরু উন্নত চরিত্র গঠনের এক অনুপম সংগঠন।

কোনো সমাজেই উন্নত চরিত্রবান লোক রেডিমেড অবস্থায় পাওয়া যাবে না। সমাজ ও রাষ্ট্র যে ধরনের বিধি-ব্যবস্থার আওতায় পরিচালিত হয়, অনুরূপ লোকই সে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রস্তুত হতে থাকে। সৎ ও চরিত্রবান লোক একটি সংগঠনের মাধ্যমেই প্রস্তুত করতে হয়। আরবের অসভ্য-বর্বর সমাজ থেকেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সংগঠনের মাধ্যমেই আল্লাহভীরু, সৎ-চরিত্রবান, মানব দরদী ও নেতৃত্ব দেয়ার উপযোগী লোক প্রস্তুত করেছিলেন, বর্তমানেও সেই একই পদ্ধতিতে লোক প্রস্তুত করতে হবে। জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচীর ভিত্তিতে আল্লাহভীরু, আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতিসম্পন্ন, সৎ-চরিত্রবান, মানব দরদী যোগ্য লোক প্রস্তুত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি গঠনের মাধ্যমে দ্বীনি আন্দোলন করেছেন, তাঁরই প্রদর্শিত পন্থানুসারে জামায়াতে ইসলামী দ্বীনি আন্দোলন জারী রেখেছে।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর কর্মসূচী

এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীর যাবতীয় মতবাদ-মতাদর্শের ওপরে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। এই কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজটি শুধুমাত্র সভা-সমাবেশ আর শ্লোগানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে যুক্তিসম্মত ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা অপরিহার্য। আল্ হাম্দু লিল্লাহ– জামায়াতে ইসলামী একটি বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ করেই ময়দানে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজ ও দেশে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তথা ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য চার দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। প্রথম দফা, দাওয়াত ও তাবলীগ, দ্বিতীয় দফা তানযীম ও তারবিয়াত, তৃতীয় দফা ইসলাহে মুয়াশারা ও চতুর্থ দফা ইসলাহে হুকুমাত।

প্রথম দফা ঃ দাওয়াত ও তাবলীগ – অর্থাৎ ইসলামের প্রতি আহ্বান ও ইসলামী আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে মানুষের চিন্তার রাজ্যে পরিবর্তন, বিশুদ্ধকরণ ও বিপ্লব সাধনের কাজ। মানুষের মন-মানসিকতা তথা চিন্তার জগৎ থেকে ইসলামের বিপরীত প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদ-মতাদর্শ, প্রথা, বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও সংস্কার বিদূরিত করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর কোরআন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্, খোলাফায়ে রাশেদীনের নমুনা এবং সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শকে নির্ভেজালরূপে মানুষের সামনে পেশ করার উদ্দেশ্যে ইসলামী সাহিত্যের এক বিপুল ভান্ডার সৃষ্টি করেছে। প্রথিত যশা ও বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণ কর্তৃক রচিত এসব ইসলামী সাহিত্য মাদ্রাসা শিক্ষিত ওলামায়ে কেরামদের এমন ব্যাপক জ্ঞানের অলঙ্কারে সজ্জিত করেছে যে, সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম বর্তমানে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদেরকে ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, দর্শন, যুক্তিবিদ্যাসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান– এ বিষয়টি অখন্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে ওলামায়ে কেরাম আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের কাছে তুলে ধরার উৎসাহ লাভ করেছেন। আর এটা জামায়াত কর্তৃক সৃষ্ট ইসলামী সাহিত্যের অবদান, এ কথা প্রমাণিত সত্য।

www.pathagar.com

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এই ধারণা সম্মানিত ওলামায়ে কেরামদের মধ্য থেকে প্রায় বিদায় গ্রহণ করেছিল। এমনকি রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ হওয়াকে তাঁদের অধিকাংশই হারাম মনে করতেন। হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রাহঃ)-এর মতো বিশাল ব্যক্তিত্বও এ কারণেই দ্বীনি আন্দোলন থেকে দূরে অবস্থান করেছেন। জীবনের শেষ বয়সে যখন তিনি সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন, তখন তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামদের কাছে ইসলাম ছিল শুধুমাত্র ধর্মীয় জীবনের কিছু আনুষ্ঠানিক বিধান মাত্র। নামায-রোযা, যিকর, কোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ এবং শুধুমাত্র এসব পালন করে আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে বলে অনেকেই ধারণা করতেন। বর্তমানে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে জামায়াতে ইসলামী যে বিপুল সাহিত্যের ভান্ডার গড়ে তুলেছে, এই সাহিত্য ইসলামকে পৃথিবীর জীবনে শান্তি লাভ ও আখিরাতের জীবনে মুক্তির একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ বিধান হিসেবে উপস্থাপন করে আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের সুন্নাহকে তার প্রকৃতরূপ মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রচিত হয়েছে, এই শিক্ষা ব্যবস্থাই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে। ফলে এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলমানদের ঘরেই ইসলামের দুশমন সৃষ্টি হচ্ছে।

এই শিক্ষা মানুষকে ধর্মবিমুখ, ধর্মনিরপেক্ষ, মৃত্যুর পরের জীবন আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী, অসৎ, আত্মসর্বস্ব মানসিকতা, উচ্ছৃংখল, ভোগবাদী ও নৈতিকতা বিবর্জিত করে গড়ে তুলছে। আল্ হাম্দু লিল্লাহ্– জামায়াত সৃষ্ট ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডার এ জাতিয় লোকদের চিন্তার জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। তাদের মন-মানসিকতায় এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে। ফলে বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত এক বিরাট শ্রেণী জান-মাল কোরবানী করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন করে যাচ্ছে। ইসলামী সাহিত্যের প্রভাবেই তাঁরা সরাসরি কোরআন বুঝার জন্য সময় ব্যয় করছে, তাঁদের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের এক

www.pathagar.com

অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। খোলাফায়ে রাশিদার অনুকরণে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনে দেহের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিচ্ছে। তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের সংগ্রামী জীবন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করছে। ইসলামী সাহিত্যের যে বিপুল সমাবেশ জামায়াত ঘটিয়েছে, এর প্রভাবেই বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত কিশোর, তরুণ, যুবক-যুবতী ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এবং বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ আল্লাহর দ্বীনের পক্ষে ভূমিকা পালন করছে।

জামায়াত সৃষ্ট ইসলামী সাহিত্য ওলামায়ে কেরামদের বক্তৃতার ধারাই পরিবর্তন করে দিয়েছে। কোরআনে নবী-রাসূলের কথা আলোচনা করা হয়েছে, কেনো আলোচনা করা হয়েছে এবং এসব ঘটনাবলী থেকে মানুষকে কি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, তা ওয়াজের মাহফিলে আলোচিত হতো না। চুরি করলে ইসলামী বিধান অনুসারে হাত কাটার ওয়াজ করা হতো, কিন্তু কেনো হাত কাটতে হবে, কোন পরিস্থিতিতে হাত কাটতে হবে, কোন্ অবস্থায় ইসলামের এই আইন প্রযোজ্য–তা ওয়াজে আলোচিত হতো না। পর্দার কথা ওয়াজে আলোচনা করা হতো, কিন্তু কেনো এই পর্দার বিধান, এই বিধানের প্রয়োজনীয়তা কি, সমাজ, দেশ ও জাতি এই বিধান থেকে কোন ধরনের উপকারিতা লাভ করে থাকে, তা মহান ওয়ায়েজীনগণ আলোচনা করতেন না। ওয়াজের মাহফিলে মৃত মানুষের নানা কিচ্ছা-কাহিনী বয়ান করা হতো, আল্লাহর কোরআনকে এমনভাবে পেশ করা হতো যে, মনে হত কোরআন বোধহয় তাবিজ তুমার আর ঝাড়ফুঁকের জন্য আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন।

সাহাবাদের প্রতি নির্যাতনের কাহিনী, বদর, ওহুদ, হুনাইন, তাবুক ও কারবালার কাহিনী করুণ সুরে প্রচার করে মানুষকে কাঁদানো হতো, কিন্তু কেনো সাহাবাগণ নির্যাতিত হলেন, কেনো সেদিন বদর ও ওহুদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, বর্তমানে তার প্রয়োজনীয়তা কতো বেশী, তা ওয়াজে বলা হতো না। কারবালার কাহিনী বর্ণনা করে ইয়াজিদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হতো, কিন্তু কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা কেনো ঘটলো, বর্তমানের ইয়াজিদ গোষ্ঠী কতটা ভয়ঙ্কর, তা আলোচনা করা হতো না এবং এসব ঘটনা থেকে বর্তমান মানুষ কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, তা-ও বলা হতো না।

www.pathagar.com

আয়াতুল কুরছী পড়ে বুকে ফুঁ দিলে মৃত্যুর সময় আযাব হবে না, পরকালে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যাবে, এসব কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করা হতো, কিন্তু এসব হাদীস কোন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, আয়াতুল কুরছীর শিক্ষা কি, এই আয়াত মানুষকে কোন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানায়, আয়াতুল কুরছীতে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে কি ধারণা পেশ করা হয়েছে, এসব দিক ওয়াজের মাহফিলে শোনা যায়নি।

এভাবে ওয়াজের মাহফিলে শতাব্দী ব্যাপী যে গতানুগতিক ধারা চলে আসছিল, ইসলামী সাহিত্যের প্রভাবে তার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানুষ আর শুধু ঐসব কাহিনী শোনার জন্য ওয়াজের মাহফিলে যায় না। বাংলাদেশে এই কৃতিত্ব একমাত্র জামায়াত সৃষ্ট ইসলামী সাহিত্যের। এই সাহিত্য ওয়াজের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, তা অকল্পনীয়। বর্তমানে শুধু ওয়াজের মাহফিলেই নয়–প্রতি জুম্মাবারে সম্মানিত খতিব সাহেবগণ যে আলোচনা করেন, সে আলোচনাও হয় অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। বর্তমানে অধিকাংশ ওয়ায়েজিন ও খতীবগণ ইসলামের বিপ্লবী চেতনা তাঁদের বক্তৃতায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন আর এটা ইসলামী সাহিত্যেরই প্রভাব।

বর্তমানে জামায়াত সৃষ্ট ইসলামী সাহিত্যের এই বিপুল ভান্ডার শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অমুসলিমদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। স্থানীয় ভাষায় অনুবাদকৃত ইসলামী সাহিত্য অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করছে। ফলে তাঁরা ইসলাম কবুল করে ধন্য হচ্ছেন। বাংলাদেশেও বহুসংখ্যক অমুসলিম ইসলামী সাহিত্য পাঠ করে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করছেন। ফলে তাঁরা নিজ ধর্মে বহাল থেকেও ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সহযোগিতা করছেন। আমার নিজ জেলা পিরোজপুর হিন্দু প্রধান এলাকা। অনেক হিন্দু নির্বাচনে আমার পক্ষে কাজ করেছেন। সারা দেশব্যাপী সীরাত মাহফিল ও কোরআনের তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব মাহফিলে শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও মুসলিম-অমুসলিম তথা সর্বশ্রেণী এবং পেশার লোক অংশগ্রহণ করেন। ফলে নিরক্ষর লোকদের মধ্যেও কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতায় না গিয়েও দেশে বহুমুখী সমাজ সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে অশিক্ষিত লোকদের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ এবং চাষী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে অসংখ্য স্কুল, মাদ্‌রাসা, মসজিদ, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, চিকিৎসা কেন্দ্র, হাসপাতাল, কুটির শিল্প, কম্পিউটার ও সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে দুস্থ মানুষের দুর্দশা মোচনের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং তাঁদের মধ্যে ইসলামী চরিত্র গড়ার কাজ করছে। মসজিদ মিশনের মাধ্যমে ইমাম ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে ইসলামের বিপ্লবী আহ্বান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেমন পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে, তেমনি ইমামদেরকে জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত করছে।

বর্তমানে যুবচরিত্র ধ্বংসের অগণিত উপকরণ সহজ লভ্য। ছাত্ররা জাতির ভবিষ্যৎ, তাঁরাই আগামী দিনে জাতিকে নেতৃত্বে দেবে। অথচ এই ছাত্রদের দক্ষ, যোগ্য ও সৎ-চরিত্রবান হিসেবে গড়ার কোনো কর্মসূচী যেমন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই, তেমনি সরকারীভাবেও তাদের চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার বাস্তব ভিত্তিক কোনো কর্মসূচী নেই। ফলে ছাত্ররা সহজেই স্বার্থপর রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তিতে লিপ্ত হচ্ছে, ছিনতাই, ডাকাতী, হত্যা, ধর্ষন ইত্যাদি চরম গর্হিত কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে, সর্বপরি মাদকাসক্ত হয়ে নিজের মূল্যবান জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে।

জামায়াত সৃষ্ট ইসলামী সাহিত্যের প্রভাবে এই ছাত্রদের একটি বিরাট অংশ নিজেদেরকে যাবতীয় নোংরামী থেকে মুক্ত রেখে দেশে কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করার লক্ষ্যে সবথেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তাঁরা নিজেদেরকে দক্ষ-যোগ্য ও সৎ-চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলছে। এই ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র জীবন শেষ করে অনেকেই দেশের প্রশাসনে চাকরী লাভ করেছে। দেশের প্রশাসনের দায়িত্বশীল পদে তাঁরা যেখানেই অবস্থান করছে, সেখানে অনিয়ম, দুর্নীতি, ঘুষ, অসততা-অস্বচ্ছতা নেই। সেখানের জনগণ ন্যায় বিচার পাচ্ছে এবং প্রশাসন গতিশীল হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মাধ্যমে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত শ্রমিকদের ময়দানে বিস্তৃত হচ্ছে। সর্বস্তরের শ্রমজীবীদের কাছে কোরআন-সুন্নাহর

www.pathagar.com

শিক্ষা পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেসব শ্রমজীবী ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে নিজেদেরকে সৎ ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে আগ্রহী হচ্ছেন, তাঁদেরকে সংগঠিত করে ইসলামের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের কানে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত পৌঁছানো ও তাঁদের মধ্যে কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা কি, তা বুঝানোর লক্ষ্যে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষন্মাসিক অথবা সাময়িকী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ইসলামী চেতনাবোধ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত ইসলামী সাহিত্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সাহিত্যসেবীদের কাছে জ্ঞানের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমেও দাওয়াতের কাজ সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা করেছে জামায়াতে ইসলামী।

দ্বিতীয় দফা ঃ তানযিম ও তারবিয়াত– অর্থাৎ সংগঠন ও প্রশিক্ষণ। মহান আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী যে দাওয়াত দেয়, এই দাওয়াত কবুল করে যারা এই সংগঠনের পতাকাতলে শামিল হয়, তাঁদেরকে সাংগঠনিক নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়া, কোরআন-সুন্নাহর আলোকে তাঁদের মন-মানসিকতা ও চরিত্র গঠন করাই এই দ্বিতীয় দফার মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ দ্বিতীয় দফার মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের উপযোগী নেতা ও কর্মী বাহিনী গড়ে তুলছে জামায়াতে ইসলামী। কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোরআনের রঙে রঙিন একদল সৎ-চরিত্রবান, যোগ্য ও ত্যাগী নেত-কর্মী গড়ে তোলা আবশ্যক। সেই সাথে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করা একান্ত জরুরী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে সেই সমাজের লোক– যাঁরা রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের উপযোগী হিসেবে গড়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।

জামায়াতে ইসলামীও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করে যাচ্ছে। যারা জামায়াতের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে, তাঁদের মন-মানসিকতা ইসলামী আদর্শে গঠন

www.pathagar.com

করছে এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির মোকাবেলায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে মুক্তির লক্ষ্যে পরম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে দ্বীনি আন্দোলনের পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাবার উদ্দীপনা সৃষ্টি করছে। আল্লাহর রাসূলও প্রথমে দাওয়াত কবুলকারী লোকদের চিন্তার জগতে ইসলামী বিপ্লব সাধন করেছিলেন। তারপর আল্লাহর পথে ময়দানে দৃঢ়তা প্রদর্শনের উদ্দীপনা তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শ নমুনা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ–وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ–

তিনিই ঐ মহান সত্তা যিনি একটি সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন যিনি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদেরকে আল্লাহর অপছন্দনীয় আচরণ থেকে পবিত্র করেন, আমার কিতাবের শিক্ষা ও সে অনুযায়ী পৃথিবীতে জীবন-যাপনের কৌশল শিক্ষা দেন। অথচ এই লোকগুলোই রাসূল আসার পূর্বে এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো। (সূরা জুমুআ-২)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীনি আন্দোলনের ক্ষেত্রে চার ধরনের কাজের কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম কাজ হলো আল্লাহর কোরআনকে সঠিক পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করা শিক্ষা দেয়া। জামায়াতের দাওয়াতে যারা সাড়া দেয়, তাদেরকেও সঠিক পদ্ধতিতে কোরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া হয়।

দ্বিতীয় কাজ হলো, কোরআন যে লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে এবং যে শিক্ষা নিয়ে এসেছে, তা মানুষকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেয়া। জামায়াতের আহ্বানে যারা সাড়া দেন, তাদেরকে রাসূলের আগমন, কোরআন অবতীর্ণের লক্ষ্য ও কোরআনের শিক্ষা বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে জামায়াতে ইসলামী।

তৃতীয় কাজ হলো, কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন গঠন করা অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোরআনের বিধান বাস্তবায়ন করা। আল্ হাম্দু লিল্লাহ–

www.pathagar.com

জামায়াতের পতাকাতলে যারা সমবেত হয়, তাদের ব্যক্তি জীবন কোরআনের আলোকে সংশোধন করে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

চতুর্থ কাজ হলো, কোরআনের শিক্ষার বিপরীত যাবতীয় ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা, কর্ম-অভ্যাস ও আচরণ জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে দূর করা। ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে যারা জামায়াতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই সংগঠনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়, কোরআন-সুন্নাহর আলোকে তাদের জীবনধারা পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

যারা দাবি করেন যে, জামায়াতে ইসলামী তাসাউফ বা আত্মসংশোধনের পথ অস্বীকার করে অথবা এ ধরনের কোনো কর্মসূচী জামায়াতে নেই– তাদের দাবি সঠিক নয়। বরং জামায়াতে ইসলামী সর্বাগ্রে বাস্তবে আত্মসংশোধনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে এবং এপথেই একদল সৎ-চরিত্রবান, দক্ষ-যোগ্য ও ত্যাগী নেতা-কর্মী গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এই সংগঠনের প্রত্যেক কর্মীর জন্য ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই রয়েছে। প্রতিদিন একজন কর্মীকে কোরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করতে হবে, হাদীস অধ্যয়ন করতে হবে, ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে আদায় করতে হবে, লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে এবং পরিশেষে রয়েছে আত্ম-সমালোচনা। একজন মানুষ যদি নিয়মিত প্রতিদিন কোরআন তিলাওয়াত করে, অর্থ ও ব্যাখ্যা পড়ে, হাদীসের ব্যাখ্যা পড়ে, ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে, নামাজ জামায়াতে আদায় করে, সেই সাথে আত্ম-সমালোচনার মাধ্যমে প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে নিজের সারা দিনের কাজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করে। তাহলে সে মানুষের জীবন থেকে যেমন সকল প্রকার শিরক, বিদ্‌য়াত ও জাহিলিয়াত দূর হয়, জীবন ইসলামী জ্ঞানের অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, তেমনি গোনাহ্ থেকে দূরে অবস্থান করা সম্ভব হয়।

সারা দিন পরে একজন মানুষ যদি নিজের কাজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করে, অর্থাৎ আজকের দিনে সে কোরআন-হাদীস অধ্যয়ন করতে পেরেছে কিনা, নামাজ জামায়াতে আদায় করতে পেরেছে কিনা, জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছে কিনা, সারা দিনে সে এমন কোনো কাজ করেছে কিনা– যা আল্লাহ

www.pathagar.com

তা'য়ালা অপছন্দ করেন। এগুলোর ব্যাপারে যদি কোনো ত্রুটি আত্ম-সমালোচনায় ধরা পড়ে, পরবর্তী দিনে সে আর এ ধরনের কোনো কাজে লিপ্ত হবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে সে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সৎ ও চরিত্রবান হতে বাধ্য। এসব কাজ যথারীতি জামায়াতের কর্মীগণ করছে কিনা, তা তদারক করার জন্য তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক কর্মীকে সাপ্তাহিক বৈঠকে যোগ দিতে হয়। তাদের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১, ২, ৩ অথবা ৪/৫ দিনের শিক্ষা শিবিরে যোগ দিতে হয়। এভাবে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একজন কর্মী মুমিন হওয়ার নিম্নতম মানে উত্তীর্ণ হলে তাকে জামায়াতের রোকন বা সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়। আল্লাহর শোকর– জামায়াতে ইসলামী এই প্রক্রিয়াতেই ব্যক্তি গঠন করে যাচ্ছে।

তৃতীয় দফা ঃ ইসলাহে মুয়াশারা অর্থাৎ সমাজ সংস্কার ও সেবার কাজ। জামায়াতে ইসলামীর এই কাজ সম্পর্কে ইতোপূর্বে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। এই কাজটি সর্বাধিক ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং এ কাজের ক্ষেত্রও বহুমুখী। এই কাজের মাধ্যমে জামায়াতের নেতৃবৃন্দ ও কর্মী বাহিনীকে জনকল্যাণমূলক কাজ ও সমাজ সংস্কারের কাজে নিয়োগ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ দেবেন, তখন সে অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা যেন অর্পিত দায়িত্ব যথারীতি আঞ্জাম দিতে সক্ষম হন। ইতোমধ্যেই জামায়াতে ইসলামী দেশের শহর ও পল্লী অঞ্চলে স্কুল, মাদ্‌রাসা, মক্তব, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোরআনের আলোকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান চালু করেছে। এর মাধ্যমে একদল সৎ-চরিত্রবান ও যোগ্য শিক্ষাবিদ-শিক্ষক গড়ে উঠছে। দেশের যেসব এলাকায় চিকিৎসার ব্যবস্থা অপ্রতুল, জামায়াত সাধ্যানুসারে সেসব স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপন করেছে। বেকার লোকদের কর্ম সংস্থানের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে চাষাবাদ, পশু পালন, মৎস পালন, কুটির শিল্প, হস্ত শিল্প ইত্যাদি। এর মাধ্যমে একদিকে লোকদের যেমন রুজির ব্যবস্থা হচ্ছে, অপরদিকে তাদেরকে ইসলামী চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ দফা ঃ ইসলাহে হুকুমাত অর্থাৎ সরকার সংশোধনের কাজ। জামায়াতে ইসলামী দেশের গ্রাম ও ইউনিয়ন থেকে শুরু করে শাসন ব্যবস্থার সকল স্তরে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতার অনুভূতিহীন, আল্লাহদ্রোহী, জালিম, অসৎ-চরিত্রহীন, অযোগ্য, অদক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ-ধর্মহীন লোকদের নেতৃত্বের পরিবর্তে আল্লাহভীরু, সৎ-চরিত্রবান, দক্ষ-যোগ্য, মানব দরদী, সর্বোপরি আখিরাতে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির অনুভূতিসম্পন্ন লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক পন্থায় চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন, এ জন্য সকল ক্ষেত্রে এই সংগঠন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই একমাত্র আদর্শ ও অনুকরণীয় বলে বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাস কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করে।

নবী-রাসূল তথা আম্বিয়ায়ে কেরামদের ইতিহাসে দেখা যায়, তাঁরা কখনো ষড়যন্ত্র করে চোরাপথে, লোভ-লালসা প্রদর্শন করে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, পেশী শক্তি বা অস্ত্রশক্তির বলে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেননি। তাঁদের দাওয়াতে যাঁরা সাড়া দিয়েছেন, তাঁদেরকে সাথে নিয়ে দেশের জনগণের সহযোগিতায় সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তন করেছেন। জামায়াতে ইসলামীও সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে ঐ একই পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং দেশ ও জাতীকে অসুস্থ ও অস্বচ্ছ রাজনীতির করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জামায়াত তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে আপোষ করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না ইন্‌শাআল্লাহ।

www.pathagar.com

অন্যান্য দলের সাথে জামায়াতে ইসলামীর পার্থক্য

জামায়াতে ইসলামী কোনো ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় বা বিশেষ শ্রেণী-গোষ্ঠীকে দাওয়াত দেয় না। এই সংগঠন পৃথিবীর সকল মানুষকে এক আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি হিসেবে একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণের দাওয়াত দেয়। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ–

হে মানব সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের সেই রব-এর দাসত্ব স্বীকার করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল লোকের সৃষ্টিকর্তা। আশা করা যায় এর ফলে তোমরা যাবতীয় সঙ্কট থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। (সূরা বাকারাহ্-২১)

আল্লাহ তা'য়ালা কোনো শ্রেণী বিশেষকে নয়– সকল মানুষকেই তাঁর দাসত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। সুতরাং জামায়াতে ইসলামীও সকল মানুষকেই আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার জন্য আহ্বান জানায়। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য যে, মুসলিম পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেও সন্তান ইসলামের দুশমনে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে অমুসলিম মাতা-পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেও সন্তান আল্লাহর দাসত্ব কবুল করে ইসলামের জন্য বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়েছে। জামায়াত মহান আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার আহ্বান জানায় এবং এই দাওয়াত যারা কবুল করে জামায়াত তাদেরকেই সংগঠিত করে কোরআনের সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলে। সুতরাং জামায়াতে ইসলামী কোনো মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল নয়– বরং কোরআনের আদর্শবাহী দল। এটা কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ভিত্তিক দল নয়, এই দলের দুয়ার সকল স্তরের মানুষের জন্যই উন্মুক্ত। যারাই একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কবুল করে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন গঠন করতে আগ্রহী, তারাই এই দলে শামিল হতে পারেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের লক্ষ্যে আম্বিয়ায়ে কেরাম যখনই দ্বীনি আন্দোলন করেছেন, তখনই তাঁদের সাথে সকল প্রকার কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর সংঘর্ষ হয়েছে। আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্য

www.pathagar.com

করতে হবে– এই দাওয়াতে ইসলাম বিরোধী শক্তি অবশ্যই শঙ্কিত হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই দাওয়াতের আঘাত শুধুমাত্র ধর্ম বিরোধী নাস্তিক, মুরতাদ, ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী, পূজিবাদী, সমাজতন্ত্রী ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদীদেরকেই আহত করে না, বরং ধর্মের আলখেল্লা পরিহিত ধর্ম ব্যবসায়ীদেরকেও আহত করে। জামায়াতে ইসলামীও সেই একই দাওয়াত দিচ্ছে এবং দ্বীনি আন্দোলন করছে। ফলে উল্লেখিত গোষ্ঠী জামায়াতের দাওয়াতে আহত হবে এটাই স্বাভাবিক এবং এ কারণেই জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা করা হচ্ছে।

এই দলটি যদি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে নামাজ-রোযা পালন, কোরআন তিলাওয়াত, যিকর ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে পরহেজগার হওয়ার দাওয়াত দিতো, তাহলে উল্লেখিত গোষ্ঠী কোনো আপত্তিই করতো না, বরং সহযোগিতা দিতো। সমাজ ও দেশে একশ্রেণীর মানুষ ও সংগঠন রয়েছে, যারা পরহেজগার লোক হিসেবে পরিচিত ও ঐসব সংগঠন ইসলামের খাদেম হিসেবে পরিচিত, তারা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন না বা তাদের এ ধরনের কোনো কর্মসূচী নেই, এসব ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে ধর্ম বিরোধী নাস্তিক, মুরতাদ, ধর্মনিরপেক্ষ, পূজিবাদী, সমাজতন্ত্রী ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী ও ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কোনো কথা বলেনা। কারণ ঐ শ্রেণীর পরহজেগার ব্যক্তি ও দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত দাবিদার সংগঠন আল্লাহর বিধানের বিপরীত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনেই স্বচ্ছন্দতা অনুভব করেন। তারা প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করেন না বিধায় তাদের সাথে কারো সংঘর্ষ হয় না। নিজেকে যতই রাজনীতি নিরপেক্ষ বলে দাবি করা হোক না কেনো, মানুষ কখনই রাষ্ট ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। মানুষকে কোনো না কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে তার আইন-কানুন মেনেই বাস করতেই হয়।

হয় সেই মানুষকে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে সন্তুষ্ট চিত্তে বাস করতে হবে, নতুবা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে তাকে সচেষ্ট হতে হবে। সুতরাং যারা মহান আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তন করার দাওয়াত দেয় না, তারা যতই পরহেজগার ও দ্বীনদার হিসেবে পরিচিত লাভ করুক না কেনো, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর বিধানের

www.pathagar.com

বিপরীত আইন-কানুন ও বিধানের প্রতি তথা কুফরী ব্যবস্থার প্রতিই প্রকারান্তরে আনুগত্য করে ও সমর্থন যোগায়। আর এই শ্রেণীর পরহেজগার ও দ্বীনদার লোকদেরকে ধর্মহীন-ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী প্রয়োজনে তাদের স্বার্থ সিদ্ধির কাজে সহযোগী শক্তি হিসেবে লাভ করে। জামায়াতে ইসলামী যেহেতু আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তন করার দ্বীনি আন্দোলন করছে, সেহেতু জামায়াতের বিরোধিতা করা হবে, এটাই স্বাভাবিক।

জামায়াতে ইসলামী একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালাকেই সমস্ত ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিশ্বাস করে। একমাত্র তাঁরই দাসত্ব, বন্দেগী, ইবাদাত, গোলামী করতে হবে বলে বিশ্বাস করে। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন একমাত্র তিনিই পূরণ করেন এবং মানুষের ভাগ্যও তিনি পরিবর্তন করতে পারেন। কেবলমাত্র তিনিই মানুষকে যে কোনো দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে পারেন। তিনিই একমাত্র আইন ও বিধানদাতা। কোনো মৃত বা জীবিত পীর-বুযর্গ মানুষের সামান্যতম কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে সক্ষম নন। এ কারণেই একশ্রেণীর দুনিয়া পূজারী পীর ও শির্ক-বিদয়াতে লিপ্ত মাজার পূজারী ব্যক্তিগণ যেমন জামায়াতের বিরোধিতা করে থাকে, অনুরূপভাবে যারা মানব রচিত আইন-কানুনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়, তারাও বিরোধিতা করে।

জামায়াতে ইসলামী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজনৈতিক ও সামরিক জীবনের কার্যাবলী এবং ধর্মীয় জীবনের কার্যাবলীকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। বরং তাঁর জীবনের যে কোনো দিক ও বিভাগকেই অনুসরণ করতে হবে বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহর বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে একমাত্র রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থাকেই অনুসরণযোগ্য বলে বিশ্বাস করে। ইসলামের নামে যেসব নতুন পথ-মত সমাজ ও দেশে প্রচলিত রয়েছে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম করেননি, এসব পথ-মতের সাথে জামায়াত ঐকমত্য পোষণ করেনা বিধায় ঐসব পথ-মতের অনুসারীরা জামায়াতের সাথে বিরোধিতা করে থাকে।

দেশে বিভিন্ন ধরনের সমিতি, সংগঠন ও রাজনৈতিক দল রয়েছে। এসব সমিতি, সংগঠন ও রাজনৈতিক দল কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একটি কমিটি গঠনের

www.pathagar.com

মাধ্যমে গড়ে তোলে। তারপর প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-বিত্ত বা শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে তাদের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উদ্দেশ্য ভিত্তিক লোক প্রস্তুত না করে যখন এ ধরনের দল গঠন করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই দলে আত্মকলহ, দলাদলি ও ভাঙন সৃষ্টি হয়। পরিণামে দল কয়েক টুকরায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে জামায়াতে ইসলামী এ ধরনের কোনো দল নয় এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে এই সংগঠন কায়েম হয়নি। যে কেনো ব্যক্তিকেই এই সংগঠনের সদস্য বা রুকন করা হয় না। হতে পারেন তিনি পৃথিবীখ্যাত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী প্রাপ্ত, দেশের প্রখ্যাত পীর বা মাদ্‌রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত আলেম। যিনিই এই সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করে এই সংগঠনে শামিল হতে চান, তাঁকে সর্বপ্রথমে জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সদস্য হিসেবে ফরম পূরণ করতে হবে। এরপর তাঁকে নিয়মিত কর্মী হতে হবে।

কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাঁকে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে কোরআন-সুন্নাহর দাবি অনুসারে সার্বিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। যথানিয়মে কোরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তব জীবনধারা পরিবর্তন করতে হবে। রোযগারের প্রত্যেকটি পয়সা হালাল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ইসলামের বিধান অনুসারে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে। সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে চাকরী করা যাবে না। সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করা যাবে না। যে স্কুলে বালেগা মেয়েরা লেখাপড়া করে, সে স্কুলে পুরুষ শিক্ষক হিসেবে চাকরী করা যাবে না। স্কুল, কলেজ ও মাদ্‌রাসার প্রধান হিসেবে সরকারী দপ্তরে রিপোর্ট দেয়ার ক্ষেত্রে সামান্যতম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সাম্ভাব্য উপায়ে হারাম থেকে নিজেকে হেফাজত করতে হবে এবং ইসলাম নির্ধারিত ফরজ-ওয়াজিব মেনে চলতে হবে। এভাবে তাক্‌ওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার পরই তাকে জামায়াতে ইসলামী সদস্য পদ দান করে।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। রুকন বা সদস্য পদ দান করার পরে সেই ব্যক্তির জীবনধারা ক্রমশ উন্নতির দিকে যাচ্ছে কিনা, সেদিকে সংগঠন তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে। তাঁর সার্বিক জীবনধারা ও ব্যক্তিগত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা হয়, তাঁর

www.pathagar.com

ভেতরে ঈমানের দাবি অনুসারে গুণাবলী সৃষ্টি হচ্ছে কিনা। যদি কোনো ধরনের অবহেলা দেখা যায়, তাহলে তার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, যিনি রুকন– তিনি কিভাবে ইসলামের দাওয়াতী কাজের আঞ্জাম দিচ্ছেন, তা পর্যালোচনা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ডিগ্রী, সরকারী বড় অফিসার, বিখ্যাত বক্তা, প্রথিত যশা লেখক বা চিকিৎসক, বিখ্যাত শিল্পপতি, অঢেল অর্থের অধিকারী, অমুক দলের তিনি বিখ্যাত নেতা ছিলেন বা এক সময় দেশের মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইত্যাদি জামায়াতের সদস্য বা রুকন হওয়ার মানদন্ড নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে আগ্রহী এবং এই পথে অন্যকে আনার প্রবল আগ্রহ যার মধ্যে রয়েছে, সে ব্যক্তি সামান্য লেখাপড়া জানলেও তাঁর তাক্ওয়া ও পরহেজগারীর মান অনুসারে তাকেও রুকন বা সদস্য পদ দেয়া হয়।

যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জামায়াতে ইসলামী কায়েম হয়েছে, সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য উল্লেখিত পলিসি গ্রহণ করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। সদস্য বা রুকন পদ লাভের জন্য যে সামান্য শর্ত এই সংগঠনে চালু রয়েছে, তা একান্তই পূর্ণ মুসলমান হওয়ার জন্য একেবারেই নিম্নতম মান। পক্ষান্তরে আল্লাহর পূর্ণ গোলাম হওয়ার জন্য যে মান প্রয়োজন, সেই পূর্ণমান ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এই সংগঠনে সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল বা নেতা নির্বাচিত হয় রুকন বা সদস্যদের গোপন ভোটের মাধ্যমে। শরিয়াতের বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো পদের জন্য প্রার্থী হওয়ার সুযোগ নেই। যদি কোনো ব্যক্তি ইশারা-ইঙ্গিতেও কোনো পদের জন্য আগ্রহী হন, তাহলে এটাই হয় তার জন্য সবথেকে বড় অযোগ্যতা। নেতা হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে যদি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে তিনি অযোগ্য বলে জামায়াতের কাছে বিবেচিত হন।

এ জন্যই ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী জামায়াতের গঠনতন্ত্র রচিত হয়েছে। গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে– 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোনো পদের জন্য আকাঙ্খিত হওয়া বা ইহার জন্য চেষ্টা করা উক্ত পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হইবে।' জামায়াতের সকল স্তরে যে নেতা নির্বাচিত হন, এই নির্বাচনে কোনো প্রতিযোগিতার সুযোগ নেই। অন্যান্য রাজনৈতিক দলে

www.pathagar.com

কোনো পদের জন্য প্রস্তাবক থাকে, তারা নিজেদের পছন্দ অনুসারে ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করে এবং প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের মধ্যে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা চলে। এভাবে প্রস্তাবকগণ ও ব্যক্তির সমর্থকগণ প্রার্থীর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচারাভিযান চালায়। এতে করে দলের মধ্যে ব্যক্তিভিত্তিক উপদলের সৃষ্টি হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা সহিংস রূপ পরিগ্রহ করে। দলের সাংগঠনিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে এক সময় দলে ভাঙনের সৃষ্টি হয়। জামায়াতে নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেউ প্রার্থী হতে পারেন না, পছন্দের কোনো ব্যক্তির পক্ষে প্রচার চালানোর কোনো সুযোগ নেই। তাক্ওয়া ও অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে রুকন বা সদস্যগণ গোপনে যাকে খুশী ভোট দেন। যার পক্ষে সর্বাধিক ভোট পড়ে তাকেই নেতা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে জামায়াত শরীয়াতের বিধান অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে মেনে চলে বলে এই সংগঠনে নেতৃত্বের কোন্দল বা সাংগঠনিক কোনো বিরোধ সৃষ্টি হবার সুযোগ নেই। রুকন বা সদস্যগণ নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে দ্বীনি যোগ্যতার সাথে সাথে নেতৃত্বের বুনিয়াদী যোগ্যতার প্রতিও লক্ষ্য রাখেন।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলে নেতৃত্ব লোভী ব্যক্তিকে দলে ধরে রাখার জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ দেয়া হয়। এরপরেও নেতৃত্ব লোভী ব্যক্তি অন্য দলে ভালো সুযোগ-সুবিধা পেলে দল ত্যাগ করে। কিন্তু জামায়াতে এ ধরনের কোনো প্রচেষ্টা নেই, এ কারণে এই সংগঠনে উপদল সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই। জামায়াতের বৈঠকসমূহে সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের পারস্পারিক সমালোচনা করার ও জাবাবদিহিতার অবাধ সুযোগ রয়েছে। এ সমালোচনা হয় দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ পদ্ধতিতে। ফলে কর্মী ও নেতার মধ্যে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কখনও যদি কর্মীদের মধ্যে একের সাথে অন্যের মনমালিন্য ঘটে, তাহলে তা অশুভ পরিণতিতে পৌছার পূর্বেই এই পারস্পারিক সমালোচনার কারণে মন থেকে মুছে যায়। এই সংগঠনে ব্যক্তি পূজার কোনো অবকাশ নেই। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা বিগত ও চলমান শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আওলাদে রাসূল আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহঃ) বিশ্বব্যাপী দ্বীনের খেদমতের কারণে বাদশাহ্ ফয়সাল পুরস্কারসহ অন্যান্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা ব্যতীত তাঁর মৃত্যু বা জন্মবার্ষিকী পালন করে না।

www.pathagar.com

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে যে কোনো উপায়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করা এবং পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভ করা। এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন রাজনীতিবিদরা সামান্য ইস্যুকে কেন্দ্র করে হরতাল, ধর্মঘট ডাক দেয় বা দেশ জুড়ে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করে। দেশের সাধারণ জনগণকে এরা বিভ্রান্ত করে নির্বাচনের সময় যে কোনো উপায়ে ক্ষমতার মসনদে বসার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু জামায়াত এ ধরনের নোংরা রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদরা যে পন্থায় রাজনীতির নামে নোংরামী করে, আল্ হাম্দু লিল্লাহ– জামায়াত এ ধরনের নোংরামী থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য জামায়াতের মধ্যে কোনো অস্থিরতা নেই। কারণ ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য লোক প্রস্তুত হলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করবেন বলে সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে ওয়াদা করেছেন। এ জন্য জামায়াত যে মহান বিপ্লব সাধন করতে আগ্রহী, তা দেশের সাধারণ জনগণের সমর্থন নিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় ঘটাতে চায়।

জামায়াতে ইসলামী ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলে দলীয় তহবিলে নেতা-কর্মী ও দলের শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা যোগাড়ের পদ্ধতি নেই। বরং দলীয় তহবিল থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। কর্মীদের দিয়ে সভা-সমাবেশ ও মিছিল করাতে হলে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। ক্ষমতালিপ্সু দলে কালো টাকার মালিক ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ভীড় জমায়। কারণ দল ক্ষমতায় গেলে তারা নানাভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ লাভ করে। এসব ব্যক্তিবর্গই দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা হন এবং এদের অবৈধ অর্থেই দল পরিচালিত হয়। দলের জন্য যে পরিমাণ অর্থ এরা ব্যয় করে, দল ক্ষমতায় গেলে নানা পন্থায় তার কয়েক শতগুণ আদায় করে।

মহান আল্লাহর রহমত, জামায়াতে ইসলামী এ ধরনের সংগঠন নয়। এই সংগঠনের সকল স্তরের নেতা-কর্মীদেরকে তাঁদের মাসিক উপার্জনের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রত্যেক মাসে নিয়মিত সংগঠনের তহবীলে দান করতে হয় এবং এটা জামায়াতের কর্মী হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের অন্যতম শর্ত। এই শর্ত যারা পালন করেন না, তাঁরা

www.pathagar.com

সংগঠনের কর্মী হিসেবেও বিবেচিত হন না। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পবিত্র কোরআনে ধন-সম্পদ ব্যয়ের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা যদি কেউ পালন না করে তাহলে তার পক্ষে দ্বীনি আন্দোলনের কর্মী হওয়া অসম্ভব। যারা জামায়াতে ইসলামীকে নিজেদের শত্রু ধারণা করে গালাগালি ও ফতোয়ার বৃষ্টি বর্ষণ করেন, জামায়াত তাদের গালির জবাবে গালি দেয় না। এই সংগঠন কারো সাথে বিতর্ক বা ঝগড়ায় লিপ্ত হয় না। কেউ জামায়াতের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করলে প্রয়োজনে এই সংগঠন যুক্তির মাধ্যমে তা খন্ডন করে। জামায়াতের বিরুদ্ধে যারা অশালীন ও অভদ্র ভাষা ব্যবহার করে, জামায়াত তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। এই সংগঠন মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেয় না, বরং আদর্শ দিয়ে মন্দের মোকাবেলা করে।

অমুসলিমদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদিন যে পন্থা অনুসরণ করেছেন, জামায়াতে ইসলামীও সেই একই পন্থা অনুসরণ করে থাকে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের যে অধিকার প্রদান করেছেন, সেই অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হলে জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর কোরআনের সম্মান-মর্যাদার স্বার্থেই প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, কোনো মুসলমান যদি কোনো অমুসলিমের প্রতি অন্যায় জুলুম করে, তাহলে তিনি আখিরাতের ময়দানে অমুসলিমের পক্ষাবলম্বন করে মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। ধর্মের ব্যাপারে ইসলাম শক্তি প্রয়োগ হারাম ঘোষণা করেছে। ধর্ম হলো একান্তই বিশ্বাস ও মনের বিষয়। কারো মনের ওপর শক্তি প্রয়োগ করা যায় না। এ জন্য কোনো অমুসলিমের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করে মুসলিম বানানোর ব্যাপারে আল্লাহর কোরআন কঠোর প্রতিবাদ করেছে।

কোনো ব্যক্তি যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী হয়েও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে নানা ধরনের মতবাদ-মতাদর্শের অনুসরণ করতে পারেন এবং এতে যদি তাদের ধার্মিকতার কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি সমর্থন করলে তাদের ধার্মিকতার ক্ষতি হবে কেন? ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয়

www.pathagar.com

কাঠামোর প্রতি সমর্থন দিতে হলে তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে, এমন কোনো শর্ত জামায়াতে ইসলামীতে নেই। নিজ নিজ ধর্মে বহাল থেকেও সমর্থন দেয়া যায়। ইতিহাসে এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা অমুসলিমদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছে। মুসলমানদের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রুর প্রতি ইসলাম যে গুরুত্ব দিয়েছে, অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও সেই একই গুরুত্ব দিয়েছে– হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়নি। এভাবে করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ জামায়াতে ইসলামী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দ্বীনি আন্দোলন করে যাচ্ছে এবং এ কারণেই আমি দ্বীনি আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সংগঠনে যোগ দিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জামায়াতে ইসলামীকে বিজয় দান করুন। আমীন– ইয়া রাব্বাল আলামীন।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদুদী (রহঃ) ও জামায়াতে ইসলামী

প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেরই দুটো দিক রয়েছে। তার একটি দিক হলো এই পৃথিবীর জীবন তথা ইহকাল। আর অপর দিকটি হলো আখিরাতের জীবন তথা পরকাল। পৃথিবীর জীবনটি হলো ক্ষণস্থায়ী বা স্বল্প সময়ের। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন তাঁর কোনো বান্দাহ্‌কে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করতে ইচ্ছুক হন, তখন সর্বপ্রথম মাতৃগর্ভে বান্দার দেহ কাঠামোর সূচনা করেন। আল্লাহ তা'য়ালার কোনো বান্দাহ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই মৃত্যুবরণ করে, কেউ পৃথিবীর আলো-বাতাসে আগমন করার সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করে কেউ বা বিভিন্ন বয়সে উপনীত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে। অর্থাৎ মানুষের পৃথিবীর যে জীবনটি, তা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যে কোনো মুহূর্তে একজন মানুষকে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হতে পারে। এটা মহান আল্লাহর অমোঘ নির্দেশ।

অপরদিকে মৃত্যুর পরবর্তী আখিরাতের যে জীবন, সে জীবনের কোনো শেষ নেই। সে জীবন এমনি একটি জীবন, যার সূচনা রয়েছে কিন্তু ইতি নেই– অনন্তকালের জীবন। মানুষের জীবনের এই দুটো পর্যায়েই মানুষ যেনো শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়, এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণের সূচনাতেই তাঁর পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা দানকারী জীবন বিধান অবতীর্ণ করার ওয়াদা করেছিলেন। মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে পৃথিবীতে প্রেরণের সূচনাতেই বলা হয়েছিলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا– فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ–

বলা হলো, তোমরা সকলেই এখান থেকে (পৃথিবীতে) নেমে যাও। এরপর আমার পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের কাছে পৌছবে, যারা আমার সেই বিধান অনুসরণ করে চলবে, তাদের জন্য ভয়-ভীতি এবং চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না। (সূরা বাকারা-৩৮)

পৃথিবীতে মানব প্রেরণের সূচনায় মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে যখন পৃথিবীতে প্রেরণ করা হচ্ছিলো, তখন স্বাভাবিকভাবেই

www.pathagar.com

তিনি চিন্তিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে, পৃথিবীতে গিয়ে তিনি কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করে জীবন পরিচালিত করলে শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। তাঁর হৃদয়ের এই শঙ্কা দূর করার লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই ওয়াদা দিলেন যে, ভীতগ্রস্ত হবার বা শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে জীবন বিধান প্রেরণ করা হবে। সেই বিধান অনুসারে যারা পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করবে, তাদের চিন্তাগ্রস্ত হবার যেমন কারণ নেই, অনুরূপভাবে অশান্তি, অস্বস্তি, অকল্যাণ, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদির কোনো কারণ নেই। আর যারা আমার দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করবে না, তাদের ব্যাপারে সতর্ক বাণী হলো–

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ– هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ –

আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ-নিষেধকে মিথ্যা মনে করবে, তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা বাকারা-৩৯)

সুতরাং এ কথা মানব জাতির ইতিহাসে প্রমাণিত সত্য যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা জীবন বিধান অনুসারে এই পৃথিবীতে যে মানব গোষ্ঠীই জীবন পারিচালিত করেছে, তারাই শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও সফলতা অর্জন করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে যেখানেই আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা হয়েছে, সেখানেই খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। রাষ্ট্র ও সমাজ যাবতীয় অনাচার, বিপর্যয়, অশান্তি ও অকল্যাণ থেকে সুরক্ষিত থেকেছে। আর যেখানেই আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে, অমান্য বা বিরোধিতা করা হয়েছে, সেখানেই সার্বিকভাবে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় ধেয়ে এসেছে।

সুতরাং এ কথা ইতিহাসে প্রমাণিত সত্য যে, একমাত্র ইসলামী জীবন বিধানই মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও সফলতার একমাত্র গ্যারান্টি এবং মানব রচিত কোনো প্রকার মতবাদ-মতাদর্শ মানুষের জীবনে শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার শোচনীয় স্বাক্ষর রেখেছে। মানব জাতির প্রত্যেকটি বিপর্যয়ের বাঁকেই

www.pathagar.com

আল্লাহর বিধান অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিকভাবে অনুভূত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। অতএব সার্বিক বিবেচনায় রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার নেতৃত্ব আল্লাহভীরু জ্ঞানী-গুণী মুসলিম কর্তৃক পরিচালিত হতে হবে। এই ধরনের রাষ্ট্রে মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ও আল্লাহভীরু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে পরামর্শ পরিষদ বা মাজলিশে শূরা বর্তমান থাকবে এবং এই পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালিত হবে।

একমাত্র এই ধরনের রাষ্ট্র ও সমাজই দেশের জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে সক্ষম। কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক এই ধরনের ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে অবলম্বিত হওয়ার কারণেই খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি, দুষ্কৃতি তথা যাবতীয় অপরাধ থেকে মুক্ত ছিলো। সর্বত্রই সততা আর ন্যায়-নীতির চিহ্ন ছিলো আকাশের প্রজ্জ্বল সূর্যের মতোই স্পষ্ট। খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খেলাফতকালে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। পরবর্তী অবস্থা ইতিহাসে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

فَمَكَثَ عَامًا كَامِلاً وَلَمْ يَخْتَصِمْ اِلَيْهِ اِثْنَانِ فَقَالَ عُمَرُ (رض) مَا حَاجَةُ بِىْ عِنْدَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اللّٰهِ صَلَّى

দীর্ঘ একটি বছর তিনি সেই পদে অবস্থান করলেন, কিন্তু একটি মামলা-মোকদ্দমাও তাঁর কাছে এলো না। তিনি খলীফার কাছে অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, 'দীর্ঘ একটি বছর যাবৎ দেশের প্রধান বিচারপতির পদে আসীন রয়েছি, অথচ একটি মামলাও আমার কাছে এলো না। হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! মুমীন লোকদের জন্য আমার মতো বিচারকের কোনো প্রয়োজন নেই।'

খলীফা জানতে চাইলেন, 'বিশাল একটি দেশের বিপুল সংখ্যক জনতার পক্ষ থেকে একজন নাগরিকও দীর্ঘ এক বছরেও কারো বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করলো না, এর কারণ কি?'

www.pathagar.com

খলীফার কথার জবাবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন–

دِيْنَهُمُ النَّصِيْحَةُ وَمَنْهَجُهُمُ الْقُرْآنُ وَ عَمَلَهُمُ الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهِيْ عَنِ الْمُنْكَرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَعْرِفُ حَدَّهُ فَيَقِفُ عِنْدَهُ وَ اِذَا مَرِضَ اَحَدُ هُمْ عَادَوْهُ وَ اِذَا افْتَقَرَ نَصَرُوْهُ وَ اِذَا احْتَاجَ سَعَادُوْهُ فَفِيْمَا هُمْ يَخْتَصِمُوْنَ اِلَيَّ يَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

তাঁদের তথা দেশের জনগণের দ্বীন-ই হলো পরস্পরকে সৎ উপদেশ দেয়া, তাঁদের জীবন চলার নির্দেশক হলো আল-কোরআন এবং তাদের কাজ হলো সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ জানে তাদের নিজের চলার সীমা রেখা কোন্ পর্যন্ত এবং এজন্য তাঁরা নিজের সীমার কাছে থেমে যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ একজন অসুস্থ হলে তাঁরা তাঁর সেবা করে, কেউ বিপদে নিপতিত হলে তাকে সাহায্য করে এবং কেউ অভাবী হলে তাকে সহায়তা করে। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! তাঁরা কোন্ প্রয়োজনে কেন আমার কাছে বিচারের জন্য আসবে?

উল্লেখিত ঘটনাটির মধ্য দিয়ে সে যুগের সার্বিক অবস্থা প্রতিভাত হয়েছে। সে সময়ে প্রত্যেকটি মানুষ এ কথা অবগত ছিলো যে, জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে কে কতটুকু অগ্রসর হতে পারবে। কোন্ সীমা রেখা অতিক্রম করলে আখিরাতের কঠিন ময়দানে মহান আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে, এ কথা তাঁদের হৃদয়ে জাগরুক ছিলো। এ কারণেই তাঁরা পরস্পরের অধিকারের প্রতি সজাগ ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) খলীফার প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন, তার সারমর্ম হলো, দেশের জনগণ পরস্পরে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করে, ফলে তাদের মধ্যে কোনো সমস্যাই সৃষ্টি হয় না। তারা পরস্পর ইনসাফের ভিত্তিতে বসবাস করছে। কেউ কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করার প্রবণতাও প্রদর্শন করে না। সুতরাং আদালতে কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

www.pathagar.com

খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফত কালে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে আসীন কোনো ব্যক্তির দ্বারা কোরআন-সুন্নাহর একটি বিধানও লংঘিত হয়নি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসীন ব্যক্তি থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক স্তর ছিলো ইনসাফের মোড়কে আবৃত। ফলে সেই রাষ্ট্র ও সমাজ একটি পরিপূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক সমাজের ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছিলো। পক্ষান্তরে একনায়কত্ব, রাজতন্ত্র তথা বাদশাহী, স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র ইত্যাদি পদ্ধতির কারণে দেশের জনগণকে হতে হয় নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অধিকার বঞ্চিত। প্রত্যেক পদে পদে তাদেরকে অন্যায় আর অবিচারের সম্মুখিন হতে হয়। শক্তিমান কর্তৃক দুর্বল লাঞ্ছিত হবে, এটাই হয় এসব পদ্ধতির অধীনে শাসিত রাষ্ট্রে। জনগণ থাকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এসব কারণেই ইসলামী শরীয়াত উল্লেখিত পদ্ধতির বিপরীতে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক শুরাঈ পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। সূরা শূরার ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

وامر هم شورى بينهم–

এবং নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ড পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত করে।

বর্তমান কালেও পৃথিবীর যে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ও সমাজে সার্বিক ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি তথা ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণে ঈমানদারদের মধ্য থেকে জ্ঞানী-গুণী, বিচক্ষণ, দুরদর্শী, যোগ্য, সচেতন ও আল্লাহভীরু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে শূরাঈ পদ্ধতি চালু করা একান্তই অপরিহার্য। কোরআন-সুন্নাহ্ ও খোলাফায়ে রাশেদা কর্তৃক গৃহিত শরঈ সিদ্ধান্তসমূহ বিশেষ কোনো কালের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়– সর্বকালের, যে কোনো স্থানের ও সর্বযুগের জন্য তা প্রযোজ্য ও অনুসরণযোগ্য এবং বিশেষ করে মুসলমানদের অস্তিত্বের স্বার্থেই তা অনুসরণ করা একান্তই অপরিহার্য। পক্ষান্তরে অতীত যুগে ও বর্তমানে মানুষ নিজের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারা প্রয়োগ করে যেসব নীতি-আদর্শ, মতবাদ-মতাদর্শ আবিষ্কার করেছে এবং অনাগত দিনে করবে, তা যদি কোরআন-সুন্নাহ্ ও খোলাফায়ে রাশেদা কর্তৃক অনুসৃত নীতির পরিপন্থী হয়, তাহলে পৃথিবীর যে কোনো স্থানের মুসলমানদের জন্য তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা ফরজ তথা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

ওপরে আলোচিত বিষয়াদীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন প্রয়োজন, অনুরূপভাবে উক্ত বিশ্বাস অনুসারে বাস্তবে পদক্ষেপ গ্রহণ করাও একান্তই অপরিহার্য। এ বিষয়ে বিশ্বের যে কোনো দেশের ও পরিবেশের আলিম-ওলামা, মাশায়েখ, জ্ঞানী-গুণী মুসলমানদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। বরং উল্লেখিত বিষয়ে ঐকমত্যের প্রশ্নে সর্বকালের ও সর্বশ্রেণীর মুসলমান এক অভিন্ন। মুসলিম মিল্লাত, দ্বীন ও ঈমানের স্বার্থে ইসলামের এসব মূলবিষয়াদিতে জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদুদী (রহঃ)-এর সাথে ইসলামের দৃষ্টিতে কারো কোনো মতানৈক্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয় এবং আছে বলে আমি মনেও করিনা। মাওলানা মওদুদী (রহঃ)-এর সাথে অন্যদের যতটুকু মতপার্থক্য রয়েছে তা উল্লেখিত বিষয়াদিতে নয়। আমার এ কথার সবথেকে বড় প্রমাণ হলো, ১৯৫১ সালে ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে গৃহিত ২২ দফা পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি।

তদানীন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৩১ জন দেশ বরেণ্য সুযোগ্য আলেমেদ্বীন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি হিসাবে ২২ দফার ওপর লিখিতভাবে একমত হয়েছিলেন। তদানীন্তন নিখিল পাকিস্তানের ৩১ জন উচ্চ স্তরের আলেমদের তালিকায় আল্লামা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী (রহঃ), মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহঃ), মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী (রহঃ), মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ), মাওলানা আত্হার আলী (রহঃ) ও সারছীনার পীর সাহেব মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (রহঃ) প্রমুখের নামও রয়েছে।

উল্লেখিত বিষয়টি এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, মাওলানা মওদুদী (রহঃ)-এর সাথে ইসলামের উল্লেখিত মূলনীতিতে হক্কানী ওলামা-মাশায়েখদের ঐকমত্য রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে মাওলানা মওদুদী (রহঃ)-এর সাথে গ্রহণযোগ্য কারণে অন্যদের মতপার্থক্য রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে মাওলানার মতামতের সাথে অন্য সকলকেই ঐকমত্য পোষণ করতে হবে, এমন কথা মাওলানা মওদুদী (রহঃ) স্বয়ং নিজেও বলেননি। মাওলানা মওদুদী (রহঃ) স্বয়ং স্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'কোরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক যে কোনো ব্যক্তিরই মতামত গ্রহণ করা জায়েয নয়।' সুতরাং এ ক্ষেত্রে মাওলানা মওদুদীর অন্ধ অনুকরণের প্রশ্নই ওঠে না। তিনি

www.pathagar.com

অন্যত্র তাঁর নিজের মতামত সম্পর্কে লিখেছেন, 'কোনো বিষয়ে তার মতামতের বিপরীতে কেউ যদি উক্ত বিষয়ে অধিক বিশুদ্ধ মতামত রয়েছে বলে জানতে পারেন, তাহলে তা প্রকাশ করে দেয়া তার দায়িত্ব।'

নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্র, নিরশ্বরবাদ, বৈরাগ্যবাদ, সামন্তবাদ, পূজিবাদী গণতন্ত্র, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতা, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতা ও কাদিয়ানী মতবাদ ইত্যাদি মানব রচিত কুফরী মতবাদ-মতাদর্শ সমষ্টির ভিত্তিহীনতা, অসারতা, অবৈজ্ঞানিকতা এবং মানব জাতির জন্য এসব মতবাদের ক্ষতিকর দিকসমূহ বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় মাওলানা মওদুদী (রহঃ) তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সারা দুনিয়ার সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এসব ক্ষেত্রে তার অবদান যেমন অনস্বীকার্য তেমনি অপরিসীম।

অপরদিকে কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামদের সমষ্টিগত দলকর্তৃক গৃহিত ইসলামী জীবন দর্শনই যে, মানব জাতির একমাত্র শেষ অবলম্বন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্যের একমাত্র অপরিহার্য ব্যবস্থা, এ বিষয়টিও তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সর্বাধিক যোগ্যতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। প্রতীচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা কর্তৃক প্রভাবিত মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণীর মানস জগতে ইসলাম সম্পর্কে যে অজ্ঞতা বাসা বেঁধেছিলো, মাওলানা মওদুদী (রহঃ)-এর ক্ষুরধার লেখনী সে অজ্ঞতার জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে আলোর সন্ধান দিয়েছে। মুসলিম মিল্লাতের একজন হিসাবে দাবি করেও যাদের ধারণা ছিলো, বর্তমানে বিজ্ঞানের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীতে কোরআন-সুন্নাহ্ কোনো অবদান রাখতে সক্ষম নয়। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মোকাবেলায় তৃতীয় কোনো অর্থ ব্যবস্থার অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলাম কোনো অবদানই রাখতে সক্ষম নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে ইসলাম কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। পাশ্চাত্যের এসব মানস সন্তানদের ইসলাম সম্পর্কে এসব অমূলক ধারণা মাওলানা মওদুদী (রহঃ)-এর তীক্ষ্ম লেখনীর মাধ্যমেই বিদূরিত হয়েছে। তাঁর লেখনী জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে একদল আলিম ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সচেতন, চিন্তাশীল, জ্ঞানী-গুণী মুসলমানদেরকে জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

www.pathagar.com

আমার এ কথার বাস্তব প্রমাণ হলো, বর্তমানে শুধু বাংলাদেশেই নয়– বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহে, যেখানে পাশ্চাত্য ধাঁচে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। সেসব শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একদল তরুণ-যুবক ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করছে এবং দেশ ও সমাজের বুকে তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে। শুধু শিক্ষাঙ্গনেই নয়– সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক স্তরেই উচ্চ শিক্ষিত থেকে শুরু করে, নিরক্ষর শ্রমজীবীদের মধ্যেও এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, যারা আল্লাহর বিধান নিজেরা অনুসরণ করার চেষ্টা করছে, অপরকে অনুসরণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে এবং সমাজ ও দেশের বুকে তা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জান্-মাল কোরবান করে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এসব লোকদেরকে ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে সমবেত করেছে জামায়াতে ইসলামী। বর্তমানে এ কথাও গোপন নেই যে, জামায়াতে ইসলামীর বিজ্ঞান ভিত্তিক এসব বাস্তব কর্মসূচীর সাথে দেশ-বিদেশের জননন্দিত বহু সুযোগ্য আলিম-ওলামা মাশায়েখগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) একজন স্বনামধন্য বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং উচ্চ পর্যায়ের গবেষক ও মুজ্তাহিদ ছিলেন। তিনি নবী-রাসূল বা কোনো সাহাবীও ছিলেন না। তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বাণীও অবতীর্ণ হতো না। তিনি মানুষ ছিলেন এবং মানুষ হিসাবে তাঁর পক্ষে ভুল করা বা তাঁর দ্বারা ভুল সংঘটিত হওয়াই স্বাভাবিক– বরং না হওয়াই অস্বাভাবিক।

বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ নিয়্যাতের সাথে কোনো মুসলমান ভাইয়ের ভুলের সঠিক সংশোধনী উপস্থাপন করা অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং সওয়াবের কাজ। তবে শত্রুতা বশতঃ কারো কাজকর্ম ও কথা বা বক্তব্যের অপব্যাখ্যা দেয়া, কারো সম্পর্কে ধুম্রজাল সৃষ্টি করা, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে তার নামে মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দেয়া কোরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। যে কোনো ধরনের অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার প্রধান হাতিয়ারটি আঁক্ড়ে ধরে রাখা আমাদের জন্য যেমন মঙ্গল তেমনি তা অপরিহার্য কর্তব্য। আর সেই হাতিয়ারটি হলো, আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির চিন্তা-চেতনা। এ কথা যদি সর্বদা

www.pathagar.com

চিন্তার জগতে জাগরুক রাখা যায় যে, আমরা যা করছি এবং যা বলছি, এসব কিছুরই পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব আল্লাহর আদালতে দিতে হবে, তাহলে আমরা যে কোনো অপরাধ থেকেই মুক্ত থাকতে সক্ষম হবো ইন্‌শাআল্লাহ।

মাওলানা মওদুদী (রহঃ) জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা– এ কথা অবশ্যই সত্য। পক্ষান্তরে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেবল মাত্র কোরআন-সুন্নাহ্ তথা মহান আল্লাহর বিধান ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে– মাওলানা মওদুদী (রহঃ) বা অন্য কারো ব্যক্তিগত মতামত বা চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। সুতরাং যারা জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে অপপ্রচার করে থাকেন যে, 'জামায়াতে ইসলামী মওদুদীবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে বা তারা মওদুদীবাদের অনুসারী' তাদের সম্পর্কে আমি বলবো, জামায়াতে ইসলামীর কর্ম পদ্ধতি, নীতি-আদর্শ ও কর্মসূচীর সাথে তারা অবশ্যই পরিচিত নয়। মওদুদীবাদ নামে কোনো মতবাদ-মতাদর্শের অস্তিত্ব বিশ্বের কোথাও নেই। জামায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই এ ধরনের ধুম্রজাল সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এ সম্পর্কে একটি বিষয়ের অবতারণা না করলে আলোচনা যেনো অপূর্ণ থেকে যাবে। সে বিষয়টি হলো, যারা মাওলানা মওদুদী (রহঃ) কোনো কথা বা লেখা সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই কতিপয় বিষয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচনার সার্বজনীন নীতি থেকে যেমন বিচ্যুত হয়েছেন, তেমনি তাঁর ব্যবহৃত বাক্যাবলী ও শব্দসমূহের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে পথ অবলম্বন না করে ইর্ষার বশবর্তী হয়ে অথবা অজ্ঞতার কারণে অপব্যাখ্যার পথ অবলম্বন করেছেন– যা ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে অবশ্যই অবৈধ ও প্রতারণার শামিল। সর্বাধিক ইনসাফপূর্ণ কথা হলো, সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন যে ক্ষেত্রে সম্মুখে আসবে, সে ক্ষেত্রে সমালোচনা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সে সমালোচনা হতে হবে ইনসাফ ভিত্তিক, যেনো তার ভেতরে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ও কল্যাণ কামনা নিহিত থাকে। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বা কারো প্রতি জনমানসে ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে সমালোচনা করা হবে, তা অবশ্যই পরিতাজ্য এবং এ জাতীয় সমালোচনাকারী অবশ্যই গোনাহ্‌গার হবে।

www.pathagar.com

খেলাফত ওয়া মুলুকিয়াত নামক গ্রন্থের পর্যালোচনা

মাওলান মওদুদী (রাহঃ) কর্তৃক লিখিত 'খেলাফত ওয়া মুলুকিয়াত' নামক গ্রন্থ– যা বাংলা ভাষায় খেলাফত ও রাজতন্ত্র' নামে অনুদিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির কয়েকটি দিক সম্পর্কে কতিপয় সম্মানিত বিজ্ঞ আলিম যেমন আপত্তি উত্থাপন করেছেন অনুরূপভাবে গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রশংসাকারীদের দলও বেশ ভারী। গ্রন্থটিতে আলোচিত যেসব বিষয় সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেসব আপত্তির তথ্য ভিত্তিক জবাবমূলক আরেকটি গ্রন্থ জাস্টিস মালিক গোলাম আলী কর্তৃক রচিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থটির উর্দু নাম 'খিলাফত ওয়া মুলুকিয়াত পর ই'তিরাযাত কা তাজ্‌যিয়াহ্'। গ্রন্থটি 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের ওপর অভিযোগের পর্যালোচনা' নামে বাংলায় অনুদিত হয়েছে।

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) কর্তৃক রচিত 'খেলাফত ওয়া মুলুকিয়াত' নামক গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় হলো, খেলাফত কাকে বলে এবং কোন্ জিনিসের নাম খেলাফত? খেলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কতটুকু পার্থক্য? ইসলামের প্রকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি ছিলো? কখন থেকে এবং কিভাবে ইসলামের প্রকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হলো ও খেলাফত থেকে কখন কিভাবে রাজতন্ত্রের দিকে মোড় নিলো? এই পরিবর্তনের কারণে দ্বিতীয় যে ব্যবস্থা অর্থাৎ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো, তার মধ্যে এবং খেলাফতের মধ্যে কোন্ ধরনের পার্থক্য সূচিত হলো? এরপরে যদিও আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত খেলাফত পরবর্তী রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মেনে নিলেও তা কোন্ অর্থে মেনে নিয়েছিলেন? তাদের পক্ষে এই মেনে নেয়াটা কি কোনো পরিণামদর্শিতার ভিত্তিতে ছিলো, না খেলাফত ও রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে সমভাবে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ইসলামী ব্যবস্থা ছিলো?

খেলাফতে রাশেদার অনুসরণ রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য অপরিহার্য, উপকারী ও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অথবা একনায়কত্ব সাধারণত রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, অশান্তি ও অস্থিরতার উৎপাদক এবং প্রত্যাখ্যাত।

www.pathagar.com

খেলাফতে রাশেদার উপকারিতা ও রাজতান্ত্রিক প্রথার অপকারিতা যে বাস্তব সত্য, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এসব বিষয়সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরাই খেলাফত ওয়া মুলুকিয়াত গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থটি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করলে এ বিষয়টিই অনুভূত হয়। যে ব্যক্তিই ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন তিনি উল্লেখিত প্রশ্নাবলীর মুখোমুখী হন। মাদ্রাসাসমূহের পরিমন্ডলে উল্লেখিত বিষয়সমূহ উপেক্ষা করা হয় বিধায় এর প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। কিন্তু মাদ্রাসাসমূহের পরিমন্ডলের বাইরে বিশাল বিস্তীর্ণ পরিমন্ডলে– যেখানে বর্তমান সময়ে মুসলমানদের সামাজিক ও সামগ্রিক জীবন সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিক সম্পর্কে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ফলাফল প্রদানকারী সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সেখানে উল্লেখিত প্রশ্নাবলীর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর উক্ত গ্রন্থটিতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সার্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

অনেকেই এ কথাটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেননি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আজমাঈনদের সম্মান ও মর্যাদা অথবা তাঁদের পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিবাদ উক্ত গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় নয় এবং সে উদ্দেশ্যেও উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়নি। বরং যেসব বিষয় সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে একটি অপরিহার্য তাত্ত্বিক প্রয়োজনে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এখন যে ব্যক্তিই উল্লেখিত বিষয়সমূহে দ্বিমত পোষণ করবে তাকে অবশ্যই আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে আলোচনা করতেই হবে। আর মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-ই প্রথম ব্যক্তি নন যিনি সাহাবায়ে কেরামদের পারস্পরিক মতভেদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন। অথচ প্রথম হিজরী শতক থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত কোনো না কোনো তাত্ত্বিক প্রয়োজনে বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস, হাদীসের ভাষ্যকারগণ, ফকীহ্গণ, দার্শনিকগণ এবং ইসলামের ইতিহাস রচিয়তিগণ সাহাবায়ে কেরামদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করে আসছেন।

www.pathagar.com

পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও আল বালাগ পত্রিকার সম্পাদক আল্লামা তকী ওসমানী সাহেব একজন মুহাক্কিক আলেমে দ্বীন। তিনি 'খেলাফত ওয়া মুলুকিয়াত' গ্রন্থটির যথা সম্ভব ভারসাম্যমূলক সমালোচনা করেছেন। তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে সমালোচনা করেছেন যেমন, তেমনি গ্রন্থটির প্রশংসনীয় দিকের প্রশংসা করতেও কার্পণ্য করেননি। মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন, 'এটা অবশ্যই সত্য কথা যে, যুগের ভাষায় ইসলামী খেলাফতের নির্ভুল ব্যাখ্যা ও বাস্তব রূপ রেখা তুলে ধরা সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ দাবি। স্বীকার করতে কার্পণ্য নেই যে, এ পর্যায়ে মাওলানা মওদুদী সাহেব তাঁর গ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে বেশ প্রশংসনীয় প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে বর্তমান দাবি পূরণের লক্ষ্যে ঐটুকুই যথেষ্ট ছিলো।'

আল্লামা তকী ওসমানী সাহেব উক্ত গ্রন্থটির প্রথম তিন অধ্যায় সম্পর্কে প্রশংসা করে যা বলেছেন তার অর্থ হলো, ঐ তিন অধ্যায়ই বর্তমান সময়ের দাবি পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিলো– পরবর্তী বর্ধিত আলোচনার প্রয়োজন ছিলো না। এ ক্ষেত্রে আমাদের মতামত হলো, মানব জীবনে ইসলামী বিধি-বিধানের অপরিহার্যতা, প্রয়োজনীয়তা, কল্যাণকারীতা, উপকারিতা ও অন্যান্য ব্যবস্থার মোকাবেলায় ইসলামী জীবন বিধানের প্রাধান্য প্রমাণে ও প্রতিষ্ঠায় মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) তাঁর দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন। অপরদিকে মাওলানার মতামতের সাথে যাঁরা একমত পোষণ করেন না, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইসলামের বিধি-বিধানের প্রয়োজনীয়তা, অপরিহার্যতা, উপকারিতা, কল্যাণকারীতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এভাবে বিশুদ্ধ নিয়্যাতের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাস, বিধি-বিধান ও অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনা, গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা, পর্যালোচনা অবশ্যই ইসলামের পবিত্রতা, পরিপূর্ণতা, নির্ভরশীলতা ও সততা রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

এই কাজে যারা মূল্যবান সময় ব্যয় করেন, শ্রম দিতে থাকেন, জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি প্রয়োগ করে লিখেন, তাঁদের এই ত্যাগ ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের প্রতি তাঁদের কল্যাণ কামনা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতারই প্রমাণ বহন করে। তবে এই বিরাট দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করতে গিয়ে কারো পক্ষে যেমন ভুল করা অসম্ভব নয়, অনুরূপভাবে সে ভুলের সংশোধনও করা যেতে পারে। অতীতকালেও স্বনাম ধন্য ইসলামী চিন্তাবিদগণের দ্বারা এমন ভুল সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এই ধরনের ভুলকে হটকারিতা বলার কোনো অবকাশ নেই।

খেলাফত ওয়া মুলুকিয়াত গ্রন্থে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তাঁর সাথে যেসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার কতিপয় অংশ কারো কারো কাছে বিতর্কিত ও ভুল বলে বিবেচিত হতে পারে– এটা দোষের কিছু নয়। কারণ ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে যাঁরা মতামত প্রদান করেন, তাঁরা কখনোই মতৈক্যে পৌঁছতে সক্ষম হন না এবং হওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং এসব ভুলের নির্ভরশীল যথার্থ সংশোধনী আসাটাই বাঞ্ছনীয়। তবে এ কথা উল্লেখ করা একান্তই প্রয়োজন যে, ঐতিহাসিক ভুলের শিকার হওয়া আর কোনো সাহাবীর প্রতি বিদ্বেষ তথা শত্রুতা প্রসূত মনোভাব নিয়ে তাঁর প্রতি কটাক্ষ করা সমপর্যায়ের কথা নয়।

www.pathagar.com

আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি?

অতীতের যে কোনো যুগের তুলনায় বর্তমান যুগে কুফ্‌রী মতবাদের আধিক্য অত্যন্ত প্রবল। ভোগবাদী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক জীবন দর্শন, ধর্মহীন গনতন্ত্র, সামন্তবাদ, নিরশ্বরবাদ, বৈরাগ্যবাদ, ত্রিত্ববাদ সর্বোপরি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ– এসব মতবাদসমূহ মৌলিক দিক থেকে কোরআন ও সুন্নাহর সাথে চরম সাংঘর্ষিক। সারা দুনিয়ার সমস্ত মুহাক্কিক আলেমে দ্বীন এসব মতবাদকে কুফুরী মতবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামী বিরোধী এসব মতবাদসমূহ পুরোপুরি অথবা আংশিক অনুসরণ করতে গেলে মুসলমানদের ঈমান সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়বে। অথচ অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহে উল্লেখিত মতবাদসমূহ মুসলিম নামধারী নেতা-নেত্রীরা মুসলিম জনগণের ওপরে চাপিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে, কোথাও বা রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে উক্ত মতবাদসমূহ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব মতবাদসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করতে গেলে কোরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রামাণ্য ইসলামের অধিকাংশ বিধি-বিধানকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়– যা কোনো মুসলমানের পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকিদা, চিন্তা-চেতনা ও কর্মের বিরোধী উক্ত মতবাদসমূহ ইসলামী জিন্দেগীর স্বার্থেই মুসলমানদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ইসলামের বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনাচারের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকার প্রয়োজনেই মুসলমানদেরকে এমন ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক বিভাগ ও স্তরে কোরআন-সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক বিধি-বিধান নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা যাবে। যে রাষ্ট্র ও সমাজে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধের প্রতি আনুগত্য করার যথাযথ সুযোগ পাবে এবং এ পথেই মানুষের পৃথিবী ও আখিরাতে মুক্তির পথ সুগম হবে। এই রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরকিগণও মুসলিম নাগরিকগণের অনুরূপ তাদের ধর্মীয় অধিকারসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার সমভাবে ভোগ করবে।

www.pathagar.com

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করবে। তারা তাদের প্রাণ, ধন-সম্পদ, ইজ্জত ও আব্রুর সম্মান ও মর্যাদার পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। কেউ তাদের জান-মাল ও সম্মান-মর্যাদার প্রতি সামান্যতম কটাক্ষ করতে পারবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'কোনো মুসলিম যদি কোনো অমুসলিমের প্রতি জুলুম করে তাহলে আমি কিয়ামতের ময়দানে আদালতে আখিরাতে সেই মুসলিমের বিরুদ্ধে অমুসলিমের পক্ষে আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবো।' অমুসলিমগণ পূর্ণ শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার সাথে কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্রে বসবাস করবে এবং তাদের যাবতীয় অধিকার তারা ভোগ করবে। এর বাস্তব প্রমাণ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্র ও সমাজের প্রামাণ্য ইতিহাস।

এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি আর রাষ্ট্রের সামান্য একজন নাগরিকের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন মুসলিম জাহানের খলীফার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত, সে সময় তিনি একদিন সরকারী একটি অফিস পরিদর্শনে গেলেন। সেই অফিসে এক খৃষ্টান যুবক কর্মরত ছিলো। যুবকটি খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে তার চাকরী ক্ষেত্রে প্রমোশনের জন্য খলীফার কাছে আবেদন পত্র পেশ করেছিলো। বেশ কয়েকদিন পর ঘটনাক্রমে ঐ খৃষ্টান যুবকের সাথে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ হলে যুবকটি খলীফাকে নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানালো, 'সম্মানিত খলীফা! আমি সেই খৃষ্টান যুবক, আপনার কাছে আমি আমার চাকরীতে প্রমোশনের জন্য আবেদন করেছিলাম।' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও স্বহাস্যে যুবককে উত্তর দিলেন, 'ওহে যুবক! আমি ওমরও সেই মুসলমান, তোমার আবেদন পত্র আমি যথাস্থানে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সাথে সাথে প্রেরণ করেছি। তুমি তোমার প্রাপ্য বুঝে পাবে।'

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা স্বয়ং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ঢাল হারিয়ে গেলো। তিনি অভিযুক্ত করলেন রাষ্ট্রের এক অমুসলিম নাগরিক ইয়াহুদীকে। খলীফা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আদালত খলীফাকে

www.pathagar.com

স্বশরীরে আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন পাঠালো। বাদী-বিবাদী আদালতে উপস্থিত হলে আদালত উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। প্রমাণের অভাবে আদালত খলীফা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাটি খারিজ করে দিয়েছিলেন। উপলব্ধি করার বিষয়, বাদী ছিলেন ইসলামী জাহানের স্বয়ং খলীফা আর বিবাদী ছিলেন সেই রাষ্ট্রের একজন অমুসলিম নাগরিক। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক শাসিত রাষ্ট্র ও সমাজে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সেসব ঘটনা ইতিহাসের পাতায় সোনালী অক্ষরে দেদিপ্যমান রয়েছে।

এই ধরনের একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এককভাবে কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সংগঠনের। দেশ ও সমাজের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সেই আদর্শবাদী সংগঠনের পক্ষেই সম্ভব কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বস্তরের জনশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা। আর সেই সংগঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এমন একটি গঠনতন্ত্র প্রয়োজন, যে গঠনতন্ত্রের আলোকে গোটা সংগঠন নিয়মতান্ত্রিকভাবে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত করবে। সংগঠনের প্রত্যেক স্তরে আদর্শিক প্রশিক্ষণ, সকল স্তরের জনশক্তির মধ্যে আদর্শ অনুসরণের নিষ্ঠা, আদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সেই সাথে সংগঠনের আওতায় রাষ্ট্র ও সমাজ দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার বাস্তবসম্মত কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আল্লাহর শোকর, এই ধরনের গঠনমূলক পন্থায় একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 'জামায়াতে ইসলামী' অস্তিত্ব লাভ করেছিলো। কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের মতামত, আদর্শ, উদ্দেশ্য, নেতৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামদের সমষ্টিগত দলের নিয়ম-নীতি, কর্মপদ্ধতি তথা খেলাফতে রাশেদাকে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করার মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে।

www.pathagar.com

কোরআন-সুন্নাহর নিরিখে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমিও আমার যাবতীয় যোগ্যতা ও ধন-সম্পদকে ব্যয় করে পরকালে নিজের মুক্তির পথ সুগম করতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। এই লক্ষ্যেই আমি জামায়াতে ইসলামীর কর্মকান্ডের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছি এবং আমার যোগ্যতা অনুসারে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে যাচ্ছি।

জামায়াতে ইসলামীর পরিমন্ডলে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধানের বাস্তবায়নই একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। কোরআন ও সুন্নাহর বাস্তবরূপ হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের জীবনাদর্শ। এ ক্ষেত্রে আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসৃত আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপন্থা বিশেষ কোনো কালের গন্ডীতে আবদ্ধ নয়– বরং তা সার্বজনীন এবং সর্বকালের, সব যুগের ও বিশ্বের যে কেনো স্থানের মুসলমানদের ইসলামী জিন্দেগীর একমাত্র সঠিক পাথেয়–এ বিষয়ে কারো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

আর ইসলামী জিন্দেগী বলতে শুধুমাত্র নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত ও কোরআন তিলাওয়াত করাকেই বুঝায় না। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগ ও স্তরে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করাকেই ইসলামী জিন্দেগী বলা হয়। আর ইসলামী জিন্দেগীর মূলভিত্তিই হলো কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর 'আল ফিক্‌হুল আকবার' এবং ইমাম আবু জাফর আহ্‌মদ ইবনে মুহাম্মদ তাহাবী (রাহঃ) কর্তৃক সম্পাদিত 'আকীদাতুত্তাহাবী' সারা বিশ্বের সকল শ্রেণীর আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতপন্থী ওলামা-মাশায়েখগণের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নির্ভরশীল। বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনে উল্লেখিত দুটো কিতাব খুবই সহায়ক। এখানে প্রাসঙ্গিক কারণেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতামতের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো মতামত অবলম্বন করতে

www.pathagar.com

যাওয়া চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ারই নামান্তর। আমার এসব চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাসের সাথে জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচীর মৌলিক কোনো বৈপরিত্ব রয়েছে বলে আমি মনে করি না।

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহঃ) জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা– এটা কোনো গোপন বিষয় নয়। পক্ষান্তরে তাঁকে ইমাম হিসাবে অনুসরণ করতে হবে বা মানতে হবে, অথবা তাঁর যে কোনো মতামতকেই প্রাধান্য দিতে হবে, তাঁর সর্বপ্রকার চিন্তা-চেতনাকে জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ ও উদ্দেশ্যে পরিণত করতে হবে, এমন কোনো কথা জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে নেই। বরং কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এটাই যে জামায়াতে ইসলামীর মূল উদ্দেশ্যে– এ কথাই জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। **'আপনি যদি নিজেকে সত্যকারের একজন আল্লাহর গোলাম হিসাবে গড়তে ইচ্ছুক হন, তাহলে আপনার চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মকান্ড থেকে ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস ও কর্মকান্ড পরিহার করুন'**– এ কথার দিকেই জামায়াতে ইসলামী মানুষকে আহ্বান জানিয়ে আসছে।

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) তাঁর গোটা জীবনকালই ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের খেদমতে নিয়োজিত রেখেছিলেন। খত্‌মে নবুওয়্যাতের প্রশ্নে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন আপোষহীন। খত্‌মে নবুওয়্যাতের পক্ষে ও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করার কারণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করেছিলো এবং বিচারের নামে প্রহসন করে তাঁর প্রতি ফাঁসির আদেশ জারী করেছিলো। কিন্তু খত্‌মে নবুওয়্যাতের ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাসে সামান্যতম ফাটল্ ধরানো সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে সরকার তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানালে তিনি ঘৃণাভরে সরকারের সে অনুকম্পা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর সন্তান কারাগারে তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়ে

www.pathagar.com

বিচলিত হয়ে পড়লে তিনি কলিজার টুকরা সন্তানকে দৃঢ়কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, **'বাবা! বিচলিত হোয়ো না, মৃত্যুর ফায়সালা আসমানে হয়– যমীনে হয় না।'** খত্‌মে নবুওয়্যাতের ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় আকীদা-বিশ্বাস, মতামত ও বক্তব্যে তিনি ছিলেন অনঢ়। মহান আল্লাহর অসীম রহমতে সরকার পরবর্তীতে ফাঁসীর আদেশ কার্যকর করতে সাহসী হয়নি।

সৌদী আরবের বাদশাহ ফায়সাল মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর হাতে কা'বা শরীফের গিলাফ উঠিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি নিজ হাতে সে গিলাফ কা'বা ঘরে পরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালে গোটা মুসলিম জাহান শোকার্ত হয়ে পড়েছিলো। মক্কা ও মদীনা শরীফের উভয় হারাম শরীফেই তাঁর উদ্দেশ্যে গায়েবানা নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং আমি নিজে মক্কা শরীফে মসজিদে হারামের উক্ত নামাযে জানাযায় শরীক ছিলাম। মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর প্রতি এ ধরনের দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদা তাঁর দ্বীনি খেদমতেরই স্বীকৃতি। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন আওলাদে রাসূল– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর। তিনি তাঁর গোটা জীবনকাল কোরআন-সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ চিন্তায় অতিবাহিত করেছেন। কুফ্‌রী মতবাদ-মতাদর্শের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম মুখর ছিলেন বিধায় তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষন করা আল্লাহর রাসূলের হাদীসের খেলাফ কাজ। এসব দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তাঁর সুমহান কর্মের প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ সৌদী আরবসহ আরব দেশসমূহের নেতৃস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও ওলামা-মাশায়েখগণ তাঁর সাথে খুবই সম্মানসূচক ব্যবহার করেছেন।

পৃথিবীতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলামের বিপরীতে যতগুলো মতবাদ-মতাদর্শ আবিষ্কৃত হয়েছে, এসব মতবাদের প্রভাবে প্রায় মুসলিম দেশেরই বিরাট সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠী কোরআন-সুন্নাহর বিধান থেকে দূরে সরে গিয়েছে। পাশ্চাত্যের জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়া ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত বিরাট সংখ্যক মুসলিম জনতা পূজিবাদী জীবন দর্শন ও নাস্তিক্যবাদী জীবন দর্শনের প্রভাবে মনে করেছে, ইসলাম শুধু মাত্র ধর্ম বিশেষ এবং ইসলামের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সভ্যতা-সংস্কৃতিক ও অন্যান্য দিকের কোনো সমাধানই নেই। এমনকি অন্যান্য মতবাদ-মতাদর্শের তুলনায় ইসলাম উন্নত কোনো ব্যবস্থা

www.pathagar.com

বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করতে পারেনি। ফলে তারা ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়েছে এবং নিজেকে মুসলমান হিসাবে দাবি করেও ইসলামের বিরুদ্ধে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর ক্ষুরধার লেখনী ইসলামী চিন্তা-চেতনা বিরোধী মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসেই শুধু নয়– অমুসলিম চিন্তাবিদদের মন-মানসেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ কথা তারা অনুভব করছে এবং স্বীকার করতেও বাধ্য হয়েছে যে, ইসলাম শুধুমাত্র একটিা ধর্মের নাম নয়– ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, অন্যান্য মতবাদ ও মতাদর্শ জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি পেশ করেছে, তা ইসলাম কর্তৃক প্রদর্শিত নিয়ম-নীতির তুলনায় একান্তই হীন, নগণ্য ও মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী ধর্মহীন গনতন্ত্র, প্রতীচ্যের নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন ব্যবস্থা ইত্যাদি মতবাদগুলো যে মানব জাতির জন্য একান্তই ক্ষতি ও অকল্যাণকর, ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর এবং এসব মতবাদের মোকাবেলায় ইসলামই যে মানবতার একমাত্র মুক্তির সনদ, এ বিষয়টি মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) অকাট্য যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের সামনে উপস্থান করেছেন– এ কথাগুলো তাঁর সাথে মতপার্থক্য রয়েছে, এমন জ্ঞানী-গুণী, চিন্তাবিদ ও গবেষকগণও স্বীকার করতে কার্পণ্যতা প্রদর্শন করেননি।

তবে একটি বিষয় আমাদেরকে স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) আমাদের অনুরূপ একজন মানুষই ছিলেন। তিনি নবী-রাসূল, সাহাবী, তাবেঈ, তাবেতাবেঈ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও পর্যালোচক। তিনি তাঁর গোটা জীবনকালই ইসলামের খেদমতে ব্যয় করতে গিয়ে বহু কাজ করেছেন, বহু কিছু লিখেছেন এবং অসংখ্য স্থানে বক্তৃতা পেশ করেছেন। কাজ যারা করে তাদের দ্বারাই ভুল সংঘটিত হয়। সুতরাং তাঁর অসংখ্য কাজ ও কথা এবং লেখনীর মধ্যে যে কোনো ভুল হয়নি, এমন কথা চিন্তা করাও মারাত্মক ভুল। বরং তাঁর ভুলের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা ও ভুলের ব্যাপারে

www.pathagar.com

পক্ষপাতিত্ব করাটাও ভুল। আবার তাঁর সাথে শত্রুতামূলক মনোবৃত্তি পোষণ করে তাঁর ভালো কর্মসমূহের বিরোধিতা করা এবং তাঁর সোজা কথাকে বক্রতার দৃষ্টিতে দেখা ও অপব্যাখ্যা করাও মহা অন্যায়।

আমি পুনরায় এ কথা উল্লেখ করছি যে, কোনো ব্যক্তির আদর্শ, চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কোরআন-সুন্নাহ্ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই জামায়াতে ইসলামীর যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা। বর্তমানে পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতি, দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পদক্ষেপ জামায়াতে ইসলামী নিয়ে থাকে, সেটাও উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যেই। সুতরাং জামায়াতে ইসলামীর যাবতীয় কর্মতৎপরতার মূলে নিহিত রয়েছে কোরআন-সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্য। এসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মতৎপরতার সাথে আমি ঐকমত্য পোষন করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি, সামর্থ, যোগ্যতা-মেধা ও শ্রম ব্যয় করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছি।

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম- প্রধান তিনটি উপাদান

প্রথম উপাদান ঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাওহীদ তথা একত্ববাদ এবং ইসলামী শরীআতের বিধি-বিধানের কল্যাণকারিতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে প্রচেষ্টাসমূহ গ্রহণ করা হয়, এক কথায় তাকেই জিহাদ বলা যায়। এই জিহাদে যারা লিপ্ত থাকে, তারাই মুজাহিদ। এই পথে অগ্রসর মান ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার প্রশ্নটি দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে সফলতা অর্জনের অন্যতম শর্ত। এ কারণে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী মুজাহিদদের জন্য কোরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যেমন একান্ত প্রয়োজন, অনুরূপভাবে শরীয়াতের বিধি-বিধান কঠোরভাবে পালন করাও তাদের জন্য অপরিহার্য। দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী মুজাহিদগণ যে লক্ষ্যে জিহাদ করবে এবং যে আদর্শের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাবে, সেই আদর্শ সর্বপ্রথমে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। শরীয়াতের বিধি-বিধান তাদেরকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ -

তোমরা অন্য লোকদেরকে তো ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাকো। (সূরা বাকারা-৪৪) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির জীবন বিধান হিসাবে যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেই কিতাবের বিধি-বিধান সর্বপ্রথম নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে এবং সেই সাথে কিতাবের বিধি-বিধান সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চূড়ান্ত জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে। আর এই জিহাদে তখনই কামিয়াব হওয়া যাবে, যখন জিহাদের লিপ্ত মুজাহিদগণের ঈমান ও আকীদা হবে বিশুদ্ধ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ-

তোমরা ভীতগ্রস্ত হোয়ো না, চিন্তাগ্রস্ত হোয়ো না-জয় পরাজয়ের দুশ্চিন্তা করো না, তোমাদের বিজয় অনিবার্য, যদি তোমরা ঈমানদার তথা মুমিন হও। (কোরআন)

www.pathagar.com

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে যারা লিপ্ত সেই সব মুজাহিদদের জন্য সফলতা অর্জনের প্রধান উপকরণের কথাটি মহান আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। সেই প্রধান উপকরণটি হলো, মুজাহিদদের সর্বাঙ্গ ঈমানের বর্মে আবৃত হতে হবে। ঈমানের দাবি অনুসারে যেমন চরিত্র গঠন করা প্রয়োজন, অনুরূপ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী–সূরা আসরের তাফসীর পাঠ করুন।) এই পথে বিজয় অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হলো ঈমান অর্থাৎ মুজাহিদকে পূর্ণ মুমিন হতে হবে। একজন মুমিনের চরিত্রের যে চিত্র কোরআনে অঙ্কন করা হয়েছে, সেই চিত্রে আল্লাহর পথের মুজাহিদকে চিত্রিত হতে হবে। তবেই তার পক্ষে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে। সেই সাথে এ কথা স্পষ্টভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, কোরআন যে চরিত্রের চিত্র পেশ করেছে, সেই চরিত্রের বাস্তব নমুনা হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন।

তাঁদের জীবনাদর্শ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হলেই নিশ্চিতভাবে মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ করা যাবে। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন, 'নিশীত রাতে তাঁদেরকে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যেনো দুনিয়ার সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্কই নেই এবং নামাজ আদায়, কোরআন তিলাওয়াত ও তাস্‌বীহ তিলাওয়াত ব্যতীত তাঁদের দ্বিতীয় কোনো কাজই নেই। আর দিনের আলোয় তাঁদেরকে দেখলে দেখতে পাবে তাঁরা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন। মনে হবে যেনো এটাই তাঁদের একমাত্র কাজ। তাঁরা শ্রেষ্ঠতম ও নিপুণভাবে অস্ত্র নিক্ষেপকারী, অস্ত্র পরিচালনায় তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। আল্লাহ তা'য়ালার স্মরণে তাঁরা এমন মগ্ন যে, তাঁদের মজলিশে অন্যের কণ্ঠ শোনা বড়ই দুষ্কর। তাঁরা নিজেদের বিজিত এলাকায়ও মূল্য দিয়ে জিনিস ক্রয় করে এবং কোথাও প্রবেশ করতে হলে সর্বাগ্রে সালাম জানায়।' এটাই ছিলো সাহাবায়ে কেরামদের বৈশিষ্ট্য এবং এ পথেই তাঁরা মুসলিম মিল্লাতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় উপাদান ঃ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের দ্বিতীয় উপাদান হলো মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বর্তমান থাকতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

www.pathagar.com

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لاَ تَفَرَّقُوْا-

তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধরো আর তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা ইমরাণ-১০৩)

ইসলামকে মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতে 'রজ্জু' বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলামকে এ জন্যই রজ্জু বলা হয়েছে যে, এই ইসলামের মাধ্যমেই একদিকে আল্লাহর সাথে ঈমানদার লোকদের সম্পর্ক স্থাপন করা হয় এবং অপরদিকে সমস্ত ঈমানদার লোকদেরকে পরস্পর একত্রিত ও মিলিত করে একটি শক্তিশালী সমাজ-সংগঠন সৃষ্টি করা হয়। এই 'রজ্জু'কে শক্ত করে ধারণ করার অর্থ হলো, মুসলমানদের দৃষ্টিতে মৌলিক গুরুত্ব ইসলামী জীবন বিধানেরই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাদের যাবতীয় আগ্রহ-উৎসাহ ও কৌতুহল এই ইসলামের প্রতিই হওয়া উচিত। একেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের চেষ্টানুবর্তী হওয়া উচিত এবং এরই খেদমতের জন্য পরস্পরের মধ্যে গভীর সহযোগিতা হওয়া কর্তব্য। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং একে প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র লক্ষ্য থেকে যখনই মুসলমান বিচ্যুত হবে এবং খুঁটিনাটি ও নগণ্য বিষয়ের দিকেই যখন তাদের দৃষ্টি ও লক্ষ্য আরোপিত হবে, তখনই তাদের মধ্যে ঠিক সেইভাবে বিভেদ-বিচ্ছেদ ও মতবৈষম্য দেখা দিবে, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের মধ্যে দেখা দিয়েছিলো এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত জীবন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম লাঞ্ছনা ও বিপর্যয়ের মধ্যে নিমজ্জিত করেছিলো।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যকে শক্তিশালী ও উন্নত রাখার জন্য এমন সব বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন– যেসব গর্হিত বিষয়াদি মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বে ও ঐক্যে ফাটল ধরানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কেউ যদি কোরআনের আয়াতকে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী হয় এবং ইসলামের কোনো বিধান রহিত করণ বা বিকৃত করণের পক্ষে তৎপর থাকে, তাহলে তাদের সাথে কোনোক্রমেই ঐক্য সম্ভব হতে পারে না। বরং ইসলামী ঐক্য হতে হবে কোরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই।

www.pathagar.com

তৃতীয় উপাদান ঃ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে তৃতীয় যে উপাদানের কথা মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন তাহলো, ইসলাম বিরোধিদের মোকাবেলা করার শক্তি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ–

আর তোমরা যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণ শক্তিমত্তা ও সদাসজ্জিত ঘোড়া তাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করে রাখো। (সূরা আনফাল-৬০)

এখানে উল্লেখ্য যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো, সে সময়ে ইসলাম বিরোধিদের সাথে যে সরঞ্জাম নিয়ে মোকাবেলা করার প্রয়োজন ছিলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেসব সরঞ্জামের কথাই উক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানেও যদি ইসলামের দুশমনদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেই হয়, তাহলে মুসলমানদেরকেও বর্তমান যুগপোযোগী সমরাস্ত্রেই সজ্জিত হতে হবে। সেই সাথে দুশমনরা যেদিক থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর আক্রমন চালাবে, অর্থাৎ রাজনৈতিক অঙ্গনে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, শিল্প, সভ্যতা-সংস্কৃতি, কবিতা-সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও মুসলমানদেরকে শক্তিশালী হতে হবে। সর্বোপরি জনশক্তি বর্তমানে একটি স্বীকৃত বিরাট শক্তি। এই শক্তিকে জিহাদের ময়দানে সফলতা অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসাবে যথাযথ পন্থায় প্রয়োগ করতে হবে এবং এ পথে যেনো কোনো বাধার সৃষ্টি না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সংঘটিত এক যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে কুযমান নামক এক অমুসলিম ব্যক্তি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিলো। বিষয়টি আল্লাহর রাসূল জানতে পেরেও উক্ত ব্যক্তিকে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করা থেকে বিরত করেননি। সে যুগে ইগমান নামক একজন মুসলমান মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলো। অনেক চেষ্টা করেও তাকে মদ্যপান থেকে বিরত রাখা যায়নি। অবশেষে মদ্যপান থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য বন্দী করে রাখা হলো। কিন্তু যখন সে জানতে পারলে, মুসলমান আর কাফিরদের মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়েছে। উক্ত ব্যক্তি পালিয়ে গিয়ে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো। আল্লাহর রাসূল বিষয়টি

www.pathagar.com

জানতে পেরে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ঈমানদার মুসলমান যদি কোনো গোনাহে জড়িত হয়ে পড়ে, তাহলে তার সৎকর্মসমূহ তার গোনাহ্ মুছে দেয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- •

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ-

নিশ্চয়ই মুমিন বান্দার নেক কাজসমূহ তার গোনাহ্সমূহকে মুছে দেয়। (সূরা হূদ-১১৪)

এ ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদদের সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে সীমালঙ্ঘনকারী ফাসিক মুসলমান বা গোনাহ্গার মুসলমানও অংশগ্রহণ করবে- এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াতে আইনগত কোনো বাধা নেই। তারা অবশ্যই জিহাদে অংশগ্রহণ করবে এবং কারো পক্ষে তাকে বাধা দেয়ার আইনগত কোনো ভিত্তি নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শিরক্, কুফর ও আল্লাহদ্রোহিতার বিরুদ্ধে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব। (প্রয়োজন হলে) জিহাদ পরিচালনাকারী প্রত্যেকটি আমীর বা নেতার সাথী হয়ে জিহাদ করতেই হবে। আমীর সৎকর্মশীল হোক অথবা অসৎকর্মশীল হোক, আমীরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাধ্যানুযায়ী জিহাদে যোগ দিতেই হবে। (আবু দাউদ-কিতাবুল জিহাদ)

সৎকাজের মধ্যে জিহাদের মর্যাদা সর্বোচ্চে। সুতরাং এই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারী নেতা বা অন্যান্যদের ভুলত্রুটি, ছোটোখাটো মন্দকর্ম, খারাপ গুণাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনায় লিপ্ত হয়ে পড়লে জিহাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। অপরের সমালোচনা করার মনোভাব আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে দিবে না এবং কর্মে উদ্যোমহীন পড়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। সুতরাং জিহাদের ময়দানে নেতা বা অন্যান্য সাথীদের ব্যক্তিগত দোষত্রুটি অনুসন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত না করাই জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তা অর্জনের পক্ষে সহায়ক হয়ে থাকে। নিজেদের মধ্যে যদি পরস্পর পরস্পরের দোষত্রুটি অনুসন্ধানে যদি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে ঐক্যে যেমন ফাটল ধরবে, অনুরূপভাবে আনুগত্যের ক্ষেত্রেও প্রশ্নের সৃষ্টি হবে। আর জিহাদের ময়দানে এই ধরনের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

www.pathagar.com

সফলতার পরিবর্তে শোচনীয় ব্যর্থতার সম্মুখিন হতে হবে। এই জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ জারি করেছেন।

তওবা করে নিজেকে সৎকাজে নিয়োজিত করলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা গোনাহ্গার ব্যক্তির গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানে গোনাহ্গারদের মনে আশাবাদ সৃষ্টি করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মৃত ব্যক্তির জানাযা নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে বের হবার পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এই লোকটির জানাযা নামাজ আদায় করবে না। কারণ লোকটি অপরাধী।'

আল্লাহর রাসূল এ কথা শুনে লোকটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, লোকটি একদিন রাত জেগে জিহাদে নিয়োজিত মুজাহিদ মুসলমানদের শিবির প্রহরা দিয়েছিলো। এরপর আল্লাহর রাসূল সেই লোকটির জানাযা নামাজ আদায় করলেন।

জানাযা শেষ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত লোকটির উদ্দেশ্যে মধুর কণ্ঠে বললেন, 'তোমার সঙ্গী-সাথীরা বলছে তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্গত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই তুমি জান্নাতীদের অন্তর্ভূক্ত।'

এরপর তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর দিকে দৃষ্টি দিয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'হে ওমর! তোমাকে অন্য মানুষের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। তোমাকে প্রশ্ন করা হবে তোমার নিজের ঈমান-আমল সম্পর্কে। (অর্থাৎ তুমি অন্যের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করতে যেয়ো না।)

উল্লেখিত হাদীসে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে। একনিষ্ঠ নিয়্যাতের সাথে কোনো গোনাহ্গার মুসলমান যদি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে কোনো খেদমত আঞ্জাম দেয়, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গোনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন, এই হাদীস তার প্রমাণ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করতে হলে কোরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী শরীয়াতের ছোটো-বড় প্রত্যেকটি বিধি-বিধান আন্তরিকতার সাথে মেনে নিতে হবে এবং সাধ্যানূযায়ী কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে হবে। কোনো বিষয়কে ক্ষুদ্র মনে

www.pathagar.com

করে তার প্রতি অবজ্ঞা বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যাবে না। শরীয়াতের অকাট্যভাবে প্রমাণ্য কোনো বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা অথবা বিরোধিতা করা অবশ্যই কুফরীর শামিল হবে। মুসলমান ব্যক্তি গোনাহ্গার হলে তার সাথে সৎকাজে সহযোগিতা করা বা অংশগ্রহণ করা না জায়েয নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى–وَلاَ تُعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ–

সৎকাজে ও পরহেযগারীর কাজে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করবে। পক্ষান্তরে গোনাহ্ ও সীমালংঘনমূলক অপরাধ জনিত বিষয়াদিতে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো না। (সূরা মায়িদাহ্-২)

মদ্যপানকারী ব্যক্তি অবশ্যই গোনাহ্গার, কিন্তু তার সাথে একই মসজিদে বা একই জামাআতে নামায আদায় করা শরীআতের দৃষ্টিতে অবৈধ বা না জায়েয নয়– বরং অবৈধ মনে করাই ভুল। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নেও সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে নিজ নিজ অবস্থানে অবস্থান করেও অভিন্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হতে ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে আইনগত কোনো বাধা নেই। বরং এ ধরনে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা মুসলিম মিল্লাতের জাতীয় ও আদর্শগত অস্তিত্বের স্বার্থে একান্তই প্রয়োজন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে সহজ-সরল ও সঠিক জ্ঞান দান করুন। আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াতের যথাযথ আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিন এবং তাঁর দেয়া বিধি-বিধান অনুসরণ করার তাওফিক দিন।

www.pathagar.com

ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত

যে কোনো ক্ষেত্রেই শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো ইনসাফ। দেশ ও সমাজের সকল অধিবাসী দায়িত্ব সচেতন হয়ে যথাযথভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করবে এবং অধিকারী তার অধিকার সঠিকভাবে বুঝে পাবে। কেউ কারো অধিকার হরণ করবে না এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিজ নিজ প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। একে অন্যের কোনো ক্ষতি করা দূরে থাক, ক্ষতি করার চিন্তাও মাথায় স্থান দেবে না– আর এভাবেই সর্বস্তরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ–

আমি আমার রাসূলগণকে দলীল-প্রমাণ সহকারে প্রেরণ করেছি, আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নির্ধারণকারী বিধি-বিধানের মানদন্ড– যেনো মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদ-২৫)

ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দুটো পূর্বশর্ত রয়েছে। এ দুটো পূর্বশর্তের অনুপস্থিতিতে ইনসাফের যথাযথ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্তের প্রথম শর্তটি হলো– ইনসাফ সম্পর্কে সম্যক ও সঠিক জ্ঞান বর্তমান থাকতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্তটি হলো– ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-বিধান অবলম্বনে বাধ্য-বাধকতা।

মানুষের জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা অতি সামান্য ও সীমিত। মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টি শক্তি প্রয়োগ করে বর্তমান সম্পর্কে যে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়, অনাগত দিন তথা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে পরিমাণ নির্ভুল ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। মানুষ তার নিকটতমত পরিবেশকে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়, এর মোকাবেলায় ভবিষ্যতের গর্ভে লুকায়িত পরিবেশ বা দূরতম অদেখা পরিবেশকে সে তুলনায় হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় না। যদিও কেউ কেউ তা অনুমান করে অনুভব

www.pathagar.com

করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু তার অনুভূতি সব সময় তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে না। এর কারণ হলো মানুষের জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি অপূর্ণ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً–

তোমরা অতি সামান্যই জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করেছো। (সূরা বনী ইসরাঈল)

কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিতে গেলে সে বিষয়বস্তুর আদি ও অন্ত এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিক সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান বর্তমান থাকতে হবে। মানুষের জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধির পরিধি অত্যন্ত ক্ষুদ্র আর সে তুলনায় মহান আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ ও তার পরিধি বিশাল বিস্তীর্ণ। সুতরাং মানুষের চিন্তাধারা প্রয়োগ করে তার পক্ষে এই বিশাল পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির সাথে ইনসাফ করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ এই বিশাল পৃথিবীর সব ধরনের সৃষ্টির প্রতি ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য ইনসাফের মাপকাঠিও হতে বিশাল-ব্যাপক, সার্বজনীন ও সর্বযুগ বা কালের জন্য প্রযোজ্য। বিশাল পৃথিবীর আদি-অন্ত, প্রকাশ্য-গোপন, অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, পৃথিবীর সৃষ্টিসমূহের কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রবৃত্তি-স্বভাব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয় বিধায় তাদের পক্ষে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি ইনসাফ করাও সম্ভব নয়। সমস্ত সৃষ্টির যাবতীয় প্রবণতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে তাদের প্রতি ইনসাফ কেবল তিনিই করতে সক্ষম, যিনি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

আল্লাহ তা'য়ালা এই মহাবিশ্ব ও এর ভেতরে ও বাইরে যা কিছু রয়েছে, তার সমস্ত কিছুরই স্রষ্টা ও পালনকর্তা। তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য যে সিদ্ধান্ত ও নিয়ম-নীতি কার্যকর করেছেন, করছেন ও করবেন তার সবটুকুই হবে কল্যাণকর তথা ইনসাফ। আর আল্লাহ তা'য়ালার বিধি-বিধান অবশ্যই হবে নির্ভুল, সুষ্ঠু, সুন্দর, কল্যাণকর ও একান্তই বাস্তব সম্মত স্থায়ী। শুধু মানুষই নয়– যে কোনো সৃষ্টির অকল্যাণ চাওয়ার যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুক্ত। যে কোনো ধরনের ভুল-ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা থেকে মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তা সম্পূর্ণ মুক্ত এবং কোনো ধরনের অস্পষ্টতা তাঁর অসীম জ্ঞান সমুদ্রকে স্পর্শ করতে পারে না।

www.pathagar.com

সুতরাং মহান আল্লাহর গুণবলীর প্রতি একজন মুসলমান হিসাবে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এ কথার প্রতি অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা বিধান ইসলামী শরীয়াতই হলো প্রকৃত ইনসাফের মানদন্ড। ইসলামী শরীয়াতে ইনসাফের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে যে, **'কোনো বস্তুকে তার আপন স্থানে স্থাপন করাই হলো ইনসাফ আর এর বিপরীত করাই হলো জুলুম।'** অর্থাৎ কোনো বস্তুকে তার আপন পাত্রে না রেখে অপাত্রে রাখাকে জুলুম বলা হয়েছে। সুতরাং মানুষের বানানো কোনো নিয়ম-নীতির পক্ষে এভাবে যেখানে যা প্রয়োজন, সেখানেই তা স্থাপন করা সম্ভব নয় বিধায় মানুষের পক্ষে সঠিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। অপরদিকে গোটা সৃষ্টি জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে যা স্থাপন করলে স্থাপিত বস্তুটির সৌন্দর্য বিকশিত হবে এবং যথাযথভাবে তা ব্যবহৃত হতে পারবে, সেখানেই আল্লাহ তা'য়ালা তাই স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি ইনসাফ করেছেন এবং মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি মানদন্ড অবতীর্ণ করেছেন। বলা বাহুল্য, সেই মানদন্ডের নাম হলো কোরআনুল কারীম।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালার যাবতীয় সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করবে এবং এটাই হবে সৃষ্টির নিজের প্রতি ইনসাফ করা। কারণ দাসত্ব লাভের একমাত্র উপযোগী হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অপরদিকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করাকে বলা হয়েছে নিজের প্রতি জুলুম করা। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করাই হলো ইনসাফ আর অমান্য করাই হলো জুলুম। আর এ অর্থেই আল্লাহর সাথে শিরক্ করাকে জুলুম বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ–

নিশ্চয়ই শিরক হলো সবথেকে বড় জুলুম। (সূরা লোকমান)

আল্লাহ তা'য়ালা কারো প্রতি একবিন্দু জুলুম করেন না এবং মানুষ স্বয়ং নিজের প্রতি নিজে জুলুম করে নিজেই গযবের উপযোগী হয়ে যায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

www.pathagar.com

وما كنا مهلكى القرى الا واهلها ظالمون -

আমি কোনো জনপদকে শুধুমাত্র তখনই ধ্বংস করে দেই, যখন তারা অত্যাচারী-জালিম হয়ে যায়। (কোরআন)

আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনুল কারীমে এ কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও স্থানে বলেছেন–

وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ-

আমি জালিমদেরকে পছন্দ করি না।

সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা ইনসাফের যে মানদন্ড অবতীর্ণ করেছেন, তাকে পাশ কাটিয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। অপরদিকে যেসব ব্যক্তিবর্গ নিজের সাথে ইনসাফ করে না অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে আল্লাহ তা'য়ালার যাবতীয় নে'মাত ভোগ করেও আল্লাহ দাসত্ব করে না, তাদের পক্ষে সমাজ ও দেশের বুকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। যারা আল্লাহর গোলামী করে তথা ইসলামের বিধি-বিধানের আনুগত্য করে, কেবলমাত্র তাদের দ্বারাই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় বান্দার সাথে বান্দার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত ইনসাফ। এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারকে নির্দিষ্ট করে সুষ্ঠু ইনসাফ প্রতিষ্ঠার তাকিদ দিয়ে বলেছেন–

واقسطوا ان الله يحب المقسطين-

তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো, আল্লাহ তা'য়ালা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীদের ভালোবাসেন। (কোরআন)

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের সমগ্র সত্তাকে লুটিয়ে দিয়ে, বিনয়াবনত চিত্তে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর সম্মানে বান্দাহ্ ইবাদত পর্যায়ের কাজগুলো সমাধা করে, এটা হলো আল্লাহর সাথে বান্দার ইনসাফপূর্ণ সম্পর্ক। আর বান্দার সাথে অপর বান্দার বৈষয়িক কার্য সম্পাদনে অথবা পারস্পরিক লেনদেনে যা কিছু করা হয়, তা হলো মু'আমালাত। মু'আমালাত পর্যায়ের বিষয়াদিতে ইসলামী শরীয়াতের বিধি-বিধানের যথাযথ আনুগত্য করা হলে তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের সাথে

www.pathagar.com

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক পর্যায়ের ইনসাফ। এই দুটো ক্ষেত্রে যাদের মধ্যে ইনসাফ বিদ্যমান থাকবে তারাই আল্লাহর তা'য়ালার কাছে পছন্দনীয় বান্দাহ্ বলে চিহ্নিত হবে। এসব বান্দাহ্ মহান আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র।

উল্লেখিত আলোচিত বিষয় হলো ইনসাফ সম্পর্কিত জ্ঞানগত বিষয়। এরপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধ্য-বাধকতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, এই পৃথিবীর জীবন হলো একজন মুসাফীরের অনুরূপ। এই জীবন মাকড়সার জালের ন্যায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যে কোনো মুহূর্তে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর এই জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এই দৃশ্য আমরা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে অবলোকন করছি। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার ক্ষমতা কারো নেই। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং পৃথিবীর সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি পর্যন্ত কেউ-ই মৃত্যুর অমোঘ ছোবল থেকে সুরক্ষিত কোনোকালে থাকেনি। মহান আল্লাহর চিরন্তন বিধানে প্রাণীজগতের সকল প্রাণীকেই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, হতে হচ্ছে এবং আগামীতেও হতে হবে। গতকাল সমাজের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় সমাসীন ব্যক্তি আজ কফিনে আবৃত হয়ে নিরব-নিস্তব্ধ অবস্থায় পরকালের অনন্ত জগতে প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়, মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে অবোধ শিশুটি এই পৃথিবীর বিশালত্ব সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা লাভ করেনি, তাই বলে এই চলমান পৃথিবীর ক্রিয়াকলাপ অস্তিত্বহীন ছিলো না। অনুরূপভাবে বুঝতে হবে, মানুষ এই পৃথিবীতে অবস্থানকালে পরকালীন জগৎ সম্পর্কে কোনো কিছু অনুভব করতে সক্ষম না হলেও পরকালীন জগৎ কাল্পনিক কোনো জগৎ নয়। মৃত্যুর পরের জগৎ একটি অটল বাস্তবতা, একটি কঠিন সত্য এবং অনঢ় অবিচল বাস্তব সত্য। পৃথিবীর যাবতীয় কর্মকান্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে এবং হিসাবের পরে কেউ সৎকর্মের পুরস্কার হিসাবে জান্নাত লাভ করবে আবার কেউ অসৎ কর্মের শাস্তি হিসাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এসব বিষয় কোনো উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা নয়, অবশ্যই পরকাল ঘটবে এবং মহান আল্লাহর সামনে সমস্ত মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে।

www.pathagar.com

এ জন্য পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ওপর পরকালীন জীবনকে প্রাধান্য দিতে হবে। দুনিয়ার জীবনে পরকালীন জীবনকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম না হলে কোরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আর পরকালীন জীবনকে প্রাধান্য দিতে না পারলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। পরকালীন জীবনে সফলতা অর্জন করতে হলে এই পৃথিবী থেকেই মুক্তির যাবতীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। এ জন্য দুনিয়ার এই স্বল্পকালীন জীবনকে মুক্তির সম্বল হিসাবে কাজে লাগাতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ-وَاتَّقُوا اللّٰهَ-اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেক ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য হলো, সে যেনো পরকালের জন্য পূর্বেই কি সম্বল সংগ্রহ করেছে তা ভেবে জীবন পথে অগ্রসর হওয়া। (আবার শোন) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই তোমরা যা করছো আল্লাহ তা'য়ালা তার সবটাই জানেন। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপযোগী যা করছো তাও তিনি দেখেন ও জানেন। (কোরআন)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসন্তুষ্ট হতে পারেন, এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ড তোমাদের দ্বারা সংঘটিত হলে সেটাও তিনি পরিপূর্ণরূপে দেখেন ও জানেন। পৃথিবীর জীবনে অন্যায় ও অপরাধমূলক কর্মের সমুদ্রেও যদি তোমরা নিমজ্জিত হও, তাহলে পরকালের জীবনে আল্লাহ তা'য়ালাকে বিচার এড়িয়ে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে না। কারণ তিনি তোমাদের আদি-অন্ত, প্রকাশ্য-গোপন, ন্যায়-অন্যায় ও ইনসাফ-জুলুম সমস্ত কিছুই জানেন ও দেখেন। সুতরাং সাবধান! আমার সাথে হঠকারিতা করো না। অনন্ত অসীম পরকালের জীবনে চিরস্থায়ী শান্তির স্থান জান্নাত লাভ ও মহান আল্লাহ তা'য়ালার দর্শন লাভের সম্বল সংগ্রহের স্থান এই পৃথিবীর জীবনকে অবহেলায় কাটিয়ে দিও না। পৃথিবীর জীবনের সদ্ব্যবহার করো তাহলে তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করতে পারবে। পৃথিবীর

www.pathagar.com

জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত পরকালের জীবনে মুক্তির পথে ব্যয় করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

اغتنم خمسا قبل خمس شبيبتك قبل هرمك-وصحتك قبل سقمك-وغناك قبل فقرك-وفراغك قبل شغلك-وحياتك قبل موتك-

পাঁচটি অবস্থার পূর্বে পাঁচটি অবস্থাকে গনীমত বলে গণ্য করবে। (১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে। (২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে। (৩) অভাবের পূর্বে স্বচ্ছলতাকে। (৪) অধিক ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে। (৫) মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে। (তিরমিযী)

অর্থাৎ সৎকাজে অলসতা করো না, গোনাহের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমার জীবন আর কতক্ষণ অবশিষ্ট রয়েছে, তুমি কতক্ষণ সুস্থ থাকবে আর অবসর পাবে কিনা তুমি জানো না। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করো। আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন–

لاتزول قدما ابن ادم يوم القيمة حتى يسئل عن خمس-عن عمره فيما افناه-وعن شبابه فيما ابلاه-وعن ماله من اين اكتسب-وفيما انفق-وعن علم فيما عمل-

কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের দুই পা কোনো দিকে নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। (১) পৃথিবীতে তাকে যে হায়াত দেয়া হয়েছিলো, সে হায়াত কোন্ পথে ব্যয় করা হয়েছে। (২) সে তার যৌবনকে কোন্ পথে ব্যয় করেছে। (৩) সম্পদ কোন্ পথে উপার্জন করেছে। (৪) সম্পর্দ কোন্ পথে ব্যয় করেছে। (৫) যে জ্ঞান তাকে দেয়া হয়েছিলো, তা কোন্ কাজে লাগিয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন–

الاكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته-

ভালো করে জেনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন–

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى–

যে ব্যক্তি তার রব-এর মহাবিচারের সম্মুখে উপস্থিতিকে ভয় করলো এবং নিজের সত্তাকে কু-প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিরত রাখলো তার ঠিকানা হলো জান্নাত। (কোরআন)

পক্ষান্তরে যারা মৃত্যুর পরের পরকালের জীবনকে অবিশ্বাস, অবহেলা ও অজ্ঞা করে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে একমাত্র জীবন বলে ভোগ-বিলাসে মেতে থাকবে, ন্যায়-অন্যায়বোধ বিসর্জন দেবে, ইনসাফকে উপেক্ষা করে চলবে, আল্লাহ দাসত্ব ত্যাগ করে শিরক্-এ লিপ্ত হবে, হারাম-হালালবোধ বিস্মৃত হয়ে অন্যের অধিকার হরণ করে সম্পদের স্তুপ গড়বে, মানুষের সম্মান-মর্যাদাবোধের প্রতি আঘাত হানবে, জুলুম-অত্যাচার করবে তথা পরকালীন জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিবে, তারা অবশ্যই মৃত্যুর পরের জীবনে এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখিন হবে। এসব লোকদেরকে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ শুনিয়ে দেবেন–

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيٰتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ–

তোমাদের (জন্য বরাদ্দকৃত) নে'মাতসমূহ তোমরা দুনিয়ার জীবনে শেষ করে এসেছো, আর সবকিছু তোমাদের ইচ্ছা মতোই ভোগ করেছো। আজ তোমরা অপমানকর শাস্তি পাচ্ছো এ জন্য যে, তোমরা দুনিয়ার যমীনে অহঙ্কার করতে আর এ জন্য যে, তোমরা অপরাধ করছিলে। (কোরআন)

এভাবে কোরআন ও সুন্নাহর চিন্তা-গবেষণায় আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারলে এবং পরকালীন মুক্তির চিন্তা-চেতনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কোরআনুল কারীমের যথাযথ আনুগত্যের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেই মানুষ আরিফ বিল্লাহ হতে পারে। আর

www.pathagar.com

তখন সে আল্লাহর ইবাদাত ও বৈষয়িক মু'আমালায় প্রকৃত ইনসাফের ধারক-বাহক হতে পারবে। যে কোনো সমাজে এ ধরনের আল্লাহভীরু লোকদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাবে, সে সমাজ ততই ইনসাফ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হবে এবং সমাজে শান্তি, ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ নির্বিঘ্নে ইসলামী জিন্দেগীর আনুগত্য করে জান্নাতী হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহভীরু চিন্তা-চেতনার অধিকারী জ্ঞানী-গুণী, দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিচালিত সমাজের বাস্তবতায় বিশ্বমানবতা অবলোকন করতে পারবে, ইসলামী শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত ইনসাফ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কতই না কল্যাণকর।

মা'আরিফাতের নামে আবিষ্কৃত বিদআ'তের পূঞ্জিভূত আবর্জনা থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। অপরদিকে মানব জীবনে শরীআত ভিত্তিক মা'রিফাত চর্চার গুরুত্বও অপরিসীম। মা'রিফাত চর্চা না করলে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় না। আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম-আহ্কামের তাৎপর্যের যথাযথ উপলব্ধি বান্দার পক্ষে সহজ হয় না। পক্ষান্তরে মা'রিফাত বা আল্লাহ পরিচিতির চর্চা তথা মুজাহাদার কল্যাণে বান্দার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়। এই সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ হয় যে, তখন বান্দাহ্ আল্লাহর নামে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এ ধরনের বান্দাদের পক্ষেই সম্ভব হয় মহান আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া ইসলামী বিধি-বিধানের ওপর যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর এ ধরনের বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী বান্দাদের মাধ্যমেই ইনসাফ সামাজিক রূপ লাভ করতে পারে। আল্লাহকে স্মরণ করার সাথে সাথেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের দুচোখ অশ্রুয় টলমল করে উঠতো। চোখের প্রবাহিত অশ্রুধারায় তাঁদের দাড়ি মোবারক ভিজে যেতো।

আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্মরণই তাঁদেরকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করেছিলো। খেলাফতে রাশেদা ইসলামের 'সোনালী যুগ' অভিধায় আখ্যায়িত হয়েছে আল্লাহভীরু সৎলোকদের ইসলামী শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত ইনসাফ ভিত্তিক কল্যাণকর সুশাসনের কারণেই। সত্য ও মিথ্যার অস্বচ্ছ ঐতিহাসিক আলোচনা

www.pathagar.com

এড়িয়ে শুধুমাত্র কোরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল ইতিহাসের মানদন্ডে নিরুপণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, খেলাফতে রাশেদা যে ইসলামের সোনালী ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছে, তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কোনো অবকাশ নেই। আসুন আমরা ক্ষুদ্র বিষয়ে যাবতীয় মতভেদ-মতানৈক্য ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে কোরআন-সুন্নাহ ও খেলাফতে রাশেদার আদর্শে ঢেলে সাজানোর সংগ্রামকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিই। আর এ পথেই রয়েছে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও সফলতা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সফলতা অর্জন করার তাওফিক দান করুন।

www.pathagar.com

শেষ কথা

কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামদের সমষ্টিগত দলের আদর্শ অনুসরণ করাই আমাদের দ্বীন। এই পবিত্র দ্বীন বা ইসলামী শরীয়াতের আনুগত্যই যে আমাদের দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির একমাত্র পথ, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এই দ্বীন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আগত ওহীর মাধ্যমে প্রমাণীত সত্য দ্বীন। দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতিমুন্নাবিয়্যীন, শাফিউল মুজনিবীন আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন রক্তে রঞ্জিত হয়েছেন। অসংখ্য মর্দে মুজাহিদদের রক্ত সাগর পাড়ি দিয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান আমানত স্বরূপ এই দ্বীন আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। মহান আল্লাহর মেহেরবাণী ওলামা-মাশায়েখ, বুজুর্গানে দ্বীন ও আওলিয়ায়ে কেরামের চরম ও পরম ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে আমরা মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছি। এ জন্য আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করছি– আল হাম্‌দু লিল্লাহ।

আজ পৃথিবীতে মুসলমানরা এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত মুসলিম নামধারী নেতৃত্বের কারণে ও মুসলমানদের ঈমানী দুর্বলতার সুযোগে ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহ ইসলাম ও মুসলমানদের ওপরে আঘাত হানতে হানতে ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় কোনো সচেতন মুসলমান নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। আমাদের সামনে আল্লাহর বিধান বিকৃত হতে থাকবে, ইসলামকে আঘাত করে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকে আঘাত করে নানা ধরনের তৎপরতা চালানো হচ্ছে, এ অবস্থায় আমরা যদি নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করি, তাহলে কিয়ামতের ময়দানে আমরা অবশ্যই আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হয়ে পড়বো। হাশরের ময়দানে যখন অসংখ্য নবী-রাসূল, সাহাবী ও যুগের দ্বীনের দা'য়ীগণ রক্তাক্ত অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন, তখন আমরা নাদুস-নুদুস শরীর নিয়ে কিভাবে তাঁদের অনুসারী পরিচয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়াবো?

www.pathagar.com

সুতরাং আর বসে থাকার সময় নেই, সময় অনেক গড়িয়ে গিয়েছে। গোটা পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। একের পর এক মুসলিম দেশে রক্ত লোলুপ হায়েনার দল আক্রমণ চালাচ্ছে। স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম দেশ দস্যু-তস্করদের পদানত হচ্ছে। মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহ বেঈমান-কাফিরদের পদভারে কম্পিত হচ্ছে। জালিমের দল ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেছে। এ অবস্থায় আসুন, আমরাও ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাদের জান্-মাল দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত করি।

একদিকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ও মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী তাদের ওপর আঘাত হানা হচ্ছে, তাদের যাবতীয় তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে এবং পৃথিবীর যে কোনো স্থানে তাদের সমুদয় সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। অপরদিকে মুসলমানদের দারিদ্র, অনৈক্য ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে খৃষ্টান মিশনারীর দল মুসলমানদের ঈমান হরণ করছে। পৃথিবীর কোথাও মুসলমানদের জান-মালের কোনো নিরাপত্তা নেই। ইয়াহুদী-খৃষ্ট ও মুশরিক অপশক্তি সন্ত্রাসী কার্যক্রম ঘটিয়ে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। মানবতা আজ লাঞ্ছিত ও পদদলিত হচ্ছে তাদেরই পায়ের নীচে, যারা মানবাধিকারের বুলি আওড়াতে আওড়াতে মুখে ফেনা তুলে ফেলছে।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি এই বাংলাদেশ। অসংখ্য আওলিয়া ও বুজুর্গানে দ্বীন এই মাটিতে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে আগমন করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা আর নিজের দেশে ফিরে যাননি। বাংলার এই মাটিতেই তাঁরা শেষ শয্যা গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এই যমীনে আন্দোলন মুহূর্তের তরেও থেমে থাকেনি। দ্বীনের মুজাহিদদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এই পবিত্র ভূমি। এদেশে লক্ষ লক্ষ আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ রয়েছেন। ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, শ্রমজীবী, ছাত্র-শিক্ষক, লেখক, কবি-সাহিত্য, সাংবাদিক ও উচ্চ শিক্ষিত লোকজন রয়েছে। এত অধিক সংখ্যক মসজিদ-মাদ্রাসা ও

www.pathagar.com

দ্বীনি প্রতিষ্ঠান এদেশে রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো মুসলিম দেশে নেই। অথচ এই দেশের আলো-বাতাস ভোগ করে পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর অন্ধ পূজারীরা এ দেশবাসীর প্রাণপ্রিয় আদর্শ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

এই ধর্মদ্রোহী নাস্তিক-মুরতাদের দল এদেশের বুকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা চালু করার জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশের সহজ-সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে প্রতারিত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মহীন গোষ্ঠী ধোকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করছে। দীর্ঘ ২১ বছর পরে সেই ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী প্রতারণামূলক কলা-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে ১৯৯৬ সনে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হলো। তাদের অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ করার পর বাজেটের ওপরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় আমি সংসদে তাদের নেতা-নেত্রীদের সামনে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম–যা সংসদ-রেকর্ডে রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ আমি সেদিন সংসদে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদেরকে শুনিয়েছিলাম–আল হাম্‌দুলিল্লাহ, পিন্ পতন নীরবতার মধ্য দিয়ে তারা শুধু শুনেই ছিলেন, প্রতিবাদ করেননি।

সপ্তম সংসদে আমি আমার আলোচনায় বলেছিলাম, 'অর্থমন্ত্রীর চাতুর্যপূর্ণ কথামালার ভাষণ এবং দুটি বড় রকমের ভুলের জন্য এ বাজেট জাতির জন্য বরকত ও রহমত শূন্য হয়ে পড়েছে। অর্থমন্ত্রী ইসলামের দৃষ্টিতে একটি মারাত্মক ভুল কথা দিয়ে তাঁর বাজেট বক্তব্য শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নতুন শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সরকারের বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ বাজেট আমি আজ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি। এই দুর্লভ সুযোগ প্রদানের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ।' অথচ একজন মুসলমান যে কোন ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, অন্য কারো করতে হলে তা এরপরে করবে–শুরুতে অবশ্যই নয়। অর্থমন্ত্রী তাঁর পেশকৃত সুদীর্ঘ ৭১ পৃষ্ঠাব্যাপী বাজেট বক্তৃতার কোথায়ও আল্লাহর বিধান তথা ইসলামী অর্থনীতির প্রাণশক্তি যাকাত ও ওশর আদায়ের কথা একবারও উল্লেখ করেননি। বরং তাঁর বাজেট বক্তব্য ছিল

www.pathagar.com

পুঁজিবাদী শোষণের ঘৃণ্যতম হাতিয়ার অভিশপ্ত সুদভিত্তিক এবং সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ।' প্রধানমন্ত্রী কলকাতা বই মেলা থেকে দেশে ফিরে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ আমাদের আদর্শ'। পবিত্র কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ একটি কুফরী মতাদর্শ, যা অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্টভাবে অবৈধ। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মকে শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন তথা অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, পররাষ্ট্রনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি নিজের ইচ্ছা অথবা নেতার মর্জি মাফিক পরিচালিত করতে চান। আর এখানেই ইসলামের ঘোরতর আপত্তি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ –

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু কথা বিশ্বাস করবে, আর কিছু কথা করবে অবিশ্বাস? তোমাদের মধ্যে যারাই কোরআনের সাথে এরূপ আচরণ করবে দুনিয়ায় তাদেরকে দেয়া হবে লাঞ্ছনা ও অপমানের জীবন এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোরতম শাস্তি। (সূরা বাকারাহ্–৮৫)

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্য বলে থাকেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। আসলে বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থই হলো ধর্মহীনতা। বিশ্বখ্যাত Random house dictionary of english language- secularism-এর তিনটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে– No. 1-Not regarded as religious or spiritually sacred. যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়। No. 2-Not partaning to or connected with any religion. যা কোন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়। No. 3-Not belonging to a religious order. যা কোন

www.pathagar.com

ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত নয়। এছাড়া Encyclopedia Britanica, Oxford dictionary-সহ সকল বিশ্বকোষ ও অভিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা-ই বলা হয়েছে।

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা মানে অবশ্যই ধর্মহীনতা, ধর্মবিদ্বেষ ও ধর্মবিরোধিতা। তার প্রমাণ এই আওয়ামী লীগ। এই দলটির জন্মলগ্নে দলের নাম ছিল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। তারা তাদের দলীয় নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়েছে। ১৯৭২ সালে তারা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বর্জিত সংবিধান রচনা করেছিল। ১৯৭২-এর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মনোগ্রামে পবিত্র কোরআনের আয়াত 'রাব্বি জিদনী ইলমা' লেখা ছিল, তা তারা বাদ দিয়েছিল। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে সলিমুল্লাহ হল করা হয়েছে। নজরুল ইসলাম কলেজ নাম থেকে 'ইসলাম' শব্দ বাদ দিয়ে নজরুল কলেজ করা হয়েছে। এগুলো কি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মবিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ নয়? ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'ধর্ম যার যার নিজস্ব ব্যাপার। আর রাজনীতি ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।' মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ–

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর। (সূরা নেছা)

এ আনুগত্য শুধু নামায-রোযার নয়, বরং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে নবী ও রাসূলদের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রাজনীতি করেছেন। তাছাড়া সকল নবী-রাসূলগণ ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম সকলেই রাজনীতি করেছেন। তাঁরা কেউ-ই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। সুতরাং ইসলাম মানুষের জীবনের কোন খন্ডিত অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। Islam is a complete code of life. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই সকলের জ্ঞাতার্থে বলছি, আমাদের সংবিধানেও এই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের কোন অস্তিত্ব

www.pathagar.com

নেই। ১৯৭৭ সালে এদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান ও আকীদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে তদস্থলে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে নিজেদের আদর্শ ঘোষণা করে সংবিধানের ৮ম ধারা লংঘন করেছেন। অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশ হলে সংবিধান লংঘনের দায়ে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হতো।' আমি তদানীন্তন সংসদে যে আলোচনা করেছিলাম, সে আলোচনা এখানে পুনরায় উল্লেখ করলাম।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা এদেশ থেকে ইসলামী সংস্কৃতি বিদায় করে দিয়ে বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে জড়বাদী পৌত্তলিক সংস্কৃতি চালু করার লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। অথচ ইসলাম একটি কল্যাণমুখী সমৃদ্ধ সংস্কৃতি মানব জাতির সামনে পেশ করেছে এবং ইসলামী সংস্কৃতি যতদিন পর্যন্ত বিশ্বে বিজয়ীর আসনে আসীন ছিলো, ততদিন পর্যন্ত মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহ বিকশিত হয়েছে, মানবতা প্রস্ফুটিত হয়েছে, যুদ্ধ-মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ, জিঘাংসার সর্বগ্রাসী অনল থেকে মানবতা ছিলো প্রশংসনীয়ভাবে মুক্ত। গোটা পৃথিবী ইসলামী সংস্কৃতির কল্যাণ ও সুফল ভোগ করেছে। এরপর মুসলমানদের অবহেলা আর উদাসীনতার সুযোগে পাশ্চাত্যের ঘৃণিত নোংরা সংস্কৃতি বিজয়ীর আসনে আসীন হবার পর থেকেই গোটা বিশ্বে অশান্তির দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে মানবতাকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত করেছে। বিশ্বজুড়ে হিংসা-বিদ্বেষ, জিঘাংসা ও যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি সম্পর্কে আমি তদানীন্তন সংসদে বলেছিলাম, 'একটি জাতির বেঁচে থাকার প্রাণ শক্তি তার নিজস্ব সংস্কৃতি। এই সাংস্কৃতিক আচরণের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে তার ধর্মীয় আদর্শ, চিন্তা, চেতনা ও স্বকীয় মূল্যবোধের। বর্তমানে দেশে বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে যা কিছু চলছে তা এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কালচার নয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বল্গাহীন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে আমাদের স্বকীয় জাতীয় চরিত্র আজ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর দ্বিতীয়

www.pathagar.com

বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকীদা বিরোধী যেসব সংস্কৃতি চলছে তা হচ্ছে, থার্টি ফাস্ট নাইট উদযাপন, বসন্ত উৎসব, রাখী বন্ধন, মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গল তিলক, বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের নামে বিশ্ব বেহায়া দিবস উদযাপন। মুসলমানদের ঈমান আকীদার সাথে এগুলোর ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। ইসলামে বছরে একদিন ভালোবাসা দিবস পালনের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ ইসলামের জন্মই ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে। বাঙালী সংস্কৃতি বা বিভিন্ন চেতনার নামে দেশে আজ যত্রতত্র সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মিত হচ্ছে। ভাস্কর্য শব্দের আভিধানিক অর্থ মূর্তি। ইংরেজিতে বলা হয় Statue, আরবীতে আসনাম, উর্দু এবং সংস্কৃতিতে বুত। যে ভাষায় যে নামেই হোক, মুসলমানদের জন্য মূর্তি নির্মাণ করা, তাকে ভক্তি করা এবং তা উদ্বোধন করা ইসলামী শরীয়তে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টিকর্ম করতে চায় তার তুলনায় অধিক জালিম আর কে হতে পারে ? ওরা গম বা একটি যবের দানাই সৃষ্টি করে দিক না।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যেসব লোক মূর্তি ও প্রতিকৃতি তৈরী করে কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা কিছু তৈরী করেছিলে, এখন সেগুলো জীবিত করে দাও। কিন্তু সে তা কখনই পারবে না।' অমুসলিমগণ তারা তাদের উপাসনালয়ে হাজার হাজার মূর্তি বানাতে পারে, ইসলামে তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় চেতনার নামে কোন মূর্তি নির্মাণ জাতি বরদাশত করবে না। মহান ব্যক্তিদের স্মরণে রাখার জন্য তাদের নামে মাদ্রাসা, মসজিদ, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কিন্তু মূর্তি বা প্রতিকৃতি স্থাপন সুস্পষ্ট হারাম। এভাবে প্রতিকৃতি নির্মাণ এবং মাল্যদান, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, মাথানত করে দাঁড়ানো সুস্পষ্ট শিরক। এটা হচ্ছে মুশরিকদের অনুকরণ। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।'

www.pathagar.com

পারসিকরা আগুনের পূজা করে, খৃষ্টানরা কল্যাণ কামনায় মোমবাতি জ্বালায় এবং হিন্দুরা আগুনকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করে। দুর্গা পূজার মন্ডপেও তারা মূর্তির সামনে আগুন জ্বালায়। হিন্দু সাধু-সন্নাসীদের অনেকেই হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে ধ্যানে বসে। এভাবে অমুসলিমদের অনেকেই আগুনকে সর্ববিনাশী মনে করে আগুনের পূজা করে থাকে। তাদের ধারণা, আগুনের মধ্যে যেহেতু দহন ক্ষমতা রয়েছে, সেহেতু আগুন মহাশক্তিশালী। মুসলমান কেবলমাত্র সেই আল্লাহরই গোলামী করবে, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আগুনের স্রষ্টা এবং আগুনের মধ্যে দহন ক্ষমতা দিয়েছেন। শিখা চিরন্তনের নামে বা শিখা অনির্বাণের নামে অমুসিলমদের অনুকরণে আগুনকে সেলুট করা হচ্ছে। এভাবে করে এদেশ থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দেয়ার জন্য মুসলিম নামধারী একশ্রেণীর কুলাঙ্গাররা নানাবিধ কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

এদের মোকাবেলা করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সম্মুখ পানে অগ্রসর করাতে আমরা যারা ইচ্ছকু, তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্ষুদ্র মতভেদ রয়েছে, তা ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করতে হবে। ইসলামপন্থীদের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ মত পার্থক্য রয়েছে তা গঠনমূলক পন্থায় সমাধান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, পারস্পরিক সংঘাত আর কটাক্ষ আমাদের কাংখিত ঐক্যের পথে অনৈক্যের বিশাল দেয়াল তুলে দেবে। সুতরাং কাংখিত ঐক্যের বৃহত্তর স্বার্থে পারস্পরকে কটাক্ষ করার প্রবণতা পরিহার করতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে আন্তরিকাতর সাথে, গ্রহণযোগ্য পন্থায় ও পারস্পরিক পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধানের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ আমরা বাতিলের মোকাবেলায় বিজয়ী হবো।

অতএব আসুন! আমরা মুসলমানরা পরস্পর ইস্পাত নির্মিত প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাতিল শক্তির মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যাই, ইসলাম বিরোধী শক্তির কবর রচনা করি এবং কুফরী শক্তির কবরের ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডিন করি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে কামিয়াব করুন। আমীন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com